শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত

অর্থাৎ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণনা

প্রথম খণ্ড

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ
গ্রন্থিত

ত্রয়োদশ সংস্করণ

সন ১৩৬২

প্রকাশক—
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
১৪নং আনন্দ চাটার্জ্জী লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।

মূল্য ৩ টাকা মাত্র

৮. ৩. ৬১

তারকনাথ প্রেস
৯ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা, হইতে
শ্রীবিমলকুমার ব্যানাৰ্জ্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

বাঙ্গালার রাজা সুবুদ্ধি খাঁ, সুবুদ্ধি খাঁর রাজ্যচ্যুতি ও তাঁহার বৃন্দাবন গমন, বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হোসেন সা, বাঙ্গালার প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হিন্দুরা, নবদ্বীপের কাজী চাঁদ খাঁ, কায়স্থ জমীদারগণ, ব্রাহ্মণের প্রাদুর্ভাব ও অন্যান্য জাতির হীনাবস্থা, নদীয়ার কোটাল জগাই মাধাই, নদীয়া বিবিধ পাড়ায় বিলি, লোকের সচ্ছল অবস্থা, নদীয়ায় ধর্ম্ম ও বিদ্যা চর্চ্চার প্রাদুর্ভাব, বৃন্দাবন জঙ্গলময়, শাক্তের প্রাদুর্ভাব ও বৈষ্ণবের হীনাবস্থা, তন্ত্র-সাধন, অধ্যাপকগণ সমাজের কর্ত্তা, ন্যায়ের প্রাদুর্ভাব ও ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা, নৈয়ায়িক রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ, মহেশ্বর বিশারদ, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, সার্ব্বভৌম ও বাচস্পতি, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, নবদ্বীপ বিদ্যা লইয়া উন্মত্ত, প্রতি গলিতে টোল ও সহস্র সহস্র পড়ুয়ার গঙ্গাস্নান, বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে ন্যায়ের গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া আসেন, রঘুনাথ, ভবানন্দ, রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ, সার্ব্বভৌমের উড়িষ্যায় গমন, রাজা প্রতাপরুদ্র, জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী, শচীদেবীর চৌদ্দমাস গর্ভ, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

উনবিংশ অধ্যায়

শ্রীমঙ্গলাচরণ

সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্বজীবের প্রাণ শ্রীশ্রীভগবানের পাদপদ্মে আমি আমার অভিন্ন-কলেবর শ্রীবলরাম দাসের দুটি পদ অর্পণ করিয়া প্রণাম করিব।

(১)

জ্ঞানাতীত মায়াতীত তোমা ব'লে থাকে।
তবে কি এ ক্ষুদ্র জীব পাবে না তোমাকে?
ভক্তি ও স্নেহেতে যদি না ভুলিবে তুমি।
তবে "প্রিয়" বলি কি আর না ডাকিব আমি?
প্রাণনাথ পিতা সখা সম্বন্ধ মধুর।
বড় হয়ে সে সব কি করে' দিবে দূর?
মায়া মিশাইয়া এসো প্রভু ভগবান্।
দুটো কথা কহি তবে জুড়াইব প্রাণ॥
জ্ঞানাতীত মায়াতীত হয়ে যদি রবে।
কিরূপেতে বলরাম তোমা লাগ পাবে?

(২)

আমি আর শ্রীগৌরাঙ্গ

তপ্ত বালুকায় আছিনু শুইয়া
চকিতের মত এলো।
শীতল নিকুঞ্জে, যথা ভৃঙ্গ গুঞ্জে
গৌর আমায় নিয়ে গেল॥
কি গুণে আইল, কেন দয়া হলো,
কিছু আমি নাহি জানি।
সরল বলিতে, গৌরাঙ্গ আমার
অসাধন চিন্তামণি॥
কুঞ্জে নিয়া গেল, অঙ্গ জুড়াইল,
আমি ইতি উতি চাই।
সুন্দর এমন, শীতল কানন,
কভু আমি দেখি নাই॥
এ ভবে আসিয়া, বেড়াই ভাসিয়া,
সদা হাবু ডুবু খাই।
বুঝিলাম মনে, পানু এত দিনে,
প্রাণ জুড়াবার ঠাঁই॥
মনে বিচারিনু, যা হতে পাইনু
দুঃখ-মাঝে সুখ এত।
সব তেয়াগিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া,
তাঁহারে সঁপিব চিত॥

মনে মনে বলি, "শুন মোর সখা,
আমি দাস, তুমি প্রভু।
সম্পদে বিপদে, রেখো রাঙ্গা পদে,
তোমা নাহি ভুলি কভু॥"
গৌরলীলা গুণ, শ্রবণ পঠন,
করি প্রাণ এলাইল।
গৌরাঙ্গ কৃপায়, গৌরাঙ্গ ভাবিতে,
নয়নে আইল জল॥
বৈষ্ণব দেখিলে, আনন্দ উথলে,
ভাবি এরা নিজ জন।
যাঁরে আমি ভজি, আমার শ্রীগৌর
ইহারা তাঁহারি গণ॥
খোল করতাল— ধ্বনি কানে গেলে,
শ্রীগোরাঙ্গ পড়ে মনে।
আনন্দিত মনে, ধ্বনি লক্ষ্য করি,
ধেয়ে যাই সেই স্থানে॥
বৈষ্ণবের পুঁথি, চরিতামৃতাদি,
দেখিলে বুকেতে করি।
পড়িতে না পারি, সূচীপত্র হেরি,
কান্দিয়া কান্দিয়া মরি॥
পুস্তক-বিক্রেতা, পুঁথি শিরে করি,
পথে পথে যথা ভ্রমে।
তার পিছু পিছু, ঘুরিয়া বেড়াই,
চেয়ে থাকি পুঁথি পানে॥

বটতলা যাই, দু'ধারেতে চাই,
বৈষ্ণবের পুঁথি আছে।
ইহাই ভাবিয়া, থাকি দাঁড়াইয়া,
সেই দোকানের কাছে॥
সেই সব কথা, কি হবে কহিয়া,
কহিতে বুক ফেটে যায়।
মনে মনে কত, দারুণ প্রতিজ্ঞা,
করেছিনু প্রভু-পায়॥
বলেছিনু প্রভু, "অকারণে তুমি,
করুণা করেছ মোরে।
রাখিব যতনে, তোমারে আদরে,
হৃদয়ের রাজা ক'রে॥
যেন উপকার, আপনি করিলে,
আমি শোধ দিব ধার।
এই জগ মাঝে, গৌর গুণ গাব,
যত দিন বাঁচি আর॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, লিখিয়া লিখিয়া,
আগে জানাইব জীবে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, কর্ণেতে পশিলে,
অবশ্য তোমার হবে॥
এমন পাষাণ, ত্রিজগতে নাই,
যে গৌরাঙ্গ-লীলা পড়ি।
ধৈর্য্য ধরি রবে, মোটে না কান্দিবে,
না দিবে সে গড়াগড়ি॥

লীলা পড়ি জীবে, নির্ম্মল হইবে,
তখন কৌপীন পরি।
গৌর-গুণ কথা, দুঃখী জনে কব,
জনে জনে গলা ধরি॥"
এই সব সাধ, মনে হয়েছিল,
নব অনুরাগ কালে।
তখন সদাই গৌর-গুণ গাই,
ভাসি প্রেমানন্দ জলে॥
সেই অনুরাগ গৌরাঙ্গ-সোহাগ,
পীরিতি-অঙ্কুর আর।
কেন বা আইল, কেবা নিয়ে গেল,
এখন হুতাশ সার॥
"মনে পড়ে প্রভু, তোমায় আমায়,
কহিতাম কত কথা।
তোমা বিনা আর কহি নাই কারু
আমার মনের ব্যথা॥
সেই সুখ দিন সুখের মালঞ্চ,
কি দোষে ভাঙ্গিলে প্রভু।
সে চাঁদ বদন, সজল-নয়ন,
আর কি দেখিব কভু?"
সুখের পাথার, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার,
তাহে করিতাম খেলা।
সে সুখ সম্পত্তি আজি দুষ্ট-বিধি,
কোথা হরি নিয়া গেলা॥

বৃথা ভক্ত আমি, জন্মিনু তোমার
সেবা না পাইয়া তুমি।
অনাথ করিয়া গিয়াছ ফেলিয়া,
কি করিতে পারি আমি॥
মোর অধিকার, অপরাধ করা,
তোমার করিতে ক্ষমা।
চির দিন হতে, যুগে আর যুগে,
এ সম্পর্ক তোমা আমা॥
তুমি যদি আজ, ফেলি যাও মোরে,
আর কার কাছে যাব।
অন্তর্যামী তুমি, বল দেখি কার-
কাছে গিয়া সুখ পাব?"
আবার কখন, ভাবি মনে মনে,
তোমাতে পীরিতি নাই।
কৃতজ্ঞতা পাশে, আবদ্ধ হয়েছি,
তাই তোমা গুণ গাই॥
পেয়ে উপকার, হয়েছি তোমার,
এ সম্বন্ধ তোমা সনে।
তোমাতে আমাতে, বন্ধন যেমন,
খাতক ও মহাজনে॥
নিঃস্বার্থ পীরিতি, যার তোমা প্রতি,
সেই তো তোমারে পায়।
আমি ভজি তোমা, স্বার্থের লাগিয়া,
কাটাইতে ভব ভয়॥

ইহা সব সত্য, কিন্তু ক্ষুদ্র জীব,
আপদ-সাগরে থাকে।
বিপদে পড়িলে, স্বভাব দিয়াছ,
সহজে তোমারে ডাকে॥
এরূপ ডাকিয়া, তোমা দুঃখ দেই,
ক্ষম মোর অপরাধ।
তোমা মনোমত, অবশ্য হইব,
কর তুমি আশীর্ব্বাদ॥
হে মধু-মূরতি! নয়ন-আনন্দ,
নয়ন উপরে বসো।
ওহে প্রাণেশ্বর! শীতল আনন্দ,
হৃদয়ে কর হে বাস॥
হে পরশমণি! বিমল আনন্দ,
শ্রীকর মাথায় ধর।
হে ভুবনবন্ধো! জগত-আনন্দ,
জগত শীতল কর॥
ভীষণ আন্ধারে, ঘেরিল সংসারে,
উর নবদ্বীপ-চাঁদ।
তিমির ঘুচাও, কৃপায় পূরাও,
বলরাম দাস-সাধ॥”

উৎসর্গ পত্র

শ্রীল হেমন্তকুমার ঘোষের প্রতি—

মেজদাদা! তুমি আমাকে এই জড়-জগতে রাখিয়া গোলকধামে গমন করিলে, তাহার কয়েক দিবস পরে আমি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি প্রকাশ করিয়াছিলাম :—

"কয়েক বৎসর গত হইল, আমরা দুই ভাই একটি শোক পাইয়া ব্যথিত হই। তখন আমরা ভাবিলাম যে, যখন সকলকেই মরিতে হইবে, তখন মরিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু কি করিব, কোথায় যাইব? মরিবার জন্য প্রস্তুত কিরূপে হইতে হয়? ইহা লইয়া দুই ভাই চিন্তা ও বিচার করিতে লাগিলাম।

"পরিশেষে ইহা স্থির হইল যে, মুক্ত হইবার দুইটি পথ আছে। এক জ্ঞানপথ, আর এক ভক্তি-পথ। কিন্তু ইহার কোন্‌টি ভাল? কোন্ পথে আমরা যাইব? তখন এ সম্বন্ধে কোনরূপ সাব্যস্ত করিতে না পারিয়া দুই ভাই দুইটি পথ ভাগ করিয়া লইলাম। মেজদাদা লইলেন ভক্তি-পথ, আমি লইলাম জ্ঞান-পথ। এইরূপ ভাবে আমরা কেহই অসন্তুষ্ট হইলাম না। কারণ আমার মেজদাদা মধুর প্রকৃতি, ভক্তিময় ও সর্ব্বজীবে দয়ালু, আর আমি জ্ঞানাভিমানী, তেজীয়ান, ভক্তিহীন ও হৃদয়-শূন্য!

"মেজদাদার আমার অপেক্ষা অনেক সুবিধা ছিল। কারণ ভক্তি-পথ শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে পথ দিয়া

অন্ধ লোকেও যাইতে পারে। অতএব তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়িলাম। জ্ঞান-পথের গুরু কোথায়?

"অগ্রে আমার কথা কিছু বলিয়া লই। আমি যখন ব্যাকুল হইয়া জ্ঞান-পথের অনুসন্ধান করিতেছি, তখন শুনিলাম বোম্বাই-নগরে আমেরিকা হইতে ব্ল্যাভ্যাট্স্কী নাম্নী একটি মেম ও অলকট নামক এক সাহেব আসিয়াছেন। ইঁহারা পরম যোগী সিদ্ধপুরুষ, অনেক অলৌকিক ক্রিয়াও করিতে পারেন। এই কথা শুনিয়া আমি বোম্বাই নগরে তাঁহাদের নিকট যাত্রা করিলাম ও তিন সপ্তাহকাল তাঁহাদের গৃহে বাস করিলাম। তাঁহাদের নিকট কিছু কিছু দেখিলাম ও কিছু কিছু শিখিলাম। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু দেহ অপটু, আর কলিকাতা জনাকীর্ণ স্থান। এই নিমিত্ত কৃষ্ণনগর জেলায় চুর্ণী নদীর ধারে, হাঁসখালি গ্রামে, একটি পরিত্যক্ত নীলকুঠিয়ালের বাড়ী ভাড়া লইয়া সেখানে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলাম। আর সেখানে নির্জ্জনে কিছু কিছু মনঃসংযমের কার্য্যও অভ্যাস করিতে লাগিলাম।

"এদিকে আমার মেজদাদা মহাশয় আমাদের জন্মস্থান যশোহর জেলাস্থ মাগুরা (অমৃতবাজার) গ্রামে, সপরিবারে থাকিয়া ভক্তি-চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রামস্থ লোক লইয়া একটি হরিসংকীর্ত্তনের দল করিলেন। সন্ধ্যাকালে হরি-সংকীর্ত্তন করেন, আর অন্যান্য সময়ে ভক্তিগ্রন্থানুশীলন করেন। মেজদাদা মহাশয়ের ভক্তিরস ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিল ও তাঁহার সঙ্গ-গুণে গ্রামস্থ অনেক লোকও ভক্তিমান্ হইতে লাগিলেন।

ক্রমে সংকীর্ত্তনের তেজ বাড়িয়া উঠিল। প্রথম একবার করিয়া সন্ধ্যাকালে হইতেছিল, পরে প্রাতে এবং অবশেষে আবার অপরাহ্ণেও সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মেজদাদা প্রায় অহর্নিশি সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"গ্রামস্থ লোক সেই তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন; এমন কি, অনেকে আপনাদের সাংসারিক কার্য্য করিতে অপারগ হইতে লাগিলেন। শেষে সংকীর্ত্তনের বিবিধ দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। বালকের একদল হইল, এবং স্ত্রীলোকেরাও কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"আমার মেজদাদা মহাশয় তখন সংকীর্ত্তনে দশা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আর তখন তিনি সমুদায় বিষয়-কার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া কেবল ভক্তিতরঙ্গে সন্তরণ দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

"আমাদের প্রায় দুই মাস দেখা শুনা নাই। কিন্তু মেজদাদা সমস্ত দিবস কিরূপে যাপন করেন, তাহা প্রত্যহ আমাকে লিখেন। আমিও প্রত্যহ পত্র লিখি। কিন্তু আমার লিখিবার কিছু নাই, সুতরাং বিষয়-কথা ব্যতীত পরমার্থ-কথা কিছুই লিখি না। এমন সময় আমাকে দেখিবার নিমিত্ত, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, মেজদাদা মহাশয় হাঁসখালিতে শুভাগমন করিলেন।

দেখি, মেজদাদা মালা ধারণ করিয়াছেন। মুখের আকৃতির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন হৃদয়ে ময়লা মাত্র নাই। নয়ন দেখিয়া বোধ হইল যেন অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতেছে। মেজদাদার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, মেজদাদা যে পথ লইয়াছেন, ইহাতে অবশ্য কিছু আছে।

"মেজদাদাকে দর্শন করিয়া বড় সুখ বোধ হইল। তিনি তখন এক সন্ধ্যা আহার করেন, মৎস্যাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন। আমি যত্ন

করিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইলাম। মাংস রহিল না বটে, কিন্তু মৎস্যাদি বহু প্রকার রহিল। দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিলাম। মেজদাদার থালে মোটা চিঙ্গড়ী মাছের দুটি ভাজা মাথা ছিল। মেজদাদা আসনে বসিলেন। কিন্তু চিঙ্গড়ীর মাথা ও অন্যান্য মৎ: ব্যঞ্জন দেখিয়া কাতরভাবে আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন।

"আমি বলিলাম, বৈষ্ণবগণ মৎস্যাদি খাইয়া থাকেন, তুমি কেন খাইবে না? তাহার পর বলিলাম, যে ধর্ম্মে খাইলে ধর্ম্ম যায়, না খাইলে ধর্ম্ম হয়, অর্থাৎ খাওয়ার সঙ্গে যে ধর্ম্মের ভাল-মন্দ সম্বন্ধ আছে, সে ধর্ম্ম আমি মানি না।

"মেজদাদা কোন উত্তর না দিয়া কাতরভাবে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন আমি হাসিয়া বলিলাম, ভণ্ডামি করিতে হয় বাহিরে করিও, আমার এখানে কেন? তবু মেজদাদা থালায় হাত দিলেন না তখন আমি বলিলাম, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধু যত্ন করিয়া অতি ভক্তিপূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত স্বীয় হস্তে পাক করিয়াছে। তুমি ভক্তিবৎসলের পূজা কর, ভক্তের দ্রব্য কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে? ইহাই বলিয়া একটু মৎস্য হাতে করিয়া মেজদাদার মুখে দিলাম। আমি যখন নিজ হস্তে তাঁহার মুখে মৎস্য দিতে গেলাম মেজদাদা তখন হাঁ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এইরূপে আমি মেজদাদার ধর্ম্ম নষ্ট করিলাম।

"দেখা অবধি আমাদের দুই জনে কথা চলিতেছে। এক মুহূর্ত্তও ফাঁক নাই। কখন সুখ-দুঃখের কথা বলিতেছি। ধর্ম্মের কথা আরম্ভ হইলে ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল। এইরূপে সারাদিন তর্কে গেল। আমি মেজদাদাকে বলিলাম, "তোমার গৌর আমার বড় প্রিয় বস্তু। যদিও তাঁহার মতের সহিত আমার সমুদায় মিলে না, তবু তাঁহার নাম করিলে আমার আনন্দ হয়। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, সে স্ত্রীলোকের, কি দুর্ব্বলচেতা

মনুষ্যের জন্য। তেজস্বী পুরুষের স্ত্রীলোকের মত কান্দিলে চলিবে কেন? পুরুষ জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারিলে আর কান্নাকাটীর মধ্যে কেন যাইবে?'

"ভক্ত পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতেছেন যে, তখন আমার শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাস ছিল না। এমন কি, মেজদাদা যদিও হরিনামে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তবু তিনিও তখন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সে যাহাহউক, জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়, এই কথা লইয়া তর্ক হইল। আমি বলি জ্ঞান বড়, মেজদাদা বলেন ভক্তি বড়। কিন্তু মেজদাদা আমার সহিত কখন তর্কে পারিতেন না। তবে আমার আন্তরিক টান বরাবরই ভক্তির দিকে ছিল।

"মেজদাদা যদিও তর্কে পারিলেন না, কিন্তু আমি মনে মনে বুঝিলাম যে তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, আর আমি পাছে পড়িয়া গিয়াছি! ফল কথা, মেজদাদাকে দেখিয়া আমি বেশ বুঝিলাম, তিনি আমার অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছেন। এমন কি, আমি তাঁহার মত হই নাই বলিয়া মনে মনে বড় দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু মুখে আমি তাহা স্বীকার করিলাম না, ইহা আমার মনে মনে রহিল। মুখে আস্ফালন করিতেছিলাম, কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝিলাম যে, তিনি আমার অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছেন, আর গৌরাঙ্গের মতই ভাল।

"বিকালে দুই ভাই গাড়ীতে বেড়াইতে গেলাম। গাড়ীতেও ঐ কথা। ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল। তখন গাড়ীর মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল, মেজদাদা আপনার ভাবে রহিলেন, আমি আমার ভাবে রহিলাম।

"একটু পরে মেজদাদা গুন্ গুন্ করিয়া একটি গীত গাহিতে লাগিলেন। গীতটির সমুদায় কথা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু কথা বুঝিবার প্রয়োজন হইল না। সেই গীতটি আমার হৃদয় কোমল ও শ্রবণ তৃপ্ত করিতে

লাগিল। ফল কথা, ভক্তের কণ্ঠস্বর একরূপ মন্ত্র বিশেষ। ভক্তের শুদ্ধ কণ্ঠস্বরেই জীবমাত্রের হৃদয় স্পর্শ করে।

মেজদাদা গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছেন, আর আমার বোধ হইতেছে যেন শ্রীভগবান্ আমার হৃদয়ে বসিয়া করুণস্বরে রোদন করিতেছেন। আমি মনোনিবেশপূর্ব্বক সেই করুণ ও মধুর স্বর শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে উহা আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর ক্রমে আমাকে অস্থির করিতে লাগিল। সেই গুন্ গুন্ স্বরটি শেষে হৃদয়ে রহিয়া গেল,—অদ্যাপিও আছে।

"মেজদাদা যে গীতটী গাহিতেছিলেন তাহা আমি পরে শিখিয়াছিলাম। সে গীতটী তাঁহার নিজের কৃত। সেটী এই—

"হা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলি, ধূলায় পড়িল গোরা।
ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ, দুনয়নে বহে ধারা॥
(গোরা) ক্ষণেক চেতনা পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই,
এই ছিল, কোথা গিয়া, লুকাইল মনচোরা॥
হা হরি, হরি হরি, হরি তুমি কোথায় হে,
তুমি আমার প্রাণধন, তুমি আমার নয়ন-তারা॥'

'শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-ঘটিত গীত পূর্ব্বে মহাজনগণ কিছু কিছু রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে প্রথা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। সেই প্রথা মেজদাদা কর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবিত হইল। এখন উল্লিখিত আদি গীতটীর দেখাদেখি গৌরাঙ্গলীলা-ঘটিত কত শত পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

"সে যাহা হউক, পর দিবস মেজদাদা বাড়ী চলিয়া গেলেন। তিনি গেলেন বটে কিন্তু কিছু রাখিয়া গেলেন। তাঁহার সেই করুণ স্বরটুকু আমার হৃদয়ে রহিয়া গেল। মেজদাদা বাড়ী যাইয়া আমাকে

এক পত্র লিখিলেন, তাহার ভাবার্থ এই,—'শিশির! আমি জুড়াইবার নিমিত্ত তোমার কাছে গিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে জুড়াও নাই।'

"মেজদাদার এই পত্রে আমি মর্ম্মাহত হইলাম, কারণ আমি বুঝিলাম মেজদাদা যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা সমুদায় ন্যায্য। আমি আগেও বুঝিয়াছিলাম, তখন আরো বুঝিলাম, যে আমি বৃথা জ্ঞানের কথা বলিয়া মেজদাদার হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছি। তখন হৃদয়-মাঝারে সেই গুন্ গুন্ শব্দটি আরো যেন কান্দিয়া উঠিল।

"তখন ভাবিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রিয় বস্তু, আমার মেজদাদাও আমার প্রিয় বস্তু। এ উভয়ের অনুরোধে আমার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা কিছু জানা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেও শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম এবং শুনিয়া উহার প্রতি বড় লোভ জন্মিয়াছিল। যখনই গৌরাঙ্গ-লীলা শুনিতাম, তখনই উহা আমার নিকট মধু হইতেও মধুতর বোধ হইত।

"আর বিলম্ব না করিয়া কলিকাতা হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাঠাইতে লিখিলাম, আর মেজদাদার পত্রের উত্তর দিলাম। মেজদাদাকে যাহা লিখিলাম, তাহার ভাবার্থ এই,—'এবার তুমি আমার সঙ্গে যে দুঃখ পাইয়াছ, অন্য বারে আমি তাহা দূর করিব। বিচিত্র কি, হয়ত আমিও তোমার মত হরিবোলা হইব।'

"শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি আসিল। আমি উহার প্যাকেট খুলিলাল। পুস্তকখাতি হাতে করিলাম, আর কি জানি কেন, আমার অঙ্গ দিয়া যেন একটি আনন্দের লহরী চলিয়া গেল। পিপাসাতুরের জল পান করিয়া যেরূপ অঙ্গ শীতল হয়, পুস্তকখানি স্পর্শ করিয়া সেইরূপ আমার তাপিত হৃদয় শীতল হইল। আমি চৈতন্যভাগবত অল্প অল্প

করিয়া পড়িতে লাগিলাল। অল্প অল্প বলি কেন, না, অতি অল্পেই আমার হৃদয় ভরিয়া যাইতে লাগিল।

মেজদাদা মহাশয় কখন কখন আবিষ্ট হইতেন, ও আবিষ্ট হইয়া আমাকে পত্র লিখিতেন। সে সমুদায় পত্রগুলি যেন তাঁহার হৃদয়ে কেহ প্রবেশ করিয়া লেখাইতেন। সেই আবিষ্ট অবস্থার আদেশগুলি আমি বড় মান্য করিতাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে, মেজদাদাকে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম যে, পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইলে আর তাঁহাকে দুঃখ দিব না। সেই পত্রের উত্তর আসিল।

"তখন সকাল বেলা, প্রায় আটটার সময়। আমি ঘরে একেলা আছি। আমার ঘরের মেঝে বাঁশের চাঁচ দ্বারা মণ্ডিত। মেজদাদার পত্রখানি খুলিলাম, তাহাতে যাহা লেখা ছিল তাহার ভাবার্থ এই :— 'শিশির! কোন্ দেবতা, আমি তাঁহাকে চিনি না, আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বলিলেন যে, তোমার কনিষ্ঠ শিশির, ওটি শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস। ঐ দেহ দ্বারা মহাপ্রভু অনেক কার্য্য সাধন করিবেন।"

"এই পত্রখানি পড়িয়া আমি সেই চাঁচের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

"একটু পরে উঠিয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। আমি এই মাত্র বলিয়াছি যে, মেজদাদা এইরূপ আবিষ্ট হইয়া আমাকে যে উপদেশগুলি পাঠাইতেন, আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম। সুতরাং মেজদাদার পত্রে যাহা ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু আমি মনে মনে এইরূপ ভাবিতাম, 'এ আবার শ্রীভগবানের কি লীলা? প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য কি আর দেহ মিলিল না? আমি কঠিন, কর্কশ, ভক্তিশূন্য, রাজনীতি লইয়া বিব্রত, ইংরাজী পড়িয়া এক প্রকার

নাস্তিক হইয়াছি।' আবার ভাবিলাম, 'আমা দ্বারা শ্রীভগবান্ প্রেম-ভক্তি প্রচারের কার্য্য করিবেন, তাহা তাঁহার পক্ষে বৈচিত্র কি? তিনি ইচ্ছা করিলে অন্ধের দিব্যচক্ষু হয়। তাঁহার ইচ্ছা হইলে এই পাষাণবৎ হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর হইবে বৈচিত্র্য কি?"

"আমার এখন বোধ হয় যে, সে পত্রখানি দ্বারা মেজদাদা মহাশয় আমাকে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছিলেন।

"আমি তখন অতি কাতর ভাবে করযোড়ে শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিলাম যে, 'ভগবান্! যদি তুমি অসাধনে, কেবল আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়ালু হইয়া, নিজ গুণে, আমার প্রতি কৃপা কর, তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যথাসাধ্য সরল মনে, তোমার চরণ ভজন ও জগতে তোমার গুণগান করিব।"

উপরি উক্ত প্রস্তাবটি ১২৯৯ সালে চৈত্রের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "মেজদাদা! তুমি আবিষ্ট হইয়া পত্রে আমাকে যাহা যাহা লিখিয়াছিলে, তাহা আমি লজ্জাক্রমে সব প্রকাশ করিতে পারিলাম না।"

আমি শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা লিখিব, কি তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, ইহা যখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তখন তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে যে আমার ভাগ্যে সে ফল লেখা আছে। সেই তোমার শ্রীমুখের বাক্য এখন সফল হইতেছে। অতএব তোমার কনিষ্ঠের এ পরিশ্রমের ধন আর কাহাকে দিব? তুমিই গ্রহণ কর।

তুমি যদি এ জড়জগতে এখন থাকিতে, তবে এই গ্রন্থের প্রতি অক্ষর লইয়া আমার সহিত বিচার করিতে। তুমি আমি দু'জনে একত্র হইয়া ভজন করিতাম। এখন তুমি নাই, কাজেই ব্যথার ব্যথী নাই, আমার ভজনও নাই। যখন হৃদয় শুষ্ক হইত, তখন তোমার মুখপানে চাহিলেই

আমার রসের উদয় হইত। এখন আমার সে সম্পত্তি কিছুই নাই। একে রোগে জীর্ণ শীর্ণ দেহ, তাহাতে তোমার বিরহে হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তবু যে আমি লিখিতেছি, তাহার কারণ এই যে, আমি আর এ জগতে এরূপ একটি কার্য্য ব্যতীত কিরূপে সময় যাপন করিব ?

এই গ্রন্থ লিখিবার সময় তুমি এ জগতে ছিলে না, কাজেই আমার এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সমুদয় কথা তোমাকে বলিতে পারি নাই, তাহা এখন বলিতেছি।

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত কি ভগবান্, তাহা লইয়া বিচার করিবার এখানে আবশ্যক নাই। যে জন অন্তরের সহিত শ্রীভগবানকে করুণাময় বলেন, তাঁহার নিকট শ্রীভগবানের অবতার অসম্ভব নয়। যাঁহারা মুখে তাঁহাকে করুণাময় বলেন, মনে মনে ভাবেন যে, এ ক্ষুদ্র নর-সমাজে তিনি আসিবেন কেন, তাঁহারা অবশ্য অবতার মানিতে পারেন না। যাঁহারা মনের সহিত বিশ্বাস করেন যে শ্রীভগবান্ প্রকৃতই দয়াল, তাঁহাদের এ কথা বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি যে, তিনি আমাদের মধ্যে আসিয়া থাকেন ? বিশেষতঃ তাঁহার সহিত যদি মিলন প্রয়োজন হয়, তবে যখন আমরা তাঁহার মত বড় হইতে পারি না, কি আমরা তাঁহার কাছে যাইতে পারি না, তখন তাঁহারই আমাদের মত ছোট হইয়া আমাদের কাছে আসিতে হয়।

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারেন, তাঁহারা তাঁহার লীলা পড়িয়া সম্ভবতঃ এই তিনটি কথা বুঝিতে পারিবেন যে—

১। **শ্রীভগবান্ আছেন।**

২। **তিনি গুণের নিধি।**

৩। **তাঁহাকে পাওয়া যায়।**

এ তিনটি বিশ্বাস যাঁহার আছে তাঁহার আর দুঃখ থাকে না।

জগতে যতগুলি অবতার উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেবল শ্রীগৌরাঙ্গই স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়া পূজিত। অতএব তাঁহার লীলা সকলেরই, বিশেষতঃ বাঙ্গালী মাত্রেরই জানা কর্ত্তব্য। আর জগতে যত যত অবতারের উদয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল গৌরলীলাই প্রমাণের আয়ত্ত। ঐ লীলা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সাধুগণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থে যে লীলা সন্নিবেশিত করিলাম, উহা প্রামাণিক গ্রন্থ ও মহাজনের পদ হইতে গৃহীত হইল। অল্প দুই একটি লীলা জনশ্রুতি হইতেও লওয়া হইয়াছে।

প্রামাণিক গ্রন্থে সূত্ররূপে যে সমস্ত লীলা সংক্ষেপে লেখা আছে, আমি তাহা বিস্তার করিয়াছি। তবে এই বিস্তার কল্পনা-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া করি নাই। লীলাগুলি পরিষ্কাররূপে দেখাইবার জন্য এইরূপ মধ্যে মধ্যে করিতে হইয়াছে। যেখানে কোন লীলা সূত্র দেখিয়া বুঝিতে না পারিয়াছি, সেখানে অন্যান্য গ্রন্থ এ লীলাদ্বারা উহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে তাহাও না পারিয়াছি, সেখ কাতর হইয়া ভগবানের পূজা করিয়াছি। এইরূপে কাতর হইয়া নিবেদন করিতে করিতে আমার মনে যেরূপ স্ফুরিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়াছি। পাঠকের পড়িতে রসভঙ্গ হইবে বলিয়া আমি কথায় কথায় প্রমাণ দেখাইয়া দিই নাই।

প্রথম খণ্ডে রস-বিস্তারের চেষ্টা করি নাই এবং লীলাগুলি কিছু সংক্ষেপে লিখিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, রস-শাস্ত্রে রস-বিস্তার ক্রমে ক্রমে করিতে হয়। একেবারে রস প্রস্ফুটিত করিলে উহা কেহ আস্বাদন করিতে পারেন না। অনেক সময় অনিষ্টও হয়। যেমন অগ্রে তিক্ত

খাইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া শেষে পায়স খাইতে হয়, অগ্রেই পায়স খাইতে নাই,—রসাস্বাদের নিয়মও সেইরূপ। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি রস-বিস্তারের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। আর এক কথা, প্রভুর আদিলীলা কোথাও বিস্তার করিয়া বর্ণিত হয় নাই। প্রকৃত কথা, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড না পড়িলে সকলে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ধর্ম্ম কি; তাহা সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতে পারিবেন না। যিনি গৌরলীলা-রসে সাঁতার দিতে চাহেন তাঁহাকে দ্বিতীয় খণ্ডও পড়িতে হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু ইহা লইয়া আমি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু বিচার করি নাই। তবে যাঁহারা তাঁহার পূর্ণ ভক্ত নহেন, তাঁহাদের নিমিত্ত তাহাও স্থানে স্থানে করিয়াছি। সম্ভবতঃ সেই নিমিত্ত দুই একস্থানে গৌরভক্তগণের কিছু কিছু ক্লেশ হইতে পারে। কিন্তু সীতাকে যখন পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তখন হনুমান প্রভৃতি ভক্তগণের একবারও এ সন্দেহ হয় নাই যে, জনক-দুহিতা এ পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না।

হে গৌরভক্তগণ! শ্রীগৌরাঙ্গ সত্য বস্তু। যিনি যতই পরীক্ষা করুন না কেন, সত্য বস্তুর তাহাতে ভয় কি? সোনা যত অগ্নিতে দগ্ধ কর, ততই নির্ম্মল হইবে। গৌরলীলা লইয়া যিনি যত চর্চ্চা করিবেন, তিনি ততই শ্রীগৌরচরণে আকৃষ্ট হইবেন।

উপক্রমণিকা

চারিশত বৎসর হইল, আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের নবদ্বীপ নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই কয়েকটি নামে সচরাচর বিখ্যাত, যথা—নিমাই, বিশ্বম্ভর, গৌরহরি, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, মহাপ্রভু ইত্যাদি। এখন ভাগীরথীর পশ্চিম পারে নবদ্বীপ নামে যে গ্রাম আছে, তাহারই অপর পারে তখনকার নবদ্বীপ ছিল; বর্ত্তমান নবদ্বীপকে তখন কুলিয়া বলিত।

এই সময়ে বাঙ্গলার স্বাধীনতা লুপ্তপ্রায়। রাজা ছিলেন যবন, আর যদিও কখন কখন হিন্দু রাজা হইতেন, কিন্তু তিনি হয় কার্য্যগতিকে, কি রাজ্য-লোভে, নিজেই মুসলমান হইয়া যাইতেন, না হয় মুসলমান সেনাপতি বা ভৃত্য কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইতেন। একাদিক্রমে তিন পুরুষ হিন্দুরাজা তখনকার কালে আর হয় নাই।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সুবুদ্ধি রায় গৌড়ের রাজা ছিলেন। হোসেন খাঁ নামক এক পাঠান তাঁহার একজন প্রিয় ভৃত্য ছিল। এই ভৃত্য রাজ-আজ্ঞায় একটি দীঘি কাটাইবার ভার প্রাপ্ত হইয়া রাজ-অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল। রাজা তাহার অপরাধের নিমিত্ত তাহার পৃষ্ঠে চাবুক মারিয়াছিলেন। হোসেন খাঁ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ষড়যন্ত্র করে এবং সুবুদ্ধি রায়কে পদচ্যুত করিয়া আপনি রাজা হয়। সুবুদ্ধি রায় হোসেন খাঁর বন্দী হইলেন। আর হোসেন খাঁর স্ত্রী সুবুদ্ধি রায়কে বধ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু হোসেন খাঁ পূর্ব্ব

প্রভুর প্রাণদণ্ড না করিয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে যবনের জল পান করাইল। সুবুদ্ধি রায় এই নিমিত্ত হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। গৌড়ীয় পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, তপ্ত ঘৃত পান করিয়া কি তুষানল করিয়া প্রাণত্যাগ করাই তাঁহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। সুবুদ্ধি এরূপ ক্লেশকর প্রায়শ্চিত্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত ও নতুন ব্যবস্থা পাইবার আশায়, বারাণসীতে পণ্ডিতগণের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারাও ঐরূপ ব্যবস্থা দিলেন। সেই সময়ে তিনি হঠাৎ শুনিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ বারাণসী ধামে আগমন করিয়াছেন। তখন কোন সুযোগে তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভ করিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন। পড়িয়া আপনার পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা পাইয়াছেন তাহা বলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু করুণার্দ্র হইয়া বলিলেন যে, "প্রাণত্যাগ তমোধর্ম্ম। তুমি বৃন্দাবনে যাও, কৃষ্ণনাম কর, তোমার চিরদিনের যে পাপ আছে সমুদায় নষ্ট হইয়া অন্তিমে তাঁহার পাদপদ্ম পাইবে।" সুবুদ্ধি রায় প্রভুর এইরূপ আদেশ পাইয়া বৃন্দাবনে বাস করিলেন।

হোসেন খাঁ সাহা উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের রাজা হইলেন; তাঁহার অধীনে স্থানে স্থানে এক একজন কাজি রাখিলেন। ঐ সকল কাজি সৈন্য সামন্তে পরিবেষ্টিত থাকিতেন, রাজ্যশাসন বড় একটা করিতেন না! রাজ্যশাসন তাঁহাদের অধীনে হিন্দুরাজগণ করিতেন। ইঁহারা হিন্দুরাজগণের নিকট কর আদায় করিয়া আপনারা কিছু রাখিতেন, আর কিছু গৌড়ে পাঠাইতেন। এই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। আর যদি কখন তাঁহাদের নিকট কোন অভিযোগ হইত, তবে তাহার বিচারও করিতেন। কিন্তু অভিযোগ প্রায় হইত না। হিন্দুরাজগণ প্রকৃত রাজ্যশাসন করিতেন। আর কোন বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি, কি গ্রামের দুষ্ট লোক দমন প্রভৃতি সামান্য কার্য্য লোকেরা আপনা আপনিই

করিত। পানিহাটী গ্রামে এইরূপ একজন কাজি বাস করিতেন। শ্রীনবদ্বীপে চাঁদ খাঁ নামে একজন কাজি ছিলেন। তাঁহার বাস নবদ্বীপের এক অংশে বেলপুখুরিয়া গ্রামে ছিল। আর একজন কাজি শান্তিপুরের নিকট গঙ্গার ধারে থাকতেন, তাঁহার নাম ছিল মুলুক। তাঁহার গোরাই নামে একজন অমাত্য ছিল। সে গোঁড়া মুসলমান বলিয়া হিন্দুগণের প্রতি বড় অত্যাচার করিত।

সেই সময়কার হিন্দু-জমিদারগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম পাওয়া যায়। যেমন নবদ্বীপে বুদ্ধিমন্ত খাঁ। অম্বিকা কালনার নিকটে হরিপুরগ্রামে গোবর্দ্ধন দাস, ইনি বারলক্ষের জমীদার ছিলেন। বর্দ্ধমানের নিকট কুলীনগ্রামে মালাধর বসুর বংশীয়গণ। রাজসাহীতে খেতুর গ্রামে কৃষ্ণানন্দ দত্ত। ইঁহারা সকলেই কায়স্থ। আবুল ফজেল আইন-ই-আকবরীতে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলার সমস্ত জমীদারই কায়স্থ ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই কার্য্যদক্ষ ছিলেন ও নিয়মিতরূপে কর দিতেন বলিয়া কায়স্থগণ বাদসাহের বিশ্বাসপাত্র হইয়াছিলেন। আবুল ফজেল তখনকার মুসলমান ইতিহাস-লেখক। ইহাতে বোধ হয় তখন সমুদয় জমীদারী কার্য্য কায়স্থগণই করিতেন।

যে ব্রাহ্মণেরা বিষয়-কার্য্য করিতেন, তাঁহারা রাজসরকারে চাকরি করিতেন। ইঁহারা সমাজে কিছু অপদস্থ থাকিতেন! কায়স্থগণ জমীদার ছিলেন বলিয়া যে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত ছিলেন তাহা নহে। তখন ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদার সীমা ছিল না। কায়স্থগণ তাঁহাদের নিকট করযোড়ে থাকিতেন। নবশাকগণের ত কথাই নাই। ব্রাহ্মণগণ নবশাকগণের জল পান করিলে, তাহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। তাহাদিগকে মন্ত্র দীক্ষা দিলে, কি আমন্ত্রিত হইয়া তাহাদিগের বাটীতে গেলে, ব্রাহ্মণগণ পতিত হইতেন। সুতরাং নবশাকগণ আপনা

আপন জাতীয় ব্রাহ্মণগনের নিকট মন্ত্র লইতেন। তবে ইহাদের নিকট ব্রাহ্মণগনের যে কিছু প্রাপ্তি ছিল না, তাহা নহে। নানা উপলক্ষে তাহাদিগকে ব্যবস্থা দিয়া অধ্যাপকগণ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এবং ধনী নবশাকগণ কোন ক্রিয়াকর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়া পূজা করিতেন। সুতরাং ব্রাহ্মণগনের বিষয়-কার্য্য কি চাকরী করা বড় প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা প্রায়ই বিদ্যা-চর্চ্চা এবং ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতেন। অন্যান্য জাতিরা তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। তবে সকলের অপেক্ষা বৈদ্যজাতি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেন। তাঁহারা চাকরী কি বিষয়-কার্য্য কিছুই করিতেন না, জাতি-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সেই বৃত্তির জন্যই সমাজে, এমন কি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের নিকটও আদৃত হইতেন। ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা চাকরি করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে গৌড়ীয় বাদসাহের মন্ত্রী দবির খাস ও সাকের মল্লিক নামক দুইজন ব্রাহ্মণ-কুমারের কথা শুনা যায়। নবদ্বীপে যাঁহারা কোটাল ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও দুইজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা শুদ্ধশ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, নাম শ্রীজগন্নাথ রায় ও শ্রীমাধব রায়। ইহারাই জগাই মাধাই নামে বিখ্যাত।

নবদ্বীপ নগরে তখন ঐশ্বর্য্যের অবধি ছিল না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে, গঙ্গার এক এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিত। নগরে সকল জাতির বসতি ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাক প্রভৃতি পাড়া পাড়া বিলি করিয়া বাস করিতেন। এইরূপে শঙ্খবণিকের নগর, কংস্যবণিকের নগর ও তন্তুবায়ের নগর ছিল। আর এক পাড়ায় গোয়লাগণ বাস করিত। তখন গন্ধবণিকগণ সমাজে আদৃত ছিলেন। কিন্তু সুবর্ণবণিকগণ সমাজে অত্যন্ত অপদস্থ ছিলেন। নবদ্বীপে যে তাঁহাদের স্থান ছিল, এরূপ বোধ হয় না।

লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহ স্বচ্ছন্দে চলিত। এখনকার মতন তখন লোকের প্রয়োজন অধিক ছিল না, দুটী অন্ন পাইলেই চলিয়া যাইত। বিশেষতঃ তখন মোকদ্দমার ব্যয় ছিল না, কি কোন বলবৎ করও ছিল না। যাঁহাদের সম্পত্তি ছিল, তাঁহারা অতিথি অভ্যাগত ও দীন দুঃখীর সাহায্যে কিছু মাত্র কৃপণতা করিতেন না। অতিথি ফিরাইলে সমাজে কলঙ্কিত হইতে হইত। ব্রাহ্মণগণ প্রায় কায়স্থ জমীদারগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতেন। এইরূপে একা হরিপুরের গোবর্দ্ধন দাসই নবদ্বীপে বহুতর ব্রাহ্মণের প্রতিপালক ছিলেন।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বজ্জনের সমাজ বলিয়াই নবদ্বীপের প্রাধান্য ছিল। সে কথা পরে বলিতেছি। ধর্ম্মার্জ্জন করা তখন লোকের প্রধান কর্ম্ম ছিল। প্রভাত হইলেই নবদ্বীপবাসিগণ গঙ্গাস্নানে গমন করিয়া দলে দলে পূজা করিতে বসিতেন; আর গঙ্গা পুষ্পময় হইত। সন্ধ্যা হইলে ঐরূপ আবার লক্ষ লক্ষ লোকে গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন। গঙ্গা-পুলিনের ধারে ধারে প্রশস্ত পথে ফল-পুষ্প সুশোভিত নানাজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী ছিল। সেই সকল বৃক্ষতলে বসিয়া পণ্ডিতগণ বিদ্যা-চর্চ্চা করিতেন। তখনকার কালে অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিতেন। আর তীর্থ-পর্য্যটন ভদ্রলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এমন কি, তীর্থ-দর্শন কুলীনগণের একটা কুল-লক্ষণ ছিল। অথচ তীর্থ-পর্য্যটন কষ্টকর ছিল, পথ ঘাট বড় ছিল না, বিশেষতঃ অরাজকতার নিমিত্ত সকল স্থানেই দস্যুভয় ছিল। তখন লোক সমুদায় এখন অপেক্ষা সুস্থ, বলিষ্ঠ ও ক্লেশ-সহিষ্ণু ছিল। তখনকার বাঙ্গালীরা এখনকার অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন। ভদ্রলোকে অনেকে যুদ্ধে পটু ছিলেন না; কেননা বিদ্যা ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনে বিব্রত থাকায় রক্তারক্তিতে তাঁহাদের স্পৃহা ছিল না। যদিও তখন পথ

দুর্গম ছিল, তবু বহুতর লোক তীর্থ-ভ্রমণ করিতেন। ক্লেশ সহ্য করা এমন অভ্যাস ছিল যে, দুই চারি দিনের উপবাসেও কেহ বিশেষ ক্লিষ্ট হইতেন না।

গৌড়দেশ হইতে যাঁহারা তীর্থে গমন করিতেন, তাঁহারা প্রায় দক্ষিণ দেশেই যাইতেন। তাহার কারণ, তখন পশ্চিমে হিন্দু-মুসলমানে সর্ব্বত্রই বিবাদ চলিতেছিল, কাজেই যাতায়াতের পথ বন্ধ ছিল। এমন যে শ্রীবৃন্দাবন, তাহাও মুসলমানদের উৎপাতে জঙ্গলময় হইয়াছিল, সুতরাং তখন প্রায় কেহই বৃন্দাবনে যাইতেন না। তখন যাঁহারা তীর্থে যাইতেন তাঁহারা শ্রীক্ষেত্র হইয়া বিষ্ণুকাঞ্চী শিবকাঞ্চী প্রভৃতি দর্শন করিয়া কন্যা কুমারী যাইতেন। পরে সেখান হইতে নাসিক, পাণ্ডুপুর, সৌরাষ্ট্র, দ্বারকা দর্শন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

পূজা অর্চ্চনার মধ্যে প্রায় ভদ্রলোক মাত্রেরই বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈদ্য, প্রায় সকলেই শাক্ত ছিলেন। কেহ কেহ রামমন্ত্র উপাসকও ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প ছিল। ভব্যলোকের মধ্যে কেহ বৈষ্ণব ছিলেন না বলিলেও চলে। এমন কি, যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত আদর করিয়া পাঠ করিতেন, তাঁহারাও অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে মানিতেন না। নবশাকদের মধ্যে কেহ-কেহ বৈষ্ণব ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আপন জাতীয় ব্রাহ্মণের নিকট হইতে মন্ত্র লইতেন, তাঁহাদের বিশেষ কোনরূপ বৈষ্ণব-লক্ষণ ছিল না। তবে অতি অল্প সংখ্যক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে গোস্বামী বলিতেন ও বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি নবশাকগণের অবস্থা অতি মন্দ ছিল, সুতরাং তাঁহারা যে কি উপাসনা করিতেন ও তাঁহাদের বৈষ্ণবধর্ম্ম কিরূপ ছিল, তাহা এখন জানা যায় না।

ইহার মধ্যে একদল তন্ত্রসাধন করিতেন। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল যাগ

যজ্ঞ মন্ত্র প্রভৃতি নানারূপ ক্রিয়ার দ্বারা দেবতা কি অপদেবতাগণকে বশ করা।* ইঁহারা মদ্যপান, মাংসাহার, সর্ব্ববর্ণ একত্র ভোজন প্রভৃতি সমাজ বিরুদ্ধ আচারে লিপ্ত থাকায়, তামসী নিশিতে নির্জ্জনে আপনাদের সাধনা করিতেন।

সমাজের কর্ত্তা ছিলেন অধ্যাপকগণ। ইঁহারা বহু পরিশ্রমে বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই তাঁহাদের ধর্ম্মের উপর আস্থা কমিয়া যাইত। এই অধ্যাপকগণ মধ্যে নৈয়ায়িকগণ আবার সকলের উপর প্রভুত্ব করিতেন। তাঁহারা অগাধ বিদ্যাবলে, বুদ্ধির চাতুর্য্যে, তর্কের ছটায় ও বাক্‌জালবিন্যাসে, সমস্ত দেশ স্তম্ভিত করিতেন। ক্ষোভের মধ্যে এই যে, ধর্ম্মের প্রতি ইঁহাদের আন্তরিক আস্থা প্রায়ই ছিল না।

যখনকার কথা বলিতেছি, সেই সময় ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চার নিমিত্ত নবদ্বীপ সমুদয় ভারতে বিখ্যাত হইয়াছিল। এ ন্যায়শাস্ত্র পূর্ব্বে নবদ্বীপে ছিল না; ইহার চর্চ্চা মিথিলায় হইত; আর ন্যায় পড়িতে হইলে নবদ্বীপের ও অন্যান্য স্থানের পড়ুয়াগণকে মিথিলায় গমন করিতে হইত। মিথিলাবাসী পণ্ডিতগণ গৌড়ীয় পড়ুয়ার বুদ্ধি-তীক্ষ্ণতা দেখিয়া সশঙ্কিত ছিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের আধিপত্য নষ্ট হইবে। এই আধিপত্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা গৌড়ীয় কোন ছাত্রকে ন্যায়ের কোন পুস্তক সঙ্গে আনিতে দিতেন না। কাজেই পুস্তক অভাবে নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল হইতে পারিত না।

ইহার কিছুকাল পূর্ব্বের কথা শ্রবণ করুন। সর্ব্বপ্রথমে রামভদ্র

* কেহ কেহ বলেন যে, তন্ত্রসাধনের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র ভারতবর্ষ যবন অধিকার হইতে উদ্ধার করা। কিন্তু সে কথা এখানে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে একটি সামান্য প্রকার ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন। নবদ্বীপে রামচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশের সমকালে প্রধান অধ্যাপক দুইজনের নাম শুনা যায়, যথা মহেশ্বর বিশারদ ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীগৌরাঙ্গের মাতামহ। বিশারদের বাড়ী নবদ্বীপের বিদ্যানগরে। তাঁহার দুই পুত্র সার্ব্বভৌম ও বাচস্পতি। ইঁহারা দুই জনে রামভদ্রের টোলে ন্যায় অভ্যাস করিতে লাগিলেন। বিশারদের যেরূপ সতেজ বুদ্ধি, তাঁহার দুই পুত্রেরও সেইরূপ; তবে বোধ হয়, সার্ব্বভৌমের ন্যায় (ইঁহার নাম বাসুদেব) বুদ্ধিমান্ তখন ভারতে কেহ ছিল না। রামভদ্র ন্যায়শাস্ত্র পড়ান বটে, কিন্তু গ্রন্থ অভাবে পদে পদে পদস্খলন হয়। ইহা দেখিয়া, আর পড়িতে অনেক কষ্ট পাইয়া, বাসুদেব মনোমধ্যে একটি সংকল্প করিলেন। সেটি এই যে, তিনি যে গতিকেই হউক মিথিলা হইতে ন্যায়ের গ্রন্থ নবদ্বীপে আনয়ন করিবেন। এই মনস্থ করিয়া আর পাঠ সমাপ্তির নিমিত্ত, বাসুদেব মিথিলায় গমন করিলেন। কিছুকাল পরে ন্যায়ের বৃহৎ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে আসিলেন। এই অমানুষিক ব্যাপারের নিমিত্ত বঙ্গদেশ চিরকাল বাসুদেবের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই প্রথম নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল স্থাপিত হইল।

এইরূপে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ন্যায়ের গ্রন্থ নবদ্বীপে আনিলেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মিথিলার একাধিপত্য লোপ হইয়া নবদ্বীপে আসিল। সার্ব্বভৌমের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল, এবং পড়ুয়াগণ ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহার টোলে আসিয়া শ্রীনবদ্বীপ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে নবদ্বীপের সৌভাগ্য বহু গুণ বৃদ্ধি পাইল।

বিবেচনা করিতে গেলে নবদ্বীপের প্রতিপত্তি, বাণিজ্যের স্থান, কি রাজধানী বলিয়া ছিল না। সর্ব্বদেশেই রাজার কি বাণিজ্যের স্থান বলিয়া

নগরের সৃষ্টি হয়। কিন্তু নবদ্বীপে বাণিজ্যের তাদৃশ সুবিধা বা বিস্তার ছিল না, এবং নবদ্বীপ তখন রাজধানীও নহে,—নবদ্বীপের বাণিজ্য কেবল বিদ্যা লইয়া। নবদ্বীপে ভদ্রলোক মাত্রেই বিদ্যারসে একেবারে উন্মত্ত ছিলেন। কি বৃদ্ধ কি বালক, কি নর কি নারী, সকলেরই মধ্যে শাস্ত্রালাপ ব্যতীত আর প্রায় কোন কার্য্যই ছিল না।

নবদ্বীপের তখন যে অবস্থা হইল, তাহা কোথাও কোন কালে দেখা যায় নাই। কোন নগর কখন যুদ্ধের নিমিত্ত উন্মত্ত হয়, কখন বা নাগরিয়াগণ ধনোপার্জ্জনের নূতন কোন পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় উন্মত্ত হয়, আবার কখন বা কোন নূতন ধর্ম্ম লইয়া, কি কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্ত্তন লইয়া উন্মত্ত হয়। কিন্তু নবদ্বীপ নগর বিদ্যা লইয়া উন্মত্ত হইল। ভদ্রলোকে অন্যান্য চিন্তা একেবারে ছাড়িয়া দিল। সকলেরই মনের ভাব যে বিদ্যা উপার্জ্জনই জীবের প্রধান সাধন। যে পণ্ডিত, তাহারই জীবন সার্থক। যে পণ্ডিত সেই মনুষ্য, সেই রূপবান্, সেই কুলীন, এবং সেই সুখী। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই বিদ্যা উপার্জ্জনের চেষ্টা আরম্ভ হইত। মাতার একমাত্র ইচ্ছা পুত্র পণ্ডিত হয়, পিতার ত হইবেই। যাহার কন্যা থাকিত, তিনি পণ্ডিত জামাইকে কন্যা দান করিতেন। ধনী লোকে বিদ্বান্ লোক প্রতিপালনের নিমিত্ত ধন ব্যয় করিতেন। বিদ্বান্ লোক পথে দেখিলে সকলে একপাশ হইতেন। এইরূপে সহস্র সহস্র লোকে নিবানিশি বিদ্যাচর্চ্চা করায় নবদ্বীপের আকৃতি প্রকৃতি অন্য নগর হইতে পৃথক্ হইয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা ঘাটে শাস্ত্র-চর্চ্চা করিতেছে; বালকগণ স্থানে স্থানে বিদ্যা-যুদ্ধ করিতেছে, আর পড়ুয়াগণ নগর একেবারে অধিকার করিয়া লইয়াছে। পড়ুয়াগণ দলে দলে নগরে বেড়াইতেছে, গঙ্গাতীরে স্থানে স্থানে মণ্ডলী করিয়া সহস্র সহস্র পড়ুয়া বিদ্যাচর্চ্চা করিতেছে। প্রত্যহ সহস্র সহস্র পড়ুয়া নানা স্থান হইতে নগরে প্রবেশ করিতেছে। সকলেরই বাম

হাতে পুঁথি, পুথি ছাড়িয়া পড়ুয়াগণের বাহিরে যাইবার যো নাই। পুঁথি তাহাদের ভূষণ, তাহাদের সঙ্গী, বন্ধু ও বল।

প্রত্যেক গলিতে টোল, প্রত্যেক টোলে সহস্র সহস্র পড়ুয়া। স্নান করিবার সময় ঘাটে পড়ুয়ায় পড়ুয়ায় দেখাদেখি হইত, আর বিদ্যাচর্চ্চা ও তর্ক আরম্ভ হইত। এক অধ্যাপকের ছাত্রের সঙ্গে অন্য অধ্যাপকের ছাত্রের বিবাদ বাধিত, কখন কখন এই যুদ্ধে মারামারি পর্য্যন্ত হইত; কেহ বা সন্তরণ দিয়া ওপারে পলায়ন করিত। স্নানের সময় পড়ুয়ার উৎপাতে গঙ্গা কর্দ্দমময় হইত।

নবদ্বীপে বহুতর লোকের বাসাবাড়ী ছিল। কেহ বা পুত্রকে অধ্যয়ন করাইবার নিমিত্ত এবং কেহ বা বিদ্যা-চর্চ্চা করিতে কি শুনিতে নবদ্বীপে থাকিতেন। আবার কেহ কেহ বিখ্যাত অধ্যাপকগণকে দর্শন করিতেও আসিতেন। নবদ্বীপে না পড়িলে কাহারও বিদ্যার সমাপ্তি হইত না।

যদি কোন দেশে কেহ পণ্ডিত হইতেন, তবে তিনি নবদ্বীপে পরীক্ষা দিতে বা দম্ভ করিয়া জয়লাভ করিতে আসিতেন, এবং নগরে তখন হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। বিদ্যাই ছিল নবদ্বীপের একমাত্র উৎসব ও আনন্দ।

এইরূপ যখন নবদ্বীপের অবস্থা, সেই সময় সার্ব্বভৌম, ন্যায় গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া টোল স্থাপন করিলেন। ভগবানের একটি নিয়ম আছে যে, তাঁহার কাছে একান্ত মনে যাহা চাও, তিনি তাহাই দিয়া থাকেন। নবদ্বীপের লোক যেমন বিদ্যা বিদ্যা করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন, তেমনি এই অদ্ভুত নগরে বিদ্যা শিখিবার লোকের সৃষ্টি ও আবির্ভাব হইতে লাগিল। সার্ব্বভৌম যখন টোল বসাইলেন, তখন রঘুনাথ, রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ছাত্রগণ সেখানে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেছিলেন, এবং সার্ব্বভৌম টোল করিলেই উহারা সকলেই তাঁহার টোলে প্রবেশ করিলেন।

রঘুনাথ—ইনি দিধীতির গ্রন্থকার। ন্যায়ের এরূপ গ্রন্থ আর নাই। তাঁহার ন্যায় নৈয়ায়িক জগতে আর সৃষ্ট হয় নাই।

ভবানন্দ—ইনি রঘুনাথের সমকক্ষ জগদীশের গুরু। ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, পণ্ডিত জগদীশের নামে ন্যায়শাস্ত্রকে জাগদিশী বলে।

রঘুনন্দন—ইনি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য। ইনি স্মৃতি অষ্টবিংশতি অধ্যায়ে বিভাগ করিয়া যে স্মৃতি-তত্ত্বের সৃষ্টি করেন, তাহা অদ্যাবধি বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতেছে।

কৃষ্ণানন্দ—ইনি তন্ত্রসার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইনি তন্ত্রশাস্ত্রের রাজা।

এই সকল লোক চিরদিন পূজিত থাকিবেন। ইঁহাদের ন্যায় পণ্ডিত বঙ্গদেশে প্রায় কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইঁহারা যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি দেদীপ্যমান রহিয়াছে; আর যত দিন সংস্কৃতভাষা থাকিবে, ততদিন ইঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইঁহারাই নবদ্বীপের, বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের ভূষণ স্বরূপ। ইঁহাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহা বিচার করা দুষ্কর ও নিষ্প্রয়োজন। এই সময়ে এই সমস্ত ছাত্র পরিবেষ্টিত হইয়া সার্ব্বভৌম বিরাজ করিতেছিলেন।

এই টোলে কিছুকালের জন্য আর একটি ছাত্র পড়িয়াছিলেন। উপরে যে সকল জগদ্বিখ্যাত পড়ুয়াগণের নাম করা গেল, তাঁহারা সকলেই এই ছাত্রটীকে ভয় করিতেন। ইঁহার নিকটে সকলেরই প্রতিভা লোপ পাইয়াছিল। ইঁহারই কথা এই গ্রন্থে লিখিব।

এইরূপে বাসুদেব কর্ত্তৃক নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু তাঁহার আর বেশী দিন নবদ্বীপে বাস করা হইল না। তখন উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র গজপতি। এই রাজার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মুসলমানগণ তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না।

তিনি সার্ব্বভৌমের যশ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সমাদর করিয়া এবং বৃত্তি দিয়া নিজের রাজধানীতে লইয়া গিয়া স্থাপন করিলেন। তখন সার্ব্বভৌমের টোল নীলাচল পুরীতে হইল। কিন্তু তাহাতে নবদ্বীপের বড় ক্ষতি হইল না। কেন না, যেমন সর্ব্বেভৌম নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন, তেমনি রঘুনাথ রহিলেন, ভবানন্দ রহিলেন, রঘুনন্দন রহিলেন, ও সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতি রহিলেন। সার্ব্বভৌম নীলাচল গিয়াছেন শুনিয়া ভারতের তাবৎ স্থান হইতে পড়ুয়াগণ সেখানে জুটিতে লাগিল। সার্ব্বভৌম শুদ্ধ যে ন্যায়-শাস্ত্র পড়াইতেন তাহা নহে, বেদ বেদান্ত এবং দণ্ডীদিগের উপযোগী অন্যান্য শাস্ত্রও পড়াইতেন ; বহুতর দণ্ডী তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

জগন্নাথ মিশ্র নামক একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ, এই সার্ব্বভৌমের সমাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি উপেন্দ্র মিশ্রের তনয়। নিবাস ছিল শ্রীহট্টের মধ্যে ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে। উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্র, জগন্নাথ তৃতীয়। এই জগন্নাথ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসেন, আসিয়া পরম পাণ্ডিত্য লাভ করেন। দেখিতে পরম সুন্দর ; এমন কি, নবদ্বীপে তিনি একজন অদ্বিতীয় রূপবান ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। শুধু তাহা নহে, জাত্যংশেও কুলীন, ভরদ্বাজ * বংশজাত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, সার্ব্বভৌমের পিতা বিশারদ ও গুরু রামভদ্র, এক সময়ের লোক। এই নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম শচী। এই শচীদেবীর সহিত নীলাম্বর জগন্নাথ মিশ্রের রূপ গুণ দেখিয়া বিবাহ দিলেন। জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত পুরন্দর আখ্যা পাইয়াছিলেন। তিনি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া,

* অমৃত বাজার পত্রিকা অফিস হইতে মুদ্রিত মুরারি গুপ্তের কড়চায় মহাপ্রভু বাৎস্যগোত্রীয় বলিয়া জানা যায় ; কিন্তু প্রাচীন বৈদিক ঘটকদিকের কারিকায় তিনি ভরদ্বাজগোত্রীয় বলিয়া লিখিত আছেন।

অন্যান্য শ্রীহট্টিয়দের নদীয়ার যে পাড়ায় বসতি ছিল, সেই পাড়ায় বাস করিয়া শচীদেবীকে লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই জগন্নাথ ও শচী আমাদের নিমাইয়ের পিতা ও মাতা। নীলাম্বর তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নকে দান করেন। চন্দ্রশেখর জগন্নাথের বাড়ীর নিকটে বাস করিতেন।

জগন্নাথ মিশ্র আর শ্রীহট্টে ফিরিয়া গেলেন না। যদিও দরিদ্র, তবু তাঁহার সংসার-যাত্রা অনায়াসেই নির্ব্বাহ হইত। জগন্নাথের উপর্য্যুপরি আট কন্যা হয় এবং সবগুলিই নষ্ট হয়। তাহার পরে এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম রাখেন বিশ্বরূপ। এই পুত্র দম্পতির সর্ব্বস্ব-ধন ছিল। বিশ্বরূপ রূপে গুণে অতুলনীয় ছিলেন। পুত্রের বয়স যখন আন্দাজ আট বৎসর, তখন জগন্নাথের পিতামাতার নিকট হইতে আজ্ঞাপত্র আসিল; তাহাতে লেখা ছিল যে তিনি যেন স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে সত্বর তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসেন। পিতামাতার এই আজ্ঞাপত্র আসিলে শচীদেবীও শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে দর্শন জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা দুইজনে তখন পুত্রটিকে লইয়া যাত্রা করিয়া, ক্রমে শ্রীহট্টে নিজ গৃহে পৌঁছিলেন।

ইহা ১৪০৬ শকের কথা। ঐ শকের মাঘ মাসে শচীদেবীর আবার গর্ভ হইল। তখন বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম নয় কি দশ বৎসর। কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই যে জগন্নাথের ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না; তবে তাঁহার মাতা শোভাদেবীর আদেশক্রমে তিনি স্ত্রী-পুত্র লইয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। শোভাদেবী রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে, কোন মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন যে, তাঁহার পুত্রবধুর গর্ভে শ্রীভগবান্‌চন্দ্র স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছেন, অতএব তিনি যেন শীঘ্রই ইঁহাদিগকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। এইজন্য শোভাদেবী জগন্নাথকে শীঘ্র নবদ্বীপে গমন করিতে আদেশ করেন।

দশহরার সময় গঙ্গাস্নানের যাত্রিগণ সমভিব্যাহারে, জগন্নাথ স্ত্রী-পুত্র লইয়া নবদ্বীপের বাড়ীতে ফিরিলেন। শচীর গর্ভ দশম মাস উত্তীর্ণ হইল তবু পুত্র কন্যা কিছুই হইল না। ক্রমে একাদশ মাসও উত্তীর্ণ হইল। মাঘ মাসে গর্ভ হইয়াছিল, আবার মাঘ মাস আসিল, তবু শচী প্রসব করিলেন না। পরে ফাল্গুন মাস আসিল, তখন জগন্নাথ ব্যস্ত হইয়া শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে ডাকাইলেন। তিনি বিখ্যাত গণক। নীলাম্বর গণনা করিয়া দেখিলেন, অতি সত্বর শচী প্রসব করিবেন এবং তাঁহার গর্ভে কোন এক মহাপুরুষ জন্ম লইবেন। এই কথা শুনিয়া সকলে সুস্থির হইলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জ্যোতিষপ্রকাশ গ্রন্থকার এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা :—

চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড় বর্গ অষ্ট বর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ॥

এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মপত্রিকা দিয়াছেন; দিয়া তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র যে সত্য ইহাই প্রমাণ করিবার নিমিত্ত, গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মপত্রিকা দ্বারা দেখাইয়াছেন। অন্যান্য বহুতর জ্যোতিষীগণও এই জন্মপত্রিকা বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ইহাই সাব্যস্ত করিয়াছেন যে এরূপ "সর্ব্ব শুভক্ষণ" হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট।

শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত

প্রথম অধ্যায়

১৪০৭ শকে, পবিত্র জাহ্নবীতীরস্থ বিদ্বজ্জনপরিশোভিত নবদ্বীপ নগরে, মনোহর ফাল্গুন মাসে, নির্ম্মল পূর্ণিমা নিশিতে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইলেন। যেমন সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বদিকে একখানি সোনার থালার ন্যায় চন্দ্র উদয় হইলেন, অমনি শ্রীগৌরাঙ্গ, সিংহ রাশিতে পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্রে, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। সেই সময় আবার চন্দ্রগ্রহণ হইল এবং নবদ্বীপ নগরে সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। গৌরভক্তগণ এই সমুদায় ঘটনা লইয়া নানা কথা বলিয়া থাকেন। শ্রীপাদ কবি কর্ণপুর বলেন যে, চন্দ্রগ্রহণ হইবার আর কোন কারণ ছিল না। বিধি দেখিলেন যখন অকলঙ্ক চন্দ্রস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় হইলেন, তখন আর সকলঙ্ক চন্দ্রের প্রয়োজন নাই। ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত বিধির ইচ্ছাক্রমে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিল। অন্য কেহ বলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলে, সেই মহাব্যাপার ঘোষণা করিবার নিমিত্ত গ্রহণ হইল, যেহেতু গ্রহণ হইলে লোক মাত্রেই হরিধ্বনি করিবে। প্রকৃত কথা, যেই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন, অমনি নবদ্বীপবাসী সকলে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সে যাহা হউক, এইরূপে হরিধ্বনির সহিত যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যে নগরে লোক কেবল বিদ্যা বিদ্যা বিদ্যা করিয়া উন্মত্ত; যে সমাজে সূচ্যগ্রভাগাপেক্ষা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিত লোক বিদ্যমান; যে ন্যায়শাস্ত্রে

ভগবান্‌কে স্থাপন করিতেছে ও আবার খণ্ডন করিতেছে ; সেই নগরে সেই সমাজে সেই তর্ক-তরঙ্গের মাঝে শ্রীগৌরাঙ্গ উদিত হইলেন। ইহাতে গৌরভক্তগণের মনে নানা ভাব উঠিতে পারে। এরূপ মনে হইতে পারে যে, সমস্ত বিদ্যাচর্চ্চার চরম ফল কি, তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যাচর্চ্চার ফলস্বরূপ স্বয়ং উদয় হইলেন। এরূপও কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, পাছে লোকে এ কথা বলে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল নির্ব্বোধ লোককে ভুলাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি সময় বাছিয়া সার্ব্বভৌমের সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতি প্রখর বুদ্ধিমান লোক, যাহাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, যাঁহারা তর্কশাস্ত্র পড়িয়া স্বভাবতঃ আপনাদিগকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে আসীন ভাবেন, এমন কি শ্রীভগবানের আধিপত্য পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে গ্লানি মনে করেন, তাঁহারা একপ্রকার দৈত্য ; তাঁহাদের ভয়ে দেবগণ পর্য্যন্ত কম্পিত হয়েন এবং যত শুভ সমুদায় লুকাইয়া থাকে। যখন হিরণ্যকশিপু বিরাজমান, তখন তাহার দৈত্যভাব জগতে আধিপত্য করিত, আর যাহা কিছু ভাল লুকাইয়া ছিল। সেই সময় শ্রীভগবান নৃসিংহরূপে অকুতোভয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেইরূপই কি শ্রীগৌরাঙ্গ, যখন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ বিরাজ করিয়াছিলেন, সেইকালে তাঁহার উদয় হইবার উপযুক্ত সময় ভাবিয়াছিলেন ? এ সমস্ত নিগূঢ় কথা আমরা ক্ষুদ্র জীব কিরূপে বুঝিব ?

শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে একটি বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ ছিল, তাহারই তলাতে আঁতুড় ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইলেন। ধাত্রী দেখিলেন যে শিশুটীর জীবনের চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। তখন তাঁহাকে জীবিত করিবার জন্য সকলে যত্ন করিতে লাগিলেন। একটু পরে শিশুটির নিশ্বাস পড়িতে লাগিল দেখিয়া সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। শিশুর শরীরটী

অপেক্ষাকৃত কিছু বড়, কারণ ইনি ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন। বর্ণ একেবারে কাঁচা সোনার ন্যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীহট্টিয়গণ যে পাড়ায় বাস করিতেন, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র সেই পাড়ায় গৃহনির্ম্মাণ করেন। এই পাড়ায় শ্রীমুরারি গুপ্ত বৈদ্যের বাস ছিল। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন মুরারির বয়স আন্দাজ পনর বৎসর। এই মুরারি গুপ্ত কর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা লিখিত হয় এবং ঐ গ্রন্থকে মুরারি গুপ্তের কড়চা বলে। অনন্ত সংহিতা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে এবং মুরারীর কড়চায় শ্রীগৌরাঙ্গের আদিলীলা লিখিত আছে। জগন্নাথ পুত্রের নাম রাখিলেন বিশ্বম্ভর। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও বয়স্যগণ তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতেন, কিন্তু তাঁহার জননী তাঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন। আর পরিশেষে সেই নামে তিনি নবদ্বীপে সর্ব্বসাধারণের নিকট বিখ্যাত হন। তাঁহার সূতিকাগৃহ নিম্ববৃক্ষতলে ছিল বলিয়া এই নামের সৃষ্টি হয়; কিম্বা নিম্ব তিত, এই জন্য নিমাইকে যমের নিকট তিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার জননী তাঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন, তাহা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। উপবীতকালে তাঁহার আর একটি নাম হয় "গৌরহরি"। তাহার বৃত্তান্ত পরে বিবৃত হইবে। ভক্তগণ তাঁহার "শ্রীগৌরাঙ্গ" কি "গৌর" নাম রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশেষের নাম "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

এই যে শিশুটী শচী ও জগন্নাথ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি ঠিক অন্য শিশুর ন্যায় নহে। প্রথমতঃ যেরূপ বয়স, তাহা অপেক্ষা তাঁহার শরীর অনেক বড়, সেই শরীরে রোগমাত্র নাই; আর শিশু এরূপ বলবান ও চঞ্চল যে নারীগণ তাঁহাকে কোলে করিয়া রাখিতে পারেন না। শিশুর আর একটি প্রকৃতি দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন

হইলেন। শিশু স্বভাবে যখন রোদন করে, তখন হরিনাম শুনাইলেই চুপ করে। অন্য রমণীর কোলে আঙ্গিনায় নিমাই রোদন করিতেছে, শচীরাণী ঘরে রন্ধন করিতেছেন, রমণী নিমাইকে থামাইতে পারিতেছেন না; তখন শচী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "তুই হরি হরি বল্, ছেলে থামিবে এখন।" বাস্তবিক তাহাই হইত। রোরুদ্যমান শিশু সঙ্গীত-যন্ত্রের ধ্বনি শুনিলে যেরূপ চুপ করে, হরিনাম শুনিলে রোরুদ্যমান নিমাই সেইরূপ অমনি চুপ করিত। এদিকে নিমাই কোলে থাকিবে না, নামিয়া পড়িবে। তখন হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে, কোল হইতে নামিয়াই জানুযোগে দ্রুতগতিতে চলিবে। অন্যমনস্ক হইলেই কোথায় পলাইবে ঠিকানা নাই। এই জন্য নিমাইকে আঙ্গিনায় নামাইয়া প্রতিক্ষণ তাহার প্রতি লক্ষ রাখিতে হইত। একটু ফাঁক পাইলেই নিমাই আঙ্গিনা ছাড়িয়া রাজপথে উপস্থিত হইল, কি গঙ্গামুখে চলিল; আর যদি দেখিল তাহাকে কেহ ধরিতে আসিতেছে, তবে জানু পাতিয়া দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিল। নিমাই যখন এইরূপ হামাগুড়ি দিয়া চলিত, তখন তাহার এক অপূর্ব্ব শোভা হইত। এই শোভা দর্শন করিবার নিমিত্ত শচী তাহাকে আঙ্গিনায় ছাড়িয়া দিতেন এবং তাঁহার সঙ্গীনীদের সঙ্গে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া তাহা দর্শন করিতেন। পদ-কর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ নিমাইয়ের হামাগুড়ি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচী-বালা॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্ব-ফল জিনি সুন্দর অধর॥
অঙ্গদ বলয় শোভে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড় বাঘ-নখ গলে॥

সোণার শিকলি পিঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা॥

নিমাই যখন হাঁটিতে শিখিল, তখন তাহাকে লইয়া জগন্নাথ, শচী ও বিশ্বরূপ, এবং আত্মীয় প্রতিবাসিগণ, সকলেই শশব্যস্ত হইলেন। কোথা কোন্ দিক হইতে নিমাই ছুটিয়া পলাইবে, আর নগরে হারাইয়া যাইবে. সকলের এই ভয়। বিশেষতঃ একদিন নিমাই একটি সর্প ধরায় তাঁহারা আর তাহাকে বিশ্বাস করিতেন না। আর এক দিন এইরূপ আর একটী বিপদ হয়।

এক দিবস মেষমালী (শিবগীতা গ্রন্থ) নামক একজন চোর, শিশুটিকে এইরূপে পথে সহায়হীন ও স্বর্ণ-আভরণে ভূষিত দেখিয়া লোভপ্রযুক্ত তাহাকে লইয়া পলাইল। বাড়ীর সকলে হঠাৎ নিমাইকে না দেখিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কত শত লোক পথ দিয়া যাইতেছে, কে কাহার তল্লাস করে? নিমাইয়ের উদ্দেশ্য না পাইয়া সকলে যখন চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়াছেন, তখন নিমাই দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া পিতার কোলে উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, কে একজন তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, আর সেই রাখিয়া গেল। এই মেষমালীর কথা এখন শ্রবণ করুন। এই দস্যু নিমাইকে স্কন্ধে করিবামাত্র বালকটীর প্রতি তাহার গাঢ় স্নেহ ও আকর্ষণ হইল। এই শিশুটীকে বধ করিতে হইবে, এই কথা মনে করিয়া তাহার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। তখন সে কিরূপ নৃশংস ও দুরাচার তাহা মনে বুঝিতে পারিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে প্রথমে নিমাইকে দ্বারে রাখিয়া চলিয়া গেল, পরে তাহার হৃদয়ে ঔদাস্যের উদয় হইল, এবং সেইক্ষণ হইতে মেষমালী সংসার ত্যাগ করিয়া পরম সাধু হইলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শিশুটির আকৃতি মনুষ্যের মত হইলেও, ঠিক অন্যান্য শিশুর মত ছিল না। মনুষ্যের এরূপ গলিত কাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গের বর্ণ হয়, ইহা কবিগণ বর্ণনা করিতেন বটে, কিন্তু এই শিশুতেই প্রথমে সকলে উহা প্রত্যক্ষ করিলেন। হস্ততল ও পদতল যেন হিঙ্গুল দ্বারা রঞ্জিত। যখন আঙ্গিনা দিয়া শিশুটি হাঁটিয়া যাইত, তখন বোধ হইত যেন পদতল দিয়া শোণিত ক্ষরিয়া পড়িতেছে। অঙ্গের গঠন সুঠাম। প্রতি অঙ্গের চলন, প্রতি অঙ্গের গতি, নয়নের দৃষ্টি, মুখের হাসি এবং কথা—সমুদায়ই লাবণ্যময়। প্রফুল্ল বদন যেন কুঁদে কাটা,—একেবারে দোষশূন্য। ঠোঁট দু'খানি পক্ক বিম্বের মত। কিন্তু বোধ হয় নয়ন দু'টীই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের এরূপ আঁখি হইতে পারে, ইহা শিশুকে দেখিবার পূর্ব্বে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। নয়ন দু'টি পদ্মফুলের ন্যায় দীঘল ছাঁদের, তাহাতে ঈষৎ রক্তবর্ণের আভা প্রকাশ পাইতেছে, যেন তাহার মধ্যে করুণা-রূপ মকরন্দ টলমল করিতেছে। শিশুটী যাহার প্রতি চাহিত, তাহারই চিত্ত, তদ্দণ্ডে হরণ করিয়া লইত। তাহাকে যে দেখিত, তাহারই মনে কি একটী নূতন ভাবের উদয় হইত। সে ভাবটি এই যে—এইটী কি মনুষ্য-শিশু না দেব-শিশু ?

নিমাইয়ের আর একটি অপ্রাকৃতিক গুণ দেখা যাইত, তাহাকে কোলে লইলেই শরীর আনন্দে পুলকিত হইত। কি পুরুষ কি নারী নিমাইকে কোলে করিলে, আর ছাড়িতে চাহিতেন না। সুতরাং শচী আর পুত্রকে কোলে করিবার বড় একটা অবকাশ পাইতেন না।

ইহা ব্যতীত শিশুর জন্ম হইতে শচী, জগন্নাথ ও অন্যান্য নিজ জনে অনেকরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখিতে লাগিলেন। শিশু যখন নিদ্রা যাই-তেছে তখন কেহ দেখিল যে, তাহার হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় কি জ্বলিতেছে। কখন দেখিল সর্ব্বাঙ্গ বিদ্যুৎ দ্বারা আবৃত। আবার কখন শচীদেবী গৃহমধ্যে

বহুতর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন. তখন ভয় পাইয়া জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকিতেন। কখন ভাবিতেন এ সব চোর, আবার কখন ভাবিতেন ইহারা ডাকিনী। ডাকিনী ভাবিয়া শচীদেবী পুত্রের মাথায় রক্ষা বান্ধিয়া দিতেন, ও সর্ব্বাঙ্গে থুথু দিয়া মন্ত্র পড়িয়া পুত্রের প্রতি-অঙ্গ জনার্দ্দনকে সঁপিয়া দিতেন।

এক দিবস রজনীযোগে শচীর কোলে শিশু ঘুমাইয়া আছে, শচীদেবী দেখিলেন যে, নানাবিধ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁহার পুত্রকে ঘেরিয়া কি করিতেছেন। এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার মধ্যে মধ্যে দেখিয়া শচীদেবীর তখন একটু সাহস হইয়াছে। তিনি তখন ব্যস্ত হইয়া নিমাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার পিতার ঘরে গিয়া শুইয়া থাক।" মনের ভাব এই পিতার কাছে শুইলে পুত্রের বিপদ্ হইবে না। আর জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, নিমাই তাঁহার ঘরে যাইতেছে, তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ঘরে লইয়া যান। নিমাই মায়ের কথা শুনিয়া আঙ্গিনা দিয়া তাহার পিতার ঘরে যাইতেছে, এমন সময় শচী অতি মধুর নূপুরধ্বনি শুনিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের কাছে গেলেন এবং দেখিলেন জগন্নাথ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে লইতে আসিতেছেন। এইরূপে উভয়েই পুত্রের শূন্য পায়ে অতি মধুর নূপুরধ্বনি শুনিলেন। পরে নিমাইকে ঘুম পাড়াইয়া দুইজনে পুত্রের কথা কহিতে লাগিলেন। জগন্নাথ বলিলেন, "এ পুত্রের দেহে গোপাল বিরাজ করেন। বাৎসল্য স্নেহে অভিভূত শচী, ইহাতে আপনাকে কিছুমাত্র গৌরবান্বিত মনে না করিয়া বলিতেছেন, "যিনিই থাকুন, যেন আমার পুত্রের কোন অমঙ্গল না হয়।"

গৃহের ভিতর যাহাই হউক, যখন নিমাই খেলা করে, তখন ঠিক সামান্য বালকের মত। নিমাই সমস্ত দিন খেলায় উন্মত্ত। যদিও তাহার পিতা তাহার হাতে খড়ি দিয়াছেন, কিন্তু লেখাপড়ায় শিশুর কিছুমাত্র মন নাই।

বয়স্ত শিশুদের সঙ্গে মিলিয়া নিমাই সমস্ত দিন খেলায় উন্মত্ত থাকায়, শচী অনেক সময় দুঃখ পাইতেন। যশোদা যেমন নীলমণিকে সাজাইতেন, সেইরূপ শচী নিমাইকে সাজাইয়া ছাড়িয়া দিতেন, অমনি নিমাই খেলায় মাতিয়া সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিত। শচী ধরিয়া অঙ্গ মুছাইয়া দিতেন, কিন্তু চঞ্চল নিমাই তদ্দণ্ডে আবার যাহা তাহাই হইত। খেলার মত্ততায় নিমাইএর ক্ষুধা বোধ নাই, রৌদ্র জ্ঞান নাই। ক্ষুধা ও পিপাসায় মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, রৌদ্রে বদন ঘামিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম পড়িতেছে, শচী অনেক তল্লাসে নিমাইয়ের লাগ পাইয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিতেছেন, "ওরে অবোধ ছেলে! তোর কি ক্ষুধাও লাগে না? রৌদ্রে তোর সোনার অঙ্গ কালী হইল, তোর কবে জ্ঞান হবে!" কিন্তু নিমাই খেলা ফেলিয়া আসিবে না। তখন কোনদিন শচী জোর করিয়া ধরিয়া আনিতেন; আবার কোন দিন মা ধরিতে আসিতেছেন দেখিয়া নিমাই পলাইত। নিমাই পলাইলে ধরেন, শচীদেবীর এমন সাধ্য ছিল না। তখন শচীদেবী কান্দিতেন, আর মায়ের চোখের জল দেখিলে অত্যন্ত কাতর হইয়া নিমাই দৌড়িয়া আসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিত।

সন্ধ্যা হইলে নিমাইয়ের ঘুমাইবার পূর্ব্বে ক্ষণেক কাল শচী আনন্দসাগরে ভাসিতেন। সেই সময় নিমাইকে লইয়া তিনি খেলা করিতেন, এবং নিমাই মায়ের সঙ্গে খেলা করিত।

ঐ সময়ের লোক, পদকর্ত্তা শ্রীবাসুদেব ঘোষ, নিমাইয়ের মায়ের সঙ্গে খেলা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥

মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি এই জগ-মন-লোভা॥

আবার চৈতন্যমঙ্গলেঃ—

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে খটী করে।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে॥
শচীমা'র স্তনযুগে দু' পা রাখিয়ে।
সোনার লতিকা দোলে যেন বায়ু পেয়ে॥

এক দিবস নিমাইচাঁদ একটি কুকুরের ছানা বাড়ী আনিয়া উপস্থিত। সেটীকে পিঁড়ায় তুলিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিল। অতি শুদ্ধা শচী দেবী পুত্রের এই কাণ্ড দেখিয়া কুকুরের ছানা ত্যাগ করিবার নিমিত্ত নিমাইকে অনুনয় ও তাড়না করিলেন, কিন্তু নিমাই কোন ক্রমেই শুনিল না। যাহা হউক নিমাইয়ের অগোচরে তাহার মাতা সেই কুকুর-ছান ছাড়িয়া দিলেন। এমন সময় নিমাইয়ের একটি বয়স্য দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে সংবাদ দিল যে, তাহার মা তাহার কুকুর-ছানা ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিমাইচাঁদ এ কথা শুনিয়া বাড়ীতে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল যে, সত্য সত্যই কুকুর-ছানা নাই। তখন সে ক্রোধে ও দুঃখে রোদন করিতে করিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। শচীদেবী, আর একটি ভাল ছানা আনিয়া দিব বলিয়া, এবং অনেক যত্ন করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

এইখানে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তুমি এ কুকুরের ছানার কথা কেন লেখ? উত্তর এই যে যাঁহারা নিমাইচাঁদকে গোলকপতি ভাবেন, তাঁহারা, সেই পরম বস্তু, কুকুর-শাবকের নিমিত্ত ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, ইহা মনে করিয়া একটি অতি মধুর রস আস্বাদন করিয়া

থাকেন। আর, কৃপাময় পাঠক! নিমাইচাঁদের সহিত আর একটু পরিচয় হইলে, আপনিও সম্ভবতঃ এ সমুদায় কাহিনী মনে করিয়া সুখ পাইবেন।

শ্রীনিমাইচাঁদের আর একটি অপ্রাকৃতিক শক্তি ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি শচীর অগ্রে নাচিবার সময়, নিমাই মধুর অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচিত। কিন্তু নিমাই যে শুধু শচীর অগ্রেই এরূপ নাচিত এমন নহে। তাহার মধুর নৃত্য দেখিবার নিমিত্ত পাড়ার সকলে যত্ন করিত, এবং নাচাইবার নিমিত্ত তাহাকে সন্দেশ ও কলা দিত। নিমাই এক হাতে সন্দেশ ও এক হাতে কদলী করিয়া বাহু তুলিয়া এমন নাচিত যে, সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। বোধ হইত নিমাই আপনি নাচিতেছে না, কে যেন তাহাকে নাচাইতেছে। নৃত্য দেখিলে, নিমাই যে স্ববশে নাই, তাহা স্পষ্ট বোধ হইত। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যের কথা যে, সেই শিশুর নৃত্য দেখিতে দেখিতে দর্শকের সংসারে ঔদাস্যের উদয় হইত, মন আর্দ্র হইত, ভক্তিতে শরীর পুলকিত হইত, আর হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ খেলিয়া আনন্দাশ্রু পড়িত। এমন কি, যাঁহারা দেখিতেন তাঁহাদেরও সেই সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে ইচ্ছা করিত, তবে লজ্জায় নাচিতে পারিতেন না।

নৃত্য অঙ্গভঙ্গি মাত্র, তাহাতে এত শক্তি কেন? অন্য একজন অঙ্গভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছে, তাহাতে দর্শকের কেন সুখের উদয় হয়? নৃত্য কি অদ্ভুত বিদ্যা! ইহার শাস্ত্রও আছে। নৃত্যের কি অদ্ভুত শক্তি তাহা বালক নিমাই দেখাইতেন। চারি বৎসরের শিশু, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, শরীরে কখনও রোগ নাই, সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত, বদন যেন পূর্ণিমার চাঁদ, বর্ণ যেন । কুসুমের ন্যায়, হৃদয় প্রসর, কটী ক্ষীণ। শচী আঁটিয়া কাপড় পরাইয়া দিয়াছেন, মুখখানি মুছিয়া উহা অলকাবৃত করিয়াছেন, কেশসংস্কার করিয়া মাথায় চূড়া বান্ধিয়া দিয়াছেন, আর সেই চূড়ায় সুবর্ণ ফুল ঝুলিতেছে,—নিমাই শচীর আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছে। আর শচী ও অন্যান্য রমণীগণ

হাতে তালি দিতেছেন। নিমাই দুলিতেছে, আর সেই সঙ্গে রমণীগণের হৃদয়ও দুলিতেছে। নিমাই নাচিতেছে, আর তাঁহাদের হৃদয় নাচিতেছে। দেখিতে দেখিতে দর্শকগণের নয়নে আনন্দাশ্রু আসিল, বাহ্যদৃষ্টি একটু কমিয়া গেল। তখন তাঁহারা দেখিতেছেন যেন শচীর আঙ্গিনায় একটি অপরূপ সোনার পুতুল নাচিতেছে। ইহাতে জগৎ সুখময় বোধ হইতেছে, আর মনে হইতেছে যে, শ্রীভগবান্ পূর্ণানন্দ, তাঁহার রাজ্য সদানন্দ, ও তাহার সাক্ষী—নিমাইচাঁদ।

এইরূপে নিমাই কখন কখন বয়স্যগণের মধ্যে আপনি আপনি নৃত্য করিত। নিমাইকে, মুখে হরিবোল বলিয়া, দুই বাহু তুলিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়া, বয়স্যগণ তাহাকে ঘিরিয়া হাতে তালি দিত। ক্রমে তাহারাও উন্মত্ত হইয়া "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিত। যথা, বাসুঘোষের পদ :—

কিয়ে হাম পেখনু কনক পুতুলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধুলি ধুসরিয়া
চৌদিকে দিগম্বর বালকে বেড়িয়া।
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া॥

কখন নিমাই নাচিতে নাচিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিত, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে বয়স্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ ধূলায় গড়াগড়ি দিত। যাহার উন্মত্ততা কিছু কম, নিমাই তাহাকে স্পর্শ কি আলিঙ্গন করিবামাত্র সেও, কেন কি জানি, তদ্দণ্ডে উন্মত্ত হইত। এইরূপে "হরিবোল" ধ্বনি শুনিলে শচী তখনি বুঝিতেন যে, এ নিমাইয়ের কাজ; আর দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া অঙ্গ মুছাইতে মুছাইতে বাড়ী লইয়া যাইতেন।

একদিনকার এইরূপ নৃত্য কিছু বড় রকমের হয়। তখন নিমাইয়ের বয়ক্রম আন্দাজ চারি বৎসর। এই ঘটনাটি আমার অভিন্ন কলেবর

শ্রীবলরাম দাস, প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, কবিতায় যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এখানে দিলাম :—

সব শিশু মেলি গলে বনমালা পরেছে।
করতালি দিয়া হরি হরি ব'লে নাচিছে ॥ ধ্রু ॥

শিশু ধরি কোলে, নিমাই আধ বোলে,
বলে "বোল হরিবোল।"
আলিঙ্গন পেয়ে, উঠয়ে মাতিয়ে,
নাচে, বলে হরিবোল ॥
মাঝে পড়ি যায়, নিমাই ধূলায়,
হরি বলে উভরায়।
নিমা'য়েরে ঘিরি, কর-ধরাধরি,
শিশুরা নাচিয়া যায় ॥
বৃদ্ধ গরবিত, প্রবীণ পণ্ডিত,
পথে যায় সেই কালে।
হাসিবার মন, উলটা ঘটন,
সান্ধাইল সেই দলে ॥
বৃদ্ধ শিশু সনে, আবিষ্ট হইয়া,
নাচে আর হরি বলে।
লজ্জা নাহি করে, সুখে নৃত্য করে,
ঊর্দ্ধ দুই বাহু তুলে ॥
কলসী লইয়া, নাগরিয়াগণ,
নাচিবারে মন ধায়।
দাঁড়াইয়া দেখে, জল বহে চোখে,
দারুণ কুলের দায় ॥

হরিধ্বনি শুনি, বুঝিলেন শচী,
এ সব নিমাই-কর্ম্ম।
ধাইয়া আইলা, ভৎ র্সিতে লাগিলা,
"এই কি তোদের ধর্ম্ম।
ক্ষেপা ছেলে পেয়ে, পাগল করিয়ে,
পাইছ মনেতে সুখ।
পর-পুত্র লয়ে, এরূপ করিছ,
বুঝ না পরের দুঃখ॥"
ভৎ র্সনা শুনিল, চেতন পাইল,
বিজ্ঞজন ভাবে মনে।
একি অকস্মাৎ কি ভাব হইল,
মতিচ্ছন্ন হ'ল কেনে॥
ঘরে গেল শচী, পুত্র কোলে করি,
বনমালা গলে দোলে।
শচী-কোল হ'তে, আনন্দিত চিতে,
বলাই লইল কোলে॥

শচীর মনে বিশ্বাস যে তাঁহার পুত্রটী খুব ভাল, তবে কুলোকে কি দুষ্ট বয়স্যগণ তাহাকে পাগল করে। নিশিযোগে নিমাইকে ঘুম পাড়াইতেছেন, নিমাই ঘুমাইতেছে না। নিমাই ক্রমে মায়ের বুকের উপর উঠিয়া দুই স্তনে পা দিয়া ও মায়ের হাত ধরিয়া দুলিতে লাগিল। শচী বলিতেছেন, "বাপ! পাগলামী করিস্ কেন? তুই কি আমার পাগল?"

নিমাই বলিতেছে, "মা, আমিই কেবল পাগল না, আমি ছাড়া আর সবাই পাগল।" এইরূপে মাঝে মাঝে পুত্রের মুখে পাকা পাকা কথা

শুনিয়া শচী বিস্মিত হইতেন। অমনি শচী জগন্নাথকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "শুন শুন তোমার পাগল নিমাই বলে কি! বলে যে, সে ছাড়া আর সকলেই পাগল।"

আবার ননি না পাইয়া নিমাই রোদন করিত। আর ননী পাইলে হাতে করিয়া নৃত্য করিত। লোচনের এই গীতটি তাহার সাক্ষী :—

দেখ দেখ আসি যত নদে-বাসী
আমার নিমাইচাঁদে।
প্রভাতে উঠিয়া বসন ধরিয়া
ননি দে মা বলে কান্দে॥
পুরাণে শুনিল যা নয়নে দেখিল তা॥ ধুয়া॥
নাচিছে অঙ্গনে শিশুগণ সনে
নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে শচীর ভবনে
বাসনা পূরিল মোর॥

বয়স্য বালকগণ লইয়া নিমাইয়ের নৃত্য ও হরিকীর্ত্তন বাসুঘোষ এই সুন্দর পদে বর্ণনা করিয়াছেন :—

গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি দেই ঘন করতালি
হরিবোল হরিবোল বলিয়া॥ ধ্রু॥
সুরঙ্গ চতুনা মাথে গলায় সোনার কাঠি।
সাধ করিয়া মায়ে পরায়েছে ধড়া গাছটি আঁটি॥
সুন্দর চাঁচর কেশ সুললিত তনু।
ভুবনমোহন বেশ ভুরু কামধনু॥

রজত কাঞ্চন নানা আভরণ,
অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাতা উৎপল, চরণ যুগল,
তুলিতে নূপুর বাজে॥
শচীর অঙ্গনে, নাচয়ে সঘনে,
বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষ বলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা মোর পরাণের পরাণি॥

নিমাইয়ের বয়স তখন পাঁচ বৎসরও নয়। ক্রমে নিমাই গঙ্গাতীরে বালুকায় শিশুগণের সহিত খেলা করিতে লাগিল। পাঠে একটু মাত্র মন নাই; পিতামাতাকে ভয় নাই। এক দিবস জগন্নাথ ক্রোধ করিয়া হাতে সাট লইয়া পুত্রকে প্রহার করিতে গঙ্গাতীরে চলিলেন। শচী, জগন্নাথের ক্রোধ দেখিয়া, আলু থালু হইয়া পাছে পাছে নিমাইকে রক্ষা করিতে দৌড়িলেন। জগন্নাথের হাতে সাট দেখিয়া নিমাই জননীর কোলে লুকাইল। জগন্নাথ, নিমাইয়ের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া শচীকে বলিতেছেন, "তুমি ওকে ছেড়ে দাও। তুমিইত ওকে নষ্ট করিলে।" শচী বলিতেছেন, "তুমি কর কি? ছেলে ডরাইয়া ম'লো। লেখাপড়া ক'রে কি হ'বে। দেখ না ভয়ে কাঁপিতেছে। ছি, হাতের ছড়ি ফেলে দাও।" ইহা বলিয়া ছড়িগাছি কাড়িয়া লইলেন। তখন জগন্নাথও যে জোর করিয়া ছড়ি ধরিয়া রাখিলেন তাহা নহে। নিমাই তখন একটু কান্দিল, ইহা দেখিয়া জগন্নাথের আর ধৈর্য্য রহিল না। অমনি বাহু প্রসারিয়া নিমাইকে কোলে করিয়া মুখে শত চুম্বন দিয়া কান্দিতে লাগিলেন। আর বলিতেছেন, "আমি কি নিষ্ঠুর। নিমাইকে কান্দাইলাম!"

কাজেই নিমাই আর পড়িত না; কিন্তু তবু নিমাই পিতাকে একটু

শঙ্কা করিত। মাতার প্রতি শঙ্কার লেশমাত্র ছিল না। দিবানিশি তাঁহাকে লইয়া, যেন বুঝিয়া সুঝিয়া, খেলা করিত। নিমাইয়ের বয়স পাঁচ বৎসর, কিন্তু কোন কোন কার্য্যের দ্বারা এরূপ বুঝাইত যেন নিমাই সব বুঝে। তখন এইরূপ বোধ হইত যে, তাহার বাল্য-চপলতা সমুদায় কপটতা, আর তাহার মাতার সহিত যত চপলতা করিত, সে সমুদায় সম্পূর্ণ সজ্ঞানে। শচীদেবীর বড় শুচিবাই, এই নিমিত্ত নিমাই সর্ব্বদা জননীকে যন্ত্রণা দিত। যাহা ছুঁইলে দোষ, শচীকে দেখাইয়া দেখাইয়া তাহাই স্পর্শ করিত, আর শচী হাহাকার করিতেন। আর ইহাই বলিয়া নিমাইকে তিরস্কার করিতেন, "তুই ব্রাহ্মণের ছেলে, তোর আচার জ্ঞান হ'লো না?" এক দিবস নিমাই উচ্ছিষ্ট ও ত্যজ্য হাঁড়ির উপর হাঁড়ি রাখিয়া তাহার উপর দাঁড়াইল। শচী এই কাণ্ড দেখিয়া পুত্রকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন, "তুই একেবারে মজালি, তোকে ব্রাহ্মণ-পুত্র কে বল্‌বে?" তখন নিমাইচাঁদ অতি গম্ভীর হইয়া বলিতেছেন, যথা মুরারি গুপ্তের কড়চা (৬ষ্ঠ সর্গ):—

শৃণু শুচিরশুচির্বা কল্পনামাত্রমেতৎ,
ক্ষিতিজলপবনাগ্নিব্যোমচিত্তং জগদ্ধি।
বিততবিভবপূর্ণাদ্বৈতপাদাব্জ একো-
হরিরিহ করুণাব্ধির্ভাতি ন্যান্যৎ প্রতীহি ॥১৬॥

অন্বয়ার্থঃ—হে মাতঃ! শ্রবণ করুন। ক্ষিতি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, চিত্ত, জগৎ, শুচি বা অশুচি এই সকলই কল্পনা মাত্র। একমাত্র সেই পরিপূর্ণতম অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীহরির পাদপদ্মের অনন্ত ঐশ্বর্য্যই সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া জানিবে। তিনি ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই।

এইরূপ ভাবের কথা শুনিয়া শচী বিস্মিত হইলেন। তখন আর

নিমাইকে পাঁচ বৎসরের শিশু বলিয়া বোধ হইল না, যেন একজন পরম জ্ঞানী পুরুষ তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। সেই মুহূর্তে শচীর বোধ হইল যে, তিনি একজন অবোধিনী রমণী ও নিমাই তাঁহার পরম উপদেষ্টা। কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ রহিল না। তদ্দণ্ডে নিমাইয়ের বাল্য-চাপল্য দেখিয়া সব ভুলিয়া গেলেন।

শচী সুবিধা পাইলেই নিমেষহারা হইয়া নিমাইয়ের চন্দ্র-মুখ দেখিতেন। কখন কখন নিমাই শচীর সেই ভাব দেখিয়া পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইত। মনের ভাব, আপনার মুখ জননীকে দেখিতে দিবে না। শচী ভাবিলেন, পুত্র অন্যমনস্ক হইয়া এরূপ করিতেছে, ইহাই ভাবিয়া তিনি ধীরে ধীরে আবার আগে গিয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই অমনি আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন শচী বুঝিলেন, তিনি যে নিমাইয়ের মুখ দেখিতে সতৃষ্ণ, আর উহা দেখিতেছেন, তাহা সে জানিতে পারিয়াছে, ও জানিতে পারিয়া দুষ্টমি করিয়া উহা দেখিতে দিতেছে না। তখন শচী রাগ করিলেন।

নিমাইয়ের বচন অতি মধুর, যখন সে দুই একটি কথা বলে, তখন যেন অমৃত বর্ষণ করে। শচীর ইচ্ছা যে নিমাই কথা বলে, আর তিনি তাহাই বসিয়া শুনেন। নিমাইকে কথা কহাইবার নিমিত্ত কত ছল করিতেছেন। নিমাই জননীর মনের ভাব জানিতে পারিয়া আর মোটে কথা কহিতেছে না। শচী বুঝিলেন যে, নিমাই বুঝিয়া তাহার সহিত দুষ্টমি করিতেছে! তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "তুই এখন আমার সহিত কথা কহিতে চাহিতেছিস্ না, আমার শেষকালে তুই আমাকে ভাত দিবি না।" নিমাই তবু মুখ বুজিয়া রহিল। তখন শচী বলিতেছেন, "তুই আমার সহিত কথা বলিস না। আমি ম'রে যাব, আর তুই পথে পথে মা মা ক'রে কেন্দে বেড়াবি।" নিমাই তবু মুখ বুজিয়া রহিল। তখন স্বভাবতঃ শচী ক্রোধ করিয়া হাতে সাট লইয়া পুত্রকে

মারিতে উদ্যত হইলেন, এবং নিমাই দৌড়িয়া পলাইল। এই ঘটনা আমার অভিন্ন কলেবর শ্রীবলরাম দাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

মধুর বচন নিমাই বদনে।
সাধ নাহি মিটে বারে বারে শুনে॥
শচী মা জননী বচন শুনিতে।
নিমা'য়ের সনে কত ছল পাতে॥
চতুর নিমাই জানিতে পারিয়া।
চুপ করি থাকে উত্তর না দিয়া॥
"মুখ বুজে বাপ রহিলে বা কেনে?"
নিমাই কহয়ে "শুনিতে পাইনে॥"
চেঁচাইয়া শচী কহে তবে কথা।
"কিছুই শুনিতে পাই না গো মাতা॥"
আরো চেঁচাইয়া শচী মা কহয়ে।
নিমাই মাথা নাড়ে কথা নাহি কহে॥
সে ভাব দেখিয়া শচী মা রুষিল।
ঠেঙ্গা হাতে দেখি নিমাই পলাল॥
পাছে পাছে ধায় ঠেঙ্গা হাতে করি।
নিমাই বসিল যথা ঝুঁটা হাঁড়ি॥
নিশ্চিন্ত হইয়া তথা বসি রহে।
মাতা গালি দেয় সে দিকে না চাহে॥
বাম করোপরে নিজ গণ্ড রেখে।
গুন্ গুন্ করি গাইতেছে সুখে॥
আড় চ'খে চাহে মায়ে দেখি হাসে।
তাহা দেখি শচী অতিশয় রোষে॥

কিন্তু কি করিবে ঝুঁটায় বসিয়া।
ধরিতে নারিয়া বলিছে তুষিয়া॥
"এস বাপ ধন মায়ে দুঃখ পায়।
ভালবাসা নাহি তোমার হৃদয়॥"
তখন নিমাই ধাইয়া আসিল।
বাহু পসারিয়া শচী কোলে নিল॥
ঝুঁটাতে নিমাই বলাই ভাবিয়া।
ধরিতে নারিয়া আছে দাঁড়াইয়া॥

এইরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া কখন কখন শচী পুত্রকে ধরিতে যাইতেন। তখন পুত্র দৌড়িয়া পলাইত। কখন আস্তাকুড়ে যাইয়া দাঁড়াইত, আর শচী সেখানে যাইতে পারিতেন না। কখন জননী ধরিতে আসিলে অঙ্গে ভাত মাখিত। এইরূপ অশুচি অঙ্গে মাখিয়া পরিশেষে শচীকে তাড়াইত। শচী তখন হাতের ছড়ি ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারে খিল দিতেন।

আবার নিমাইয়ের যে সব খেলা, তাহার প্রায় একটিও শচীর ভাল লাগিত না। কারণ এ সব খেলায় নিমাইয়ের অঙ্গে ধূলা, রৌদ্রের তাপ ও কখন কখন ব্যথা লাগিত। নিমাইয়ের এক খেলা বৃক্ষ-পল্লব লইয়া বয়স্যের সহিত মারামারি। নিমাইয়ের অঙ্গে বয়স্যগণ পল্লবের বাড়ি মারে, ইহা শচীর সহ্য হয় না, কিন্তু নিমাইকে তিনি বাধ্য করিতে পারেন না।

যাহা হউক, শচী বুঝিলেন, তাঁহার পুত্র অন্যের পুত্রের মত নহে। হয় এ পাগল—বুদ্ধি মাত্র নাই, নয় কোন দেবাবিষ্ট। জগন্নাথের বাড়ীর নিকট জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্যভাগবত নামে দুইজন ব্রাহ্মণের বাড়ী ছিল। কোন এক একাদশী দিনে নিমাইচাঁদ কান্দিতে লাগিল।

নিমাইচাঁদ কান্দিলেই সকলে ভয় পাইতেন, কারণ নিমাই কান্দিতে আরম্ভ করিলে একটি বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইত। কান্দিবার সময় তাহার এত নয়নজল পড়িত যে তাহা দেখিয়া সকলে ভীত হইতেন। কখন বা কান্দিতে কান্দিতে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। সে দিবস হরিনামেও নিমাইয়ের রোদন থামিল না। তখন শচী কাতরভাবে বলিলেন, "তুমি কান্দ কেন? তুমি যাহা চাহ তাহাই দিব।" ইহাতে নিমাই বলিল, "হিরণ্যভাগবত ও জগদীশের বাড়ীতে যে একাদশীর নৈবেদ্য আছে, তাহা যদি খাইতে দাও, তবে আর কান্দিব না।"

ইহাতে সকলে জিভ কাটিয়া বলিলেন যে, ঠাকুরের দ্রব্য অমন করিয়া চাহিতে নাই, ঐ সব দ্রব্য বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইবে না; নিমাইয়ের জিদ যে, ঐ দুই ব্রাহ্মণের নৈবেদ্য তাহার চাই, নতুবা স্থির হইবে না।

এই কথা সেই দুই ব্রাহ্মণ শুনিলেন ও তাঁহারা দৌড়িয়া রহস্য দেখিতে আসিলেন। তখন নিমাইকে দেখিয়া তাঁহাদের বোধ হইল যে এরূপ শিশুর এরূপ বুদ্ধি হইতে পারে না। অদ্য একাদশী সে কিরূপে জানিল! তাহাকে পরম সুন্দর দেখিয়া গোপাল এ দেহে বিরাজ করিতেছেন আর তিনিই নৈবেদ্য চাহিতেছেন এইরূপ মনে হওয়ায়, তাঁহাদের অঙ্গ পুলকিত হইল। তখন তাঁহারা দুই জনে গিয়া সমুদয় নৈবেদ্য আনিয়া নিমাইয়ের সম্মুখে দিয়া বলিলেন, "তুমিই গোপাল, তুমি খাইলেই গোপালের খাওয়া হইবে।" তখন নিমাই সেই নৈবেদ্য লইয়া কতক খাইল, কতক ফেলিল, কতক বিলাইয়া দিল, আর কতক অঙ্গে মাখিল। শচী ভাবিতেছেন, তাঁহার পুত্রটি কি প্রকৃতই ক্ষেপা? তখন তাঁহার ভগিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভগিনী আসিলে তাঁহাকে বলিলেন যে, এমন সুন্দর ছেলে এ কেন ক্ষেপা হইল, সেই নিমিত্ত চিন্তিত হইয়া

তোমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে তোমাকে ডাকিয়াছি। শচীর ভগিনী পাড়ার দু'চারিজন গৃহিণীকে ডাকিতে বলিলেন।

তখন পাড়ার দুই চারিজন বিজ্ঞ গৃহিণীকে ডাকাইয়া আনা হইল। তাঁহারা সকলে আসিয়া বসিলেন। সকলেই দিবানিশি শাস্ত্রালাপ শুনিতেছেন ; আর শুনিয়া শুনিয়া, কিছু বুঝুন না বুঝুন, বুঝেন এরূপ সকলেরই অভিমান আছে। সকলেরই স্বামী পণ্ডিত, সুতরাং তাঁহারা ভাবেন তাঁহাদেরও পরামর্শ দিবার অধিকার আছে।

শচী তাঁহাদের নিকট আপনার দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন যে, "অন্য ছেলের মত তাঁহার পুত্রের মায়াদয়া বেশ আছে, বুদ্ধিও বেশ আছে। ঘড়ের হাঁড়ি ভাঙ্গে বটে, তাহাতেও দোষ নাই। কিন্তু দেবতা মানে না, দেবতার দ্রব্য খাইতে চায়, উচ্ছিষ্ট মানে না, মুচিকে ছুঁইয়া দেয়, আবার নিষেধ করিলে বলে যে, "আমি দেবতা, আমি যদি অশুচি ছুঁই, তবে সে শুচি হয়।" এইরূপে নিমাইয়ের বহুতর দোষ কীর্ত্তন করিলেন।

তখন রমণীগণ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ পীড়া কত দিন হয়েছে ?" শচী বলিলেন, "এক দিন নিশিযোগে ঘরে অনেক জ্যোতির্ম্ময় মানুষের আকার দেখিলাম, যেন তাহারা নিমাইকে লইয়া খেলা করিতেছে, আর সেই দিন হইতে সে যেন আরও চঞ্চল হইয়াছে।" ইহাতে বিজ্ঞ রমণীগণ বলিলেন, "এ নিতান্তই অপদেবতার কর্ম্ম।" এমন সময় নিমাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া, এই রমণী-সভার যিনি প্রধানা তিনি বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি ব্রাহ্মণের কুমার, পণ্ডিতের পুত্র, তুমি নাকি দেবতা মান না ?" ইহাতে নিমাই মুখ ভেঙ্গচাইয়া বলিল, "আমি আবার কোন্ দেবতাকে মানিব ? আমাকে সকলে মানিবে।"

ইহা শুনিয়া শচী বলিতেছেন, "ঐ শুন কি বলে! এই সব কথা শুনিয়া আমার ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া যায়। সব দেবতা আমার মাথার মণি।" তখন শচী উর্দ্ধমুখে ও করজোড়ে দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ঠাকুর! আমার উপর সদয় হইয়া, আমার ক্ষেপা ছেলের অপরাধ লইও না।" ইহাই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বিজ্ঞ রমণীগণ অনেক বিচারের পর সাব্যস্ত করিলেন যে, এ সমুদায় অপদেবতার কর্ম্ম, অতএব একটী ভাল শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে, আর যত্ন করিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণীকে বাধ্য করিতে হইবে। ষষ্ঠীর ভাল করিয়া পূজা দিলে তিনি নিমাইকে রক্ষা করিবেন।

শচী তাহাই সাব্যস্ত করিলেন। কিন্তু নিমাই যদি জানিতে পারে, তবে ষষ্ঠীর সমুদায় দ্রব্যই খাইয়া ফেলিবে, আর তাহা হইলে ষষ্ঠী তুষ্ট ত হবেনই না, বরং রুষ্ট হইয়া তাঁহার মাথা খাইবেন। শচী ইহাই ভাবিয়া অতি গোপনে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ বিষয়ের আমি বিস্তার করিব না, এই ষষ্ঠীরপূজার কাহিনী ঘটিত আমার অভিন্ন কলেবর শ্রীবলরাম দাসের একটী কবিতা দিব। যথা—

বেলা বহু হ'ল পুত্র না আইল,
খেলা করে গঙ্গাতীরে।
হাতে সাট শচী, ধায় গঙ্গাতীরে,
পুত্র আনিবার তরে॥
হাতে সাট দেখি, নিমাই কুপিল,
ধেয়ে এল নিজ ঘরে।
যত ভাণ্ড ছিল, ক্রোধেতে ভাঙ্গিল,
ঘরের দ্রব্য ফেলে দূরে॥

পুত্র-ব্যবহার, দেখিয়া জননী,
মুখে না নিঃস্বরে বাণী।
মলিন বদনে, চাহে পুত্র পানে,
নয়নে বহিছে পানি॥
জননী ক্রন্দন, দেখিয়া নিমাই,
নমিত বদনে কান্দে।
ভয় পেয়ে শচী, কোলেতে লইল,
মুছাইল মুখ-চান্দে॥
যখন নিমাই, করয়ে ক্রন্দন,
শান্ত করা মহাদায়।
কখন কখন, কান্দিতে কান্দিতে,
ভূমে পড়ি মূরছয়॥
চরিত্র বিচিত্র, দেখি নিজ পুত্র,
ডাকি আনি নারী সবে।
শচী বলে দুঃখে, "যুক্তি বল মোকে,
কিসে পুত্র ভাল হবে॥
এ হেন নন্দন, পাগল মতন,
ঝুটা মাখে নিজ গায়।
শাসন করিলে, ক্রোধ করি বলে,
মাগো তোর জ্ঞান নাই॥"
পণ্ডিতের নারী, সবে বড় জ্ঞানী,
শচীরে উপায় বলে।
"ষষ্ঠী ঠাকুরাণী, পূজ পদখানি,
ভাল হবে তোর ছেলে॥"

যুক্তি করি সার, ষষ্ঠী পূজিবার,
শচী আয়োজন করে।
নিমাই দেখিলে, ব্যাঘাত হইবে,
এই ভয়ে শচী মরে॥
বাহিরে নিমাই, আনন্দে খেলিছে,
গুপ্ত পথে শচী যায়।
নৈবেদ্য লইয়া, আঁচলে ঝাঁপিয়া
যায় আর ফিরে চায়॥
বহু দূর গেছে, শচী মা ভাবিছে,
"নিমা'য়ে দিয়াছি ফাঁকি।"
বলিতে বলিতে, নিমাই সম্মুখে,
বলে "মা আঁচলে কি?"
বিপদে শচী মা, ডাকিছে গোঁসাই,
"আজি পরিত্রাণ কর।"
পুত্রেরে বুঝায়, "শুন বাপ ধন,
তুমি ফিরি যাও ঘর॥"
নিমাই বলিছে, "আঁচলে কি আছে,
আগে দেখি পরে যাব।
খাবার লইয়ে, চলিছ লুকায়ে,
আমি উহা সব খাব॥"
জিব কাটি শচী, বলে "বাপধন,
উহা ত বলিতে নাই।
পূজা করি আগে, যাইবার বেলা,
দিব সন্দেশ কলা খৈ॥"

"সে অনেক দেরি, এবে ভুখে মরি"
বলি নিমাই হাত দিয়ে।
নৈবেদ্য লইয়া, চলিল ধাইয়া,
খায় মা'য়ে চেয়ে চেয়ে ॥
শচী কোপে ভয়ে, কহিছে তনয়ে,
"বামুনের পুত্র তুই।
কি দুঃখ আমার, কি বলিব আর,
গঙ্গা প্রবেশিব মুই ॥"
কহিছে নিমাই, "অবোধিনী তুই,
পুনঃ মোরে দেহ গালি।
আমি যদি খাই, ষষ্ঠী তুষ্ট হয়,
সার কথা তোরে বলি ॥"
"শুনিলে শুনিলে, শচী তবে বলে,
যত সঙ্গী নারী প্রতি।
"শুনিলে, শুনিলে, মোর ক্ষেপা ছেলে,
কি কথা করিল উক্তি?"
ষষ্ঠী কাছে গিয়া, শচী মা কান্দিয়া,
বলে "ক্ষম ক্ষেপা ছেলে।
শচীর তরাসে, ষষ্ঠী মনে হাসে,
আনন্দে বলাই বলে।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, নিমাইয়ের পীড়া যেরূপ হইয়াছিল সেইরূপই রহিল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী কিছু ভাল করিতে পারিলেন না। শান্তিস্বস্ত্যয়নেও কিছু হইল না।

মুরারি গুপ্তের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইঁহার বাড়ী শ্রীহট্টে, নবদ্বীপে

বাস। সেই জন্য ও অন্যান্য নানা কারণে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সহিত সৌহৃদ্য এবং উভয়ের এক পাড়ায় বাস। মুরারির বয়ঃক্রম তখন আন্দাজ বিংশতি বৎসর, পরম পণ্ডিত, গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ পড়েন, আবার চিকিৎসা ব্যবসাও করেন; এই অল্প বয়সেই নবদ্বীপে খ্যাতিপন্ন হইয়াছেন। চরিত্র নির্ম্মল, জীবে অতি দয়া। তবে যোগবাশিষ্ঠ পড়েন, আপনাকে ভগবানের সহিত অভেদ মানেন, অর্থাথ ভগদ্ভক্তি মানেন না।

এক দিবস মুরারি, কয়েকজন বয়স্য সমভিব্যাহারে যোগবাশিষ্ঠের চর্চ্চা করিতে করিতে চলিয়াছেন। অত্যন্ত অন্যমনস্ক,—হাত নাড়িতেছেন, মুখ নাড়িতেছেন ও মাথা নাড়িতেছেন। এইরূপে বয়স্যগণকে মনের ভাব বুঝাইবার নিমিত্ত একান্ত চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় পশ্চাতে হাস্য-রব শুনিতে পাইয়া, মুখ ফিরাইয়া দেখেন যে, তাঁহার গতি, অঙ্গভঙ্গী ও কথা অনুকরণ করিয়া নিমাই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, আর বালকগণ তাই দেখিয়া হাসিতেছে। নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া মুরারির ক্রোধ হইল, কিন্তু অতীব গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া তিনি সহ্য করিয়া রহিলেন, এবং পুনরায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। নিমাইও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যখ্যা অনুকরণ করিয়া হাতমুখ নাড়িতে লাগিল। ইহাতে বালকগণ আবার হাসিয়া উঠিল। এবার মুরারি সহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "জগন্নাথের একটি অকালকুষ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, ইহাকে ভাল কে বলে?" বলরাম দাসের নিকট আবার ঋণ করিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি উপরি উক্ত ঘটনাটি নিম্নোদ্ধৃত পদে বর্ণনা করিয়াছেন। দামোদর পণ্ডিতের জিজ্ঞাসা মতে মুরারি বৈদ্য বলিতেছেন ঃ—

বৈদ্য বলে শ্রীহট্টিয়া মিশ্র জগন্নাথ।
আমি শ্রীহট্টিয়া পিরীতি তাঁর সাথ॥

নূতন বয়স মোর বিদ্যার গৌরব।
সর্ব্ব নবদ্বীপময় আমার সৌরভ॥
আপনাকে করি আমি জ্ঞানী অভিমানী।
বাশিষ্ট পড়িয়া ভক্তি আদৌ নাহি মানি॥
একদিন জন কত বন্ধু সঙ্গে করি।
পথে যাই, জ্ঞান কই, হাত নাড়ি নাড়ি॥
সেই পথে শচী-সুত ধূলায় ধূসর।
শিশু সনে খেলা করে হয়ে দিগম্বর॥
"সোহহং" বুঝাইয়া যাইতে যাইতে।
শচী-সুত মোর পিছে আসে ভেংচাইতে॥
চলিছি, কহিছি, হাত নাড়িছি যেমন।
আসিতেছে শচী-সুত করিয়া তেমন॥
কটাক্ষে দেখিয়া কিছু না কহু বচন।
পুনঃ ব্যাখ্যা করি আমি যোগ আর জ্ঞান॥
যেই রূপ ব্যাখ্যা করি সেই মত করে।
যেন হাত মুখ নাড়ি সেই মত নাড়ে॥
শিশুগণ হাসিতেছে দেখে ক্রোধ হ'ল।
"হারে জগন্নাথ-সুত কুষ্মাণ্ড অকাল॥
জগন্নাথ ঘরে দুরাচার এ জন্মেছে।
বাপের আদরে ক্রমে দ্বিগুণ বাড়িছে॥
ভ্রুকুটি করিয়া নিমাই বলে "যাও চ'লে।
তোমা ভাল শিক্ষা দিব ভোজনের কালে॥"
মধ্যাহ্ন ভোজনে আমি এমন সময়।
অতীব গম্ভীর স্বরে ডাকে কে আমায়॥

শুনিতে পুছিতে নিমাই আইল সম্মুখে
আমি খাই তথা সেই দাঁড়াইয়া দেখে ॥
তার পর মোর থালে প্রস্রাব করিল।
"ছি ছি" বলি উঠি আমি বড় ক্রোধ হ'ল
হেন কালে নিমাই মোরে চাহিয়া কহিল।
নয়নে আগুন জলে দেখে ভয় হ'ল ॥
"হাত নাড়া মাথা নাড়া ছাড়হে মুরারি।
জ্ঞান ও বক্তৃতা ছাড় ভজহে শ্রীহরি ॥
জীব আর ভগবানে ভিন্ন যে না করে।
প্রস্রাব করি আমি তার থালের উপরে ॥"*
বলিয়ে চকিতের মত কোথা চ'লে গেল।
ক্ষণেকের মত মোর অঙ্গ স্তব্ধ হ'ল ॥
পুলকে ভরিল অঙ্গ সে কথা শুনিয়া।
আনন্দে পূরিল অঙ্গ রাগ না হইয়া ॥
পাছে ধাই গেনু জগন্নাথ-মিশ্র ঘরে।
প্রণমিনু শচী-সুতে লোটাইয়া শিরে ॥

* মুরারি গুপ্তের ঘর, গেলা নিজ অভ্যন্তর, ভোজন করয়ে বৈদ্যরাজ।
মেঘগম্ভীর নাদে, নিজ মন পরসাদে, মুরারি বলিয়া দিলা ডাক॥
স্বর শুনি সঙরিল, বিশ্বম্ভর যে বলিল, গুপ্তবেজা চমকিত চিত।
হেনকালে গৌরহরি, কি কর কি কর বলি, সেইখানে হইল উপনীত ॥
তরস্ত না হও তুমি, এইখানে আছি আমি, ভোজন করহ বাণী বৈল।
মধ্যাহ্ন ভোজন বেলা, ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা, থাল ভরি এমত মুতিল ॥
কি কি বলি ছিছি করি, উঠিল সে মুরারি, করতালি দিয়া বোলে গোরা।
কর শির নাড়িয়া, ভক্তিযোগ ছাড়িয়া, তর্জ্জা বোল এই অভিপারা ॥
—চৈতন্যমঙ্গল, আদি।

আমাকে দেখিয়া তখন ধূর্ত্ত শিরোমণি।
জননী-অঞ্চলে লুকাইল মুখখানি॥
জগন্নাথ বলে "তুমি কি কাজ করিলে!
অকল্যাণ হবে মোর সুতে প্রণমিলে?
তখন কহিনু "মিশ্র কিছু দিন পরে।
জানিবে কে জন্মিয়াছে তোমার মন্দিরে।
ভোজন ব্যাঘাত ভাবি দাঁড়াইয়া ছিল।
দাঁড়া'বার হেতু বলাই ইহাই বুঝিল॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব্বে শ্রীনিমাইচাঁদের দাদা শ্রীবিশ্বরূপের নামের উল্লেখমাত্র করিয়াছি। তাঁহার বিষয় এখন সবিশেষ বলিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বৈষ্ণবের সংখ্যা সে সময় অতি অল্প ছিল। কমলাক্ষ মিশ্র নামক একজন বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শান্তিপুরে বাস করিতেন। ইনি অল্প বয়সে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া মাধবেন্দ্রপুরী নামক একজন শ্রীকৃষ্ণভক্তের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। পরে যোগ, তপস্যা, সাধন, ভজন প্রভৃতি দ্বারা শক্তিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বলোকের পূজ্য হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীমদ্ভগদ্গীতায় তখন তাঁহার মত পণ্ডিত কেহ ছিলেন না। তিনি অল্পসংখ্যক বৈষ্ণব-পার্ষদ লইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যাজন করিতেন। সেই সময়ে যে অল্পসংখ্যক বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহারা সমাজে বড় অপদস্থ থাকিতেন। তাঁহারা কমলাক্ষের সভায় বসিয়া আপনাদের সম্প্রদায়ের হীনাবস্থার নিমিত্ত দুঃখ করিতেন। কমলাক্ষ তখন হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিতেন

"তোমরা স্থির হও, আমার প্রভু শ্রীনন্দনন্দন সত্বরই নয়নগোচর হইবেন।" শুধু যে ভক্তগণকে বলিয়া বুঝাইতেন তাহা নয়, আপনিও সেই সঙ্কল্প করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেন। গঙ্গাজল আর তুলসী দিয়া শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম পূজা করিতেন, আর বলিতেন, "প্রভো! সত্বর আগমন কর, আর বিলম্ব করিওনা। জীব অধোগতির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। তোমা বই জীবের আর উদ্ধারের উপায় নাই।" এইরূপে স্তব করিতেন, আর হুঙ্কার ছাড়িতেন। এই কমলাক্ষ মিশ্র পরিশেষে অদ্বৈতাচার্য্য নামে পরিচিত হয়েন। ইঁহার বাড়ী শান্তিপুরে বটে, কিন্তু নবদ্বীপেও আর একটি বাড়ী ছিল, এবং সেখানেও সর্ব্বদা থাকিতেন। শ্রীনিমাই-চাঁদের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ এই অদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গ পাইলেন।

যখন বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম আন্দাজ দশ বৎসর, তখন নিমাই অবতীর্ণ হয়েন। এত দিন বিশ্বরূপ একা ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কি ভগিনী না থাকায়, তাঁহার যত ভ্রাতৃ-স্নেহ লোকনাথকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই লোকনাথ তাঁহার মাতুল-তনয়, তাঁহার সমবয়স্ক। তাঁহার মাতামহ নীলাম্বরের নিবাস নবদ্বীপের বেলপুখুরিয়া পাড়ায় ছিল। নীলাম্বরের দুই পুত্র,—যজ্ঞেশ্বর ও হিরণ্য; আর দুই কন্যার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। লোকনাথ ও বিশ্বরূপে অতিশয় প্রণয়, দুই জনে একত্র পর্য্যটন ও একত্র পঠন করেন। যখন নিমাই অবতীর্ণ হইলেন, তখন বিশ্বরূপ আনন্দে পুলকিত হইয়া সূতিকা-গৃহে যাইয়া কনিষ্ঠকে কোলে করিলেন।

বিশ্বরূপের রূপ ও গুণের তুলনা ছিল না। বুদ্ধি এত সতেজ যে, অতি অল্প বয়সে সমস্ত শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন। ছোট ভাইকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন, কিন্তু দিবানিশি শাস্ত্রাভ্যাসে নিযুক্ত থাকায় তাহার প্রতি তত দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। কাজেই নিমাইয়ের চাঞ্চল্য আরও বাড়িয়া যাইত! একে পিতা জগন্নাথ অকুলান

সংসারের ব্যয় কুলাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা বাড়ী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন, তাহাতে বিশ্বরূপ টোলে, কি বাড়ীতে যেখানেই থাকুন, কেবল পুস্তক লইয়াই থাকিতেন, কাজেই নিমাইকে দেখিবার লোক কেহ ছিল না। কিন্তু দাদার নিকট নিমাই বড় নম্র থাকিত। নিমাই দাদাকে যত সম্মান করিত, এমন কি, পিতাকেও তত করিত না।

ইতিমধ্যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত বিশ্বরূপের মিলন হইল। বিশ্বরূপকে দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত ও তাঁহার সভাসদ্‌গণ বড় মুগ্ধ হইলেন। বিশ্বরূপও অদ্বৈতের সভায় বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতত্ত্ব শুনিয়া বড় সুখ পাইলেন। তাঁহার পাঠের সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ জ্ঞান, কেহ তন্ত্র, কেহ-বা মায়াবাদ চর্চ্চা করিতেন। এ সকলের আলোচনায় বিশ্বরূপ দিবানিশি ক্লেশ পাইতেন, এখন অদ্বৈতের সভায় শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তির আলোচনায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া সেখানেই সর্ব্বদা থাকিতেন।

যখন বিশ্বরূপ টোলে পড়িতেন, তখন অপরাহ্নে গৃহে থাকিতেন। যখন অদ্বৈত-সভায় প্রবেশ করিলেন, তখন হইতে প্রায় দিবানিশি সেইখানেই থাকিতে লাগিলেন। এমন কি, বাড়ীতে মধ্যাহ্নে খাইতে আসিতেও মনে থাকিত না। মধ্যে মধ্যে শচী নিমাইকে অদ্বৈত-সভা হইতে তাহার দাদাকে আনিতে পাঠাইতেন। যখন নিমাই অদ্বৈত-সভায় দাদাকে ডাকিতে যাইতেন, তখন সভাস্থ সকলে এক দৃষ্টে নিমাইয়ের রূপ লাবণ্য দর্শন করিতেন। অদ্বৈত বলিতেন, "এ শিশুটী আমার চিত্ত এরূপে কেন হরণ করে? এটি কি বস্তু?" বলরাম দাসের আর একটী পদ উদ্ধৃত করিব :—

যৌবন আরম্ভ ষোল বৎসর বয়স্।
অঙ্গেতে লাবণ্য-লীলা বদনে উদাস ॥
মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস সুখ নাহি তায়।
বসিয়াছেন বিশ্বরূপ অদ্বৈত-সভায় ॥

মলিন বদন-শশী দেখিয়া অদ্বৈত।
বলিছেন "স্থির হও, শান্ত কর চিত॥
সত্বর আসিবে কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে।
আর না হইবে বাপ তোমায় কান্দিতে॥"
বলিতেই আঙ্গিনায় নিমাই আসিল।
দেখি বিশ্বরূপ মুখ প্রফুল্ল হইল॥
ত্রিভুবনে বিশ্বরূপের সুখ কিছু নাই।
একমাত্র সুখ নিমাই-চাঁদ ছোট ভাই॥
দিগম্বর আঙ্গিনায় বলিছে নিমাই।
"ভাত খাবার লাগি দাদা ডাকিছেন মা'য়॥"
সবে বলে কি সুন্দর কথা ও মূরতি।
শুনি তাহা বিশ্বরূপ মনে সুখী অতি॥
দক্ষিণ হস্তে বস্ত্র ধরি নিমাই চলিছে।
দাদা বাম হাতে তার গলাটী ধরিছে॥
চলিছে নিমাই বাস চিবাতে চিবাতে।
দাদা বলে "নিমাই উহা না হয় করিতে॥"
"কেন দাদা কাপড় চিবালে কিবা দোষ?"
দাদা বলে "ঠাকুর উহাতে করেন রোষ॥"
এইরূপ ভা'য়ে কোলে করি আধা-পথে।
দুই ভাই চলিলেন কথাতে কথাতে॥
বিশ্বরূপ বসিলেন ভোজন করিতে।
ছোট ভাই দিগম্বর বসিলেন সাথে॥
মা'য়ে খাওয়াইলে দ্বন্দ্ব প্রতি গ্রাসে গ্রাসে।
সুশান্ত হইয়া খায় দেখি শচী হাসে॥

বিশ্বরূপ বিশ্বাস করেন নিজ চিতে।
নিমায়ের মত শিশু নাই ত্রিজগতে॥
মূর্খ লোক নিমায়ের চাঞ্চল্য দেখিয়া।
নিন্দা করে বিশ্বরূপ দুঃখ পান হিয়া॥
বলে "ভাই চাঞ্চল্য না কর শিশু-সনে।
লোকে নিন্দা করে বড় ব্যথা পাই মনে।
চুরি করি খাও তুমি অন্ত বাড়ী যাও।
আমি তোমা আনি দিব যাহা তুমি চাও॥
যদি কেহ ছোট ভাই, থাকিত তোমার।
তবে সে বুঝিতে তুমি কি দুঃখ দাদার॥"
দাদার বচনে হেঁট নিমাই-বদন।
"বল ভাই আর না সে করিবে এমন?
"করিব না" নিমাইচাঁদ বলিবারে গেল।
কণ্ঠরোধ হয়ে গেল বলিতে নারিল॥
সুধাংশু-বদনে বহে মুকুতার ধারা।
হেঁট বদনেতে আছে ভিজে গেল ধরা॥
ভাব দেখি বিশ্বরূপ আঁখি ছল ছল।
অঙ্গ কাঁপে থর থর নিমাই মূরছিল॥
ব্যস্ত হয়ে নয়নেতে জলছাটি মারে।
"নিমাই" "নিমাই" বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে
নয়ন মেলিল নিমাই বুকেতে করিল।
আপনার কান্ধের পরে বদন রাখিল॥
কান্দিতে লাগিল নিমাই করুণার স্বরে।
বিশ্বরূপ মাতা পিতা সবে শান্ত করে॥

অঙ্গ কাঁপে থর থর দাঁতে দাঁত লাগে।
নিমাই নিমাই বলি বিশ্বরূপ ডাকে॥
ক্রমে ঘুমাইল দেখি ধীরে শোয়াইল।
বিশ্বরূপ বসি মুখ দেখিতে লাগিল॥
বদন লাবণ্যময় তাহে মৃদু হাস।
ভ্রাতৃ-স্নেহে ভাগ্যবান্ বলরাম দাস॥

জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্র, অন্ন চিন্তায় বিব্রত থাকিতেন, এবং বিশ্বরূপ দিবানিশি অদ্বৈত-সভায় থাকিতেন। সুতরাং পিতা পুত্রে বড় একটা দেখা শুনা হইত না। এক দিবস রাজপথে জগন্নাথ বিশ্বরূপকে দর্শন করিয়া, পুত্রের বিবাহোপযোগী বয়স দেখিয়া, তাহার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন, এবং বাটী আসিয়া শচীদেবীর সহিত যুক্তি করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপে ইহা জানিতে পারিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

তাঁহার হৃদয়ে তখন বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইবেন না, ইহা তখন স্থির করিয়াছেন। এদিকে তাঁহার গুরুজনের প্রতি ভক্তির ইয়ত্তা ছিল না। পিতা কি মাতা যদি তাহাকে বিবাহ করিতে আজ্ঞা করেন, তবে সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তিনি গুরুজন-দ্রোহী হইয়া পতিত হইবেন। এমন স্থলে কি কর্ত্তব্য? বিশ্বরূপে ভাবিলেন তাঁহার গৃহত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

অবশ্য গৃহত্যাগ করিলে সন্তানবৎসল মাতাপিতা মর্ম্মাহত হইবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা আপাততঃ দুঃখ পান, পরিণামে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। কারণ শাস্ত্রে আছে, যে কুলে একজন সন্ন্যাসী হয়েন, সে কুল উদ্ধার হইয়া যায়। আবার ভাবিলেন যে, গৃহত্যাগ করিলে নিমাইয়ের উপায় কি হইবে? কে তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা দিবে, কেই বা তাহার তত্ত্বাবধান করিবে? কিন্তু গৃহত্যাগ করিতেই হইবে, নতুবা সংসারে

আবদ্ধ হইতে হইবে। তখন নিমাইয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে একটি কথা স্থির করিলেন। শচীদেবীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা! আমার একটী কথা রাখিতে হইবে। নিমাই যখন বড় হইবে, তখন তাহাকে এই পুঁথিখানি দিবে। বলিও তোমার দাদা তোমাকে এই পুঁথিখানি পড়িতে দিয়াছেন! অবশ্য তুমি আমার এ কথা রাখিবে।" ইহাই বলিয়া শচীদেবীর হস্তে একখানি পুঁথি দিতে গেলেন। ইহাতে শচী অবাক্ হইয়া বলিলেন, "তুমি ত নিজেই দিতে পারিবে?"

বিশ্বরূপ বলিলেন, "যদি আমি দিতে পারি, তাহা হইলে তোমার দিতে হইবে না; কিন্তু মা! মরণ বাঁচনের কথা কিছুই বলা যায় না। অতএব মা আমার এ কথাটী রক্ষা করিও।" শচী অগত্যা উহা স্বীকার করিলেন এবং পুস্তকখানি নিকটে রাখিলেন।

বিশ্বরূপ ও লোকনাথ যদিও সমবয়স্ক, সমধ্যায়ী ও পরস্পর ভ্রাতৃ সম্পর্কীয়, তত্রাচ লোকনাথ বিশ্বরূপকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। ইহা বিচিত্র নহে, যেহেতু রূপে গুণে বিশ্বরূপ দেবতার ন্যায় ছিলেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিবেন, লোকনাথকে বলিলেন। লোকনাথও তদ্দণ্ডে বলিলেন যে, বিশ্বরূপ যেখানে যাইবেন, তিনি তাঁহার পশ্চাৎ ছাড়িবেন না। বিশ্বরূপ কাজেই লোকনাথকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন।

বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম তখন ষোল বৎসর মাত্র। বালক বলিলেই হয়, লোকনাথ তাঁহার ছোট। এই দুই জনে রজনীতে জগন্নাথের বাড়ীতে শয়ন করিয়া রহিলেন। শীতকাল। রজনী আন্দাজ এক প্রহর থাকিতে দুই জনে উঠিলেন। সম্বলের মধ্যে একখানি গ্রন্থ সঙ্গে লইলেন। আঙ্গিনায় আসিয়া নিদ্রিত মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন, আর নিমাইকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দ্রুতপদে গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। এত রাত্রে পার হইবার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং বামহস্তে পুঁথি

খানি উৰ্দ্ধ করিয়া ধরিয়া, অন্য হস্ত দ্বারা সাঁতার দিয়া গঙ্গাপার হইলেন, এবং সেই শীতকালে আর্দ্র বস্ত্রে পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে এক জন পুরীসম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। নাম হইল শঙ্করাণ্যপুরী। বিশ্বরূপ যেই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, লোকনাথও তৎক্ষণাৎ তাঁহার (বিশ্বরূপের) নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গুরুর দণ্ডকমণ্ডলুধারী হইলেন। সংসারে কখন দুঃখের মুখ দেখেন নাই, এমন দুই জন তরুণ বালক, এইরূপে দণ্ডকমণ্ডলুধারী হইয়া অনন্ত-পথের পথিক হইলেন।

পর দিবস আহারের সময় অতীত হইল, বিশ্বরূপ অদ্বৈত-সভা হইতে আসিলেন না। সেখানে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, বিশ্বরূপ সেখানে যান নাই। বেলপুকুরিয়ায় অনুসন্ধান করা হইল, বিশ্বরূপ বা লোকনাথ দুইজনের কেহই সেখানে নাই। ক্রমে শচী জগন্নাথ শুনিলেন যে বিশ্বরূপ তাঁহাদের ও তাঁহার কনিষ্ঠের মায়া-বন্ধন ছেদন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে গিয়াছেন। যদি পুত্র নিজের সুখের নিমিত্ত, কি নির্ম্মমতায়, কি অন্য কোন ক্ষুদ্র কারণে ছাড়িয়া যায়, তবে তাহা সহ্য করা যায়। এমন পুত্রকে নিষ্ঠুর কি অকৃতজ্ঞ বলা যায়। কিন্তু সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি-দিয়া, সমস্ত মধুর বন্ধন ছেদন করিয়া, যদি কোন প্রিয়জন শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত বনে গমন করে, তবে তাহার বিরহ অসহনীয় হয়। সুতরাং শচী জগন্নাথের শুধু পুত্রশোক নহে, আরও কিছু। আমার পুত্র মদনমোহন, আমার পুত্র নদীয়া-জয়ী, আবার আমার পুত্র নির্ম্মল ও সাধু। পিতামাতা ইহা মনে করিয়া, কাজেই ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন।

অতি সুন্দর, সুবোধ, পিতৃমাতৃ-অনুগত, ভ্রাতৃ-বৎসল, পরম জ্ঞানী ও ভক্ত, অল্পবয়স্ক বালক বৃক্ষতলবাসী হইল, এই কথা ভাবিয়া নদীয়ার লোকে

ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন,—শচী জগন্নাথের ত কথাই নাই। জগন্নাথের কর্ত্তব্য শচীকে প্রবোধ দেওয়া, কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না। বন্ধুবান্ধবে বুঝাইতে লাগিলেন যে তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের পুত্র ধন্য, তাঁহাদের পুত্র হইতে কুল উজ্জ্বল হইল। ইহা শুনিয়া তাঁহারা শান্ত হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহারা পুত্রকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন? সে বাসনা বিন্দুমাত্রও তাঁহাদের মনে ছিল না। ষোল বৎসরের পুত্র না বুঝিয়া সন্ন্যাস করিয়াছে। তুমি আমি হইলে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া, তাহাকে বুঝাইয়া পুনরায় সংসারে প্রবেশ করাইতাম। আর শ্রীভগবানের নিকট ইহাই বলিয়া কান্দিতাম যে, "হে নাথ! এই বালক, বাল্য-চাপল্যে সন্ন্যাস লইয়া, ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আবার সংসারী হইয়া যে ঘোর অপরাধ করিয়াছে, তাহা তুমি ক্ষমা কর।" কিন্তু জগন্নাথ তাহা করিলেন না। তিনি শ্রীভগবানের নিকট অন্যরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতেঃ—

অয়ং বয়ো নূতনমেব সংশ্রিতো
ব্রতাধিশিশ্রায় যতিত্বমেব যৎ।
তদা বিধাতঃ করুণা বিধীয়তাং
সদাত্র ধর্ম্মে নিরতো ভবেদ্ যথা॥ ২য় সর্গ ৯৬॥

জগন্নাথ এই প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার পুত্র ধর্ম্ম নস্ট করিয়া যেন গৃহে ফিরিয়া না আইসেন। শচীদেবীও কোন সময়ে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কাজেই নিমাই, শচী জগন্নাথের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা এরূপ ভক্ত না হইলে শ্রীনিমাইয়ের ন্যায় পুত্র তাঁহাদের কেন লাভ হইবে?

নিমাইয়ের বয়স তখন ছয় বৎসর। সে খেলায় বাহিরে ছিল। বাড়ীতে রোদনধ্বনি শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয়া শুনিল যে, তাহার দাদা সন্ন্যাস করিতে গিয়াছেন। নিমাই বুঝিল, দাদা আর

আসিবেন না, দাদাকে আর দেখিতে পাইব না, এই কথা বুঝিয়া নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তখনই শচী ও জগন্নাথ ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্বরূপকে ভুলিলেন। এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে নিমাই চেতন পাইল। তখন শচী ও জগন্নাথ নিমাইয়ের গাঢ় ভ্রাতৃ স্নেহ দেখিয়া তাঁহাদের নিজের শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহাদের এখন শোক না করিয়া শোকাকুল নিমাইকে সান্ত্বনা করাই কর্ত্তব্য। ইহাই ভাবিয়া পুত্রকে ননামত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, এবং শতবার তাহার মুখচুম্বন করিলেন। সেই অবধি নিমাই চাঞ্চল্য ছাড়িল। নিমাই যদিও দুগ্ধপোষ্য শিশু, তবু মাতাপিতাকে গদ্‌গদ হইয়া বলিল "বাবা মা, তোমরা শান্ত হও। আমি তোমাদিগকে পালন করিব।"

বিশ্বরূপ ষোড়শ বৎসরে সন্ন্যাস করেন, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পুনা নগরের নিকট পাণ্ডুপুর নগরে অতি অলৌকিকরূপে অদর্শন হয়েন।

যথা, কর্ণপুরকৃত "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" গ্রন্থে—

যদা শ্রীবিশ্বরূপোঽয়ং তিরোভূত সনাতনঃ
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদা স্থিতঃ ॥
ততোঽববধূতো ভগবান্ বলাত্মা
ভবন্ সদা বৈষ্ণববর্গ মধ্যে।
জজ্বাল তিগ্মাংশু সহস্রতেজা
ইতি ব্রুবন্ মে জনকো ননর্ত্ত ॥ ৬৩ ॥

যথা, ভক্তমালগ্রন্থে—

"শ্রীগৌরাঙ্গে অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি।
দার পরিগ্রহ নাহি কৈল, হৈলা যতি ॥

শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরীতে নিজ শক্তি।
অপি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি॥
নিত্যানন্দ প্রভু এক শক্তি সঞ্চারিলা।
ভক্তগণ মধ্যে তেজঃপুঞ্জ রূপ হৈলা॥
সহস্র সূর্য্যের তেজ ধারণ করিলা।
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা॥"

ইহার ষোল বৎসর পরে নিমাই তাঁহার জ্যেষ্ঠের অদর্শন স্থান দেখিতে গিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সমস্ত পূর্ব্ব-চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া নিমাই মনোযোগপূর্ব্বক পড়িতে লাগিল। এমন কি, তিলার্দ্ধও মাতাপিতাকে ছাড়িত না। পাছে নয়নের অন্তরালে গমন করিলে মাতাপিতার মনে বিশ্বরূপের শোক পুনরুদ্দীপিত হয়, ইহাই ভাবিয়া গৃহে বসিয়া পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিত। নিমাইকে কোলে করিয়া জগন্নাথ পড়াইতেন, আর শচী নিকটে বসিয়া আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া পুত্রমুখ দেখিতেন। নিমাইয়ের মধুর চরিত্রে শচী ও জগন্নাথ অনেক সান্ত্বনা পাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একটী অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল।

এক দিবস ঠাকুর-পূজার নৈবেদ্যের তাম্বুল লইয়া নিমাই খাইল, আর তদ্দণ্ডে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। নিমাইয়ের অজ্ঞান অবস্থা তাঁহার মাতাপিতা বহুবার দেখিয়া উহার নিমিত্ত তখন আর ভয় পাইতেন না। তাঁহারা নিমাইকে চেতন করিবার নিমিত্ত নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অল্লক্ষণ

পরেই নিমাই চেতন পাইল; চেতন পাইয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিল। নিমাই বলিতেছে, 'বাবা, মা, একটি কথা শুন। দাদা আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। আর আমাকে বলিলেন, তুমি আমার মত সন্ন্যাসী হও।' তখন আমি দাদাকে বলিলাম, 'আমার বয়স এখন অল্প, আমি এখন সন্ন্যাসের কথা কি বুঝিব? আমি ঘরে থাকিয়া মাতাপিতার সেবা করিব। তাহা হইলে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।" এই কথা শুনিয়া দাদা বলিলেন, "ভাল, তবে তুমি যাও, যাইয়া মাতাপিতাকে আমার কোটী নমস্কার জানাইও।"

এই কথা শুনিয়া শচী-জগন্নাথের হর্ষে বিষাদ হইল। এইরূপে দৈবযোগে পুত্রের সংবাদ পাইয়া, আর সে যে তাঁহদিগকে বিস্মৃত হয় নাই শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা অত্যন্ত ভীতও হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন. বিশ্বরূপ কি নিমাইকেও ঘরের বাহির করিবে নাকি?

শচী এই ভয়ের কথা অল্প দিন মধ্যেই ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র ভুলিলেন না। তিনি দিবানিশি ঐ কথা ভাবিতে লাগিলেন। শেষে মনে এইরূপ স্থির করিলেন যে, একটা ছেলে পড়িয়া শুনিয়া জানিল যে সংসার অনিত্য, আর ঘরের বাহির হইল। আর এটাকেও পড়াইলে ঠিক তাহাই হইবে। অতএব নিমাইকে পড়িতে না দেওয়াই ভাল। মূর্খ হইবে, কিন্তু তবু ত ঘরে থাকিবে; দুটী অন্ন বিধাতা অবশ্যই নিমাইকে দিবেন। সমস্ত রাত্রি এই কথা ভাবিয়া প্রভাতে জগন্নাথ যখন গৃহের বাহিরে গমন করেন তখন নিমাইকে ডাকিলেন। আর নিমাই আসিলে বলিলেন, "বিশ্বম্ভর! আজ হইতে তোমার পাঠ বন্ধ। আমার দিব্য লাগে, যদি তুমি ইহার অন্যথা কর।"

নিমাই পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল না। পাঠ বন্ধ করিয়া পুনরায়

খেলায় উন্মত্ত হইল। পূর্ব্বে খেলা, হয় বাড়ীর ভিতরে না হয় বাড়ীর নিকটে হইত, এখন এ-পাড়ায় সে-পাড়ায় হইতে লাগিল। পূর্ব্বকার খেলা শিশুর মত ছিল, এখন বালকের মত আরম্ভ হইল। সুরধুনীতে স্নান করিতে গমন করিয়া নিমাই এখন আর বহুক্ষণ বাড়ী আসিত না। তাহার জলকেলির প্রতাপে ভব্যলোক অস্থির হইয়া পড়িলেন। নিমাই কখন ডুব দিয়া কাহার পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, কখন পূজার ফুল লইয়া আপনি পূজা করিতে বসে, কখন বা পূজার নৈবেদ্য লইয়া আপনি আহার করে। ক্রমে জগন্নাথ মিশ্রের নিকট নিমাইয়ের নামে নানা অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। জগন্নাথ পুত্রের সকল উপদ্রবই সহিয়া থাকিতেন, আর যাহারা অভিযোগ করিতে আসিত, তাহাদিগকে তিনি মিনতি করিয়া শান্ত করিয়া বিদায় করিতেন। এইরূপে রমণীগণও শচীদেবীর সমীপে অভিযোগ করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া দিতেন। কখনও শচীদেবী নিমাইকে ধমকাইতেন। তাহাতে নিমাই এই উত্তর করিত, "তোমরা আমাকে পড়িতে দিবে না, কাজেই আমি মূর্খের মত ব্যবহার করিব না ত কি করিব? ইহাতে শচী আবার পুত্রকে পড়াইবার নিমিত্ত কখন কখন জগন্নাথের নিকট অনুনয় করিতেন। আর বলিতেন যে, পুত্র পড়িতে পায় না বলিয়া দুঃখিত এবং সেইজন্য উপদ্রব করে। কিন্তু জগন্নাথ পড়াইবার কথায় সম্মত হইতেন না। বিশ্বরূপ তাঁহাকে যে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে যে, নিমাই পড়িলেই সংসার ছাড়িয়া যাইবে। নিমাইয়ের উপদ্রব বর্ণনা করিয়া বলরাম দাস এই কবিতাটী লিখিয়াছেন :—

শচী প্রতি যত নিমাই করে অত্যাচার।
সে সব শচীর কাছে সুখের পাথার॥

যেই মাত্র সাজায়েন সোণার তনয়ে।
অমনি মায়েরে হেসে ধূলা মাখে গায়ে॥
সারাদিন খেলি বেড়ায় গঙ্গার বালিতে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা রৌদ্র বোধ নাহি নিমাই চিতে॥
ধরিবারে গেলে দ্রুত পলাইয়া যায়।
উদ্দেশ না পেয়ে শচী খুঁজিয়া বেড়ায়॥
পড়সীর ক্ষতি করে নিমাই দুরন্ত।
তারা মা'য়ে আসি বলে সকল বৃত্তান্ত॥
চপল নিমাই এমনি করে অপচয়।
রাগ না হইয়া তাহে আরো হাসি পায়॥
ঘরে শিশু শুয়ে আছে নিমাই যাইয়া।
ধীরে গিয়া মুখে চিত্র করে কালি দিয়া॥
কারো ঘরে দুধ খেয়ে পলা'বার বেলা।
চেঁচাইয়া বলে, 'তোদের দুধ খেয়ে গেলা'॥
হাসি শচীর কাছে বলে নিমাই-অত্যাচার।
লজ্জা পেয়ে শচী দুটী করে ধরে
কখন কখন শচীর মনে রাগ হয়।
সাট হাতে করি পুত্রে মারিবারে যায়॥
ক্ষণ পরে মাতা-পুত্রে দ্বন্দ্ব মিটি যায়।
মা'য়ে পুত্রে পিরীতের অবধি না হয়॥
যবে সাট হাতে শচী মারিবারে যান।
তখন নিমা'য়ের আছে পলা'বার স্থান॥
এটো হাঁড়ি প'ড়ে আছে বাড়ীর বাহিরে।
তখন নিমাই যায় তাহার মাঝারে॥

অতি শুদ্ধা শচী সেথা যাইতে না পারে।
তর্জ্জে গর্জ্জে নিমাই হাসে মা'র মুখ হেরে॥
কখন বা নিমাই রাগ শোধ নিবার তরে।
সরলা জননী সহ নানা খেলা করে॥
অঙ্গে ঝুটা মাখি মা'র আগেতে দাঁড়ায়।
মা'য়ে ছুঁতে যায় শচী ভয়েতে পলায়॥
মুচী বাড়ী এলে নিমাই পরশিয়া তারে।
মা'য়ে ছুঁতে যায়, শচী সরি যায় ডরে॥
"বল মাতা আর কভু না মারিবি মোরে।
নতুবা আজ এই ছুঁয়ে দিব তোরে॥"
স্বীকার করেন শচী ভয়ে বার বার।
"আজ ক্ষম বাপ কিছু বলিব না আর॥"
কখন গম্ভীর হয়ে মা'র প্রতি কয়।
"এঁটো ঝুটো মন-ভ্রান্তি আর কিছু নয়॥"
সে সময়ে শচী বড় মনে পান ভয়।
ভাবে নিমাই পুত্ররূপে কোন্ মহাশয়॥

এক দিবস নিমাই সেই এঁটো হাঁড়ির স্থানে উপস্থিত। হাঁড়ির উপরে হাঁড়ি বসাইয়া উচ্চ করিয়া তাহার উপর বসিল। শচী পূর্ব্বকার মত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই নিমাই ভুলিল না। শেষে নিমাই বলিল, "যদি তোমরা আমাকে পড়িতে না দাও, তাহা হইলে আমি এ স্থান ত্যাগ করিব না।" তখন সেখানে আরও দুই চারি জন রমণী জুটিয়াছিলেন। তাঁহারা নিমাইয়ের পক্ষ হইয়া শচীদেবীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'নিমাই যে দুরন্তপনা করে, তাহাতে তাহার কোন দোষ নাই। বালকে স্ব-ইচ্ছায় পড়িতে

চায় না। তোমাদের সৌভাগ্য যে পুত্র না পড়িতে পাইয়া দুঃখ বোধ করিতেছে।" তখন শচী নিমাইয়ের কাছে প্রতিশ্রুত হইলেন যে, তাহার পিতার কাছে বলিয়া, তাহার পড়ার বিষয় অনুমতি করাইয়া দিবেন।

শচীর ও পাড়ার বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে জগন্নাথ নিমাইকে আবার পড়িতে দিলেন। নিমাই তখনই সমস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া পড়ায় আবার মনোনিবেশ করিল। নিমাইয়ের বুদ্ধিতে সকলেই চমকিত। একবার পড়িলেই পরিষ্কার বুঝিয়া লয়। আবার তাহার উপর নানা তর্ক করে। পড়াতে তাহার মন এত যে, যে সময় সমবয়স্ক বালকেরা খেলা করে, সে নির্জ্জনে বসিয়া পাঠ অভ্যাস করে।

এইরূপে নিমাইয়ের নয় বৎসর বয়স হইল। তখন জগন্নাথ পুত্রের উপবীত দিবার পরামর্শ করিলেন। তাঁহাদের গুরু ও পুরোহিত বিষ্ণু পণ্ডিত ও সুদর্শন প্রভৃতি অনেক অধ্যাপক আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল, নিমাইকে তৈল-হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করান হইল, নিমাইয়ের রূপ তাহাতে যেন অঙ্গ বহিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর নিয়মানুসারে নিমাইয়ের মস্তক মুণ্ডন করান হইল। তখন জগন্নাথ পুত্রের কর্ণে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিলেন।

এই সময়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা হইল। নিমাইয়ের মস্তক মুণ্ডনের পর যখন তাঁহাকে রক্তবস্ত্র পরানো হইল, তখন সেই নবীন ব্রহ্মচারীর কিরূপ লাবণ্য হইল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু যখন পিতা কর্ণে মন্ত্র দিলেন, তখন নিমাই আবিষ্ট হইয়া প্রথমেই হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিল, এবং কিছুকাল পরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সকলে দেখেন যে, সমস্ত অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে ও সর্ব্বাঙ্গ হইতে অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে, আর নয়ন হইতে ধারা বহিয়া পৃথিবী ভিজিয়া যাইতেছে। তখন সকলে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে নিমাইকে চেতন করিলেন। নিমাই চেতন পাইয়া

আর কিছু বলিল না। তখন তাহার মুখের ভঙ্গী এরূপ গম্ভীর বোধ হইল যে, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল না। তখনই নিমাই পিতার হস্ত ধরিয়া নিয়মমত নিভৃত স্থানে যাইয়া বসিলেন।

উপস্থিত পণ্ডিতগণ নিমাইয়ের এই আবেশ ভাব দেখিয়া অবাক হইলেন। তাহার শরীরে যে কোন দেবতার আবেশ হইয়াছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। অনেকে ইহাই অনুমান করিলেন যে, এই সুন্দর বালকের দেহে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিয়া থাকেন। সেই দিন হইতে নিমাইয়ের একটি নাম হইল "গৌর-হরি।" এবং সেই অবধি কেহ কেহ তাঁহাকে "গৌর-হরি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

নিমাই নিভৃত স্থানে নিয়মমত থাকিয়া বাহিরে আসিলেন, এবং যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি সেইরূপ ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া সকলে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিমাইকে একটি সুপারি দিলেন। তিনি সেই সুপারি তখনই খাইলেন, খাইতে খাইতে অতি গম্ভীর স্বরে জননীকে ডাকিলেন। শচীদেবী আসিয়া দেখেন যে, নিমাইয়ের আকৃতি প্রকৃতি সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যেন কোন পরম জ্ঞানী পুরুষ বসিয়া আছেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় তেজ বাহির হইতেছে, আর সেই আলোকে তাঁহার চতুষ্পার্শ আলোকিত হইয়াছে। শচী, পুত্রের নিকট আসিয়া ভয়ে তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন। পুত্রের ভাব দেখিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তখন নিমাই গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মা, তুমি আর একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করিও না।" ইহাতে শচীদেবী অতিশয় অপরাধিনীর ন্যায় বলিলেন, "আমি অদ্যাবধি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।" শচীর তখন আর নিমাইকে পুত্র বলিয়া বোধ ছিল না। কাজেই নিমাইয়ের "ইচ্ছা" তখন তাঁহার নিকট "আজ্ঞা" বলিয়া বোধ হইল। নিমাই শচীদেবীকে বিদায় করিয়া দিলেন।

একটু পরে নিমাই আবার জননীকে ডাকিলেন। শচী দ্রুতপদে আসিলে তিনি বলিলেন "মা! আমি এই দেহ এখন ত্যাগ করিয়া চলিলাম, সময়মত আবার আসিব। এই যে দেহটি রহিল, এইটি তোমার পুত্র, ইহা যত্ন করিয়া পালন করিও।" এই কথা বলিয়া নিমাইচাঁদ যেমন জননীকে প্রণাম করিতে গেলেন, অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পরিলেন। তখন শচী ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের মুখে জলের ছাট মারিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে একটু পরে নিমাই চেতন পাইলেন। তখন শচী দেখিলেন যে, একটু পূর্ব্বে নিমাই যে বস্তু ছিলেন, এখন আর সে বস্তু নাই; অঙ্গের সে তেজ আর নাই, এখন অঙ্গ-লাবণ্য পূর্ব্বেরই মত। বদনে আর সে গাম্ভীর্য্য নাই, এখন আমার সেই নিমাইচাঁদেরই চাঁদ-মুখ।

এই ঘটনাটি মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন। আর এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বিচারও করিয়াছেন। অর্থাৎ শচীর পুত্র নিমাই বা কে, আর যিনি আসিয়া আবার চলিয়া গেলেন তিনিই বা কে? গুপ্তের অভিপ্রায় কি, সে বিষয়ে আমরা এখানে কোনও বিচার করিবনা।
তবে এই ঘটনার দ্বারা সুবোধ ও বিচক্ষণ লোকে অবতার প্রকরণটী কি, তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। যিনি বলিলেন, "আমি এখন যাই পরে আবার আসিব," তিনি পরে আসিয়াছিলেন এবং তখন তাঁহার পরিচয় দিয়াছিলেন। যথা মুরারি গুপ্তের কড়চা—(৭ম সর্গ)

নিবেদিতং পুগফলাদিকং যৎ
দ্বিজেন ভুক্ত্বা পুনরব্রবীত্তাম্।
ব্রজামি দেহং পরিপালয়স্ব
সুতস্ত নিশ্চেষ্টগতং ক্ষণার্দ্ধম্ ॥২১
ইত্যুক্ত্বা সহসোত্থায় দণ্ডবচ্চাপতদ্ভুবি ॥২২

অস্যার্থঃ—কোনও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিবেদিত একটি সুপারি খাইয়া তিনি

আবার তাঁহার মাতাকে বলিয়াছিলেন, "আমি এখন চলিলাম ; আপনার পুত্রের স্পন্দনহীন দেহটিকে আপনি পালন করুন।" এই বলিয়া সহসা উঠিয়া দণ্ডবৎ করিতে গিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।*

জগন্নাথ মিশ্র এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমাই, তুই কি অদ্য বলিয়াছিলি যে আমি যাই তোমার পুত্র রহিল ?" শিশু নিমাই অবাক্ হইয়া বলিলেন, "কবে ? কি ব'লেছিলাম ? আমি ত কিছু বলি নাই !" জগন্নাথ দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র নিমাই এই কাণ্ডের তথ্য কিছুমাত্র জানে না।

এখন হইতে জগন্নাথের দিন বড় সুখে যাইতে লাগিল। অধ্যয়ন ব্যতীত নিমাইয়ের আর কোন কার্য্য নাই। আর তাহার পূর্ব্বেকার মত দুরন্তপনা নাই, লোকে নিমাইয়ের সুখ্যাতি বই নিন্দা করে না : নিমাই সুদর্শন ও বিষ্ণু পণ্ডিতের নিকট পাঠ করেন। অধ্যাপকগণ বলেন ত্রিভুবনে এমত বুদ্ধিমান্ ছাত্র আর নাই। নিমাইয়ের রূপও ক্রমে প্রস্ফূটিত হইতেছে। জগন্নাথ এক দিবস গোপনে গৃহের ঠাকুর রঘুনাথের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, নিমাই ঘরে থাকিয়া যেন সংসার করে, আর চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকে ! দৈবাৎ নিমাই এ কথা শুনিয়া চুপ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন জগন্নাথ নিমাইয়ের রূপ লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, তাহাকে যেন "ডাকিনী স্পর্শ না করে", তখন নিমাই লজ্জা পাইয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

নিমাইয়ের বয়ঃক্রম তখন আন্দাজ একাদশ, ও শচীর আন্দাজ পঞ্চান্ন. সুতরাং জগন্নাথ তখন বৃদ্ধ। এই সময় তাঁহার জ্বর হইল। জ্বর দেখিয়া সকলে ভয় পাইলেন। শেষে জগন্নাথের অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে, শচী ক্রন্দন করিবার উপক্রম করিলেন। তখন নিমাই মাতাকে প্রবোধ দিয়া

---

* এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ইহার সুমীমাংসা স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে।

বলিলেন যে, রোদন পরে হইবে, এখন পিতার অন্তিমের শুভ দেখিতে হইবে। ইহাই বলিয়া, খাটের উপর করিয়া, মাতা-পুত্রে শায়িত জগন্নাথকে লইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে সুরধুনী তীরে গমন করিলেন। বন্ধুবান্ধব সঙ্গে চলিলেও পিতাকে বহন করিবার ভার নিমাই কাহাকেও দিলেন না। তিনি স্বয়ং ও তাঁহার জননী তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

জগন্নাথের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। তখন নিমাই ধৈর্য্য হারাইলেন এবং পিতার দুটী চরণ হৃদয়ে ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আজ অবধি আমার বাবা বলা ফুরাইল। তুমি আমাকে কাহার হাতে সঁপিয়া যাইতেছ? কে আমাকে যত্ন করিয়া পড়াইবে?"

তখন জগন্নাথ একটু সজীব হইয়া নিমাইকে বুকের উপর লইলেন ও বলিলেন, "নিমাই, আমার মনের সকল সাধ পুরিল না, তোমাকে আমি রঘুনাথের হাতে সঁপিয়া গেলাম। বাপ, তুমি আমাকে ভুলিও না।" ইহাই বলিয়া জগন্নাথ আর কথা কহিলেন না; তখন জগন্নাথ মিশ্র "আধনাভি গঙ্গাজলে" রঘুনাথের নাম অস্ফুট-স্বরে জপিতে জপিতে, মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শচী দ্বাদশবর্ষীয় পিতৃহীন বালকটীকে লইয়া আপনাকে এরূপ সহায়-হীনা ভাবিতে লাগিলেন যে, পতিশোকের নিমিত্ত ভাল করিয়া ক্রন্দনও করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ অনেক ঘটনা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, নিমাইয়ের অন্তর ভালবাসায় পূর্ণ, তিনি কান্দিলে পুত্রের পিতৃশোক উথলিয়া উঠিবে, এবং নিমাই অন্তরে ভয় পাইবে। শচী মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, নিমাই যে পিতৃহীন, কাঙ্গাল ও সহায়শূন্ত হইয়াছে, ইহা

তাহাকে সাধ্যমত জানিতে দিবেন না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শচী পতিশোক সহ্য করিয়া একান্তমনে কেবল পুত্রের সেবা করিতে লাগিলেন। সংসারের ব্যয় অতি অল্পই ছিল, একপ্রকারে চলিয়া যাইত। তবে তিনি স্ত্রীলোক, সহায়হীনা, পুত্রটীকে কিরূপে পড়াইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রটীকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী লইয়া গেলেন।

গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল ছিল। বাটীর অভ্যন্তরে যাইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া অন্তরাল হইতে ক্রন্দন করিতে করিতে শচী বলিলেন, "আমি এই পিতৃহীন বালকটীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি কৃপা করিয়া ইহাকে আপন পুত্র ভাবিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইয়া যশ ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। অন্যান্য ছাত্রকে পড়াইলে তোমার যে যশ ও ধর্ম্ম হইবে, নিমাইকে পড়াইলে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে, কারণ এ বালক পিতৃহীন—অসহায়।" এই বলিয়া শচী নিমাইয়ের হাত ধরিয়া গঙ্গাদাসকে দিলেন।

গঙ্গাদাস বলিলেন, "নিমাইয়ের মত শিষ্য বহুভাগ্যে মিলে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যথাসাধ্য ইহাকে পড়াইব। আর ইহার পিতা নাই বলিয়া ইহার পড়ার কিছু ব্যাঘাত হইবে না।"

তখন নিমাই গুরুর চরণে প্রণাম করিলেন, আর গঙ্গাদাস আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার বিদ্যালাভ হউক।"

এখন হইতে নিমাই নিয়মমত গঙ্গাদাসের টোলে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের বুদ্ধি অমানুষিক, পাঠ দেওয়া মাত্র বুঝিতে পারেন। নিমাই তখন এরূপ মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন যে, অতি অল্পকাল মধ্যে টোলের সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিলেন। নিমাইয়ের বয়ঃক্রম তখন চতুর্দ্দশ বর্ষের অধিক হইবে না। কিন্তু

গঙ্গাদাসের টোলে ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সের ছাত্রও পাঠ করিতেন, অলঙ্কারে অদ্বিতীয় কমলাকান্ত ও তন্ত্রসারকর্ত্তা কৃষ্ণানন্দ পড়িতেন, আর সেই টোলে মুরারি গুপ্তও পড়িতেন। নিমাই তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতে যান। তাঁহারা শিশু-জ্ঞানে নিমাইয়ের সহিত তর্ক করিতে চাহেন না, কিন্তু নিমাই ছাড়েন না। ক্রমে মুরারির সহিত তর্কযুদ্ধ বাধিয়া গেল, মুরারি পরাস্ত হইলেন। তখন নিমাই ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত দিলেন, আর তদ্দণ্ডে মুরারির দেহ আপাদমস্তক আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। মুরারি ইহাতে বিস্মিত হইলেন। তখন বালককালে নিমাইয়ের সহিত তাঁহার যে কাণ্ড হয়, তাহা তাঁহার মনে পড়িল। সে অদ্ভুত ঘটনা তিনি সময়ে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন সেই কথাটী মনে হওয়ায়, নিমাইয়ের মুখপানে চাহিলেন। দেখেন যে, চন্দ্রের ন্যায় বদনে কমলদলের ন্যায় দুটী চক্ষু রসে টল টল করিতেছে। তখন ভাবিতেছেন এ বস্তুটী কি? এটী কি মানুষ?

প্রাতঃকালে নিমাই চতুষ্পাঠীতে পাঠ করেন। ভোজনান্তে আবার পুস্তক লইয়া বসেন। বিকালে সুরধুনী-তীরে বহুতর পণ্ডিতের সহিত দেখাশুনা হয়; সেখানেও শাস্ত্রালাপ করেন। যখন গঙ্গায় স্নান করিতে যান, তখন অন্যান্য টোলের পড়ুয়াদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাহাদের সহিত শাস্ত্রযুদ্ধ করেন। এক ঘাটে ক্ষণেক যুদ্ধ করিয়া অন্য ঘাটে সন্তরণ দিয়া যান। কোন কোন দিন বা এই যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গঙ্গাপার হইয়া ওপারে কুলিয়ার ঘাটে উপস্থিত হন। পথে কাহার সহিত দেখা হইলে, তাহার সহিতও শাস্ত্রালাপ করেন।

কিন্তু নিমাই সকল পড়ুয়ার সহিত সমান ব্যবহার করিতেন না। যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহাদের উপর যেন একটু অধিক আক্রোশ। বৈষ্ণব পাইলে, তাঁহার পিতার বয়সের লোক হইলেও তাঁহাকে ছাড়িতেন না।

আশ্চর্য্য এই, ছেলে বেলায় নিমাইয়ের সহিত যাঁহার যত বিবাদ হইয়াছিল, পরে তাঁহার সহিত তত প্রণয় হয়। কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুরারি ও নিমাই একত্রে পড়েন, কলহ প্রায় মুরারির সহিত হইত, কিন্তু কৃষ্ণানন্দের সহিত কখনও হইত না।

এই অতি অল্প বয়সে, ঘরে বসিয়া নিমাই একখানি ব্যাকরণের টিপ্পনী করিয়াছিলেন। উহা তখন ক্রমে ক্রমে সমাজে আদৃত হইতেছিল। নবদ্বীপে কোন গ্রন্থ চালান অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু নিমাইয়ের টিপ্পনী নবদ্বীপে প্রচার হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্য সমাজেও প্রবেশ করিল।

ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত হইলে, নিমাইয়ের ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার ইচ্ছা হইল। তিনি তখন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে প্রবেশ করিলেন।

একে নিমাই বালক, তাহাতে অল্প দিন তাঁহার টোলে ছিলেন বলিয়া, বাসুদেব তাঁহাকে তত লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু পড়ুয়াগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে বিলক্ষণ লক্ষ্য করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দীধিতির গ্রন্থকর্ত্তা রঘুনাথ একজন; নিমাইকে পাইয়া রঘুনাথের হর্ষে বিষাদ হইল। কোন একটী অপরূপ বস্তু দেখিলেই জীবের আনন্দ হয়; নিমাইকে দেখিয়া রঘুনাথের সেইরূপ আনন্দ হইল। কিন্তু নিমাইয়ের প্রতিভায় তিনি মলিন হইয়া গেলেন। রঘুনাথ জানিতেন যে, তিনি জগতে সর্ব্বপ্রধান হইবেন। তাঁহার জীবনের লক্ষ্যও তাহাই ছিল। কিন্তু নিমাইকে দেখিয়া সে আশা ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। নিমাইয়ের সঙ্গে যতই আলাপ করেন, ততই সে আশা শুকাইয়া যায়। তবে নিমাইয়ের মধুর চরিত্র বলিয়া, উভয়ে প্রণয়ও ছিল। এই দুই জনের একদিনকার কথা লইয়া বলরাম দাস একটি কবিতা রচনা করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চৌপাঠীতে নিমাইয়ের নাম 'বিশ্বম্ভর' ছিল। যথা—

নাম রঘুনাথ, অদ্যাপি বিখ্যাত।
পড়ে চৌপাঠীতে, নিমাইয়ের সাথ॥
রঘু তীক্ষ্ণ বুদ্ধে, ন'দে চমকিত।
কেবল নিমাই, নিকটে স্তম্ভিত॥
রঘুনাথ পড়ে, মনোযোগ দিয়া।
নিমাই বেড়ায়, অতি চঞ্চলিয়া॥
কখন যে পড়ে, কেহ নাহি জানে।
তবু রঘুনাথ, নারে তার সনে॥
রঘুনাথ বলে, "শুনরে নিমাই।
লুকায়ে রজনী, পড় কার ঠাঁই" ॥
নিমাই বলিল, "সরস্বতী পাশে।"
ইহাই বলিয়া, দুই জনে হাসে॥
রঘুনাথ-গুরু, রঘুকে ডাকিয়া।
ফাঁকি এক দিল, পূরণ লাগিয়া॥
কঠিন সে ফাঁকি, সারাদিন গেল।
ভাবিতে ভাবিতে কিছু না খাইল॥
ফাঁকির উত্তর, বৈকালেতে হ'লো।
গুরুকে বলিয়া, রান্ধিতে বসিল॥
এমন সময়, নিমাই আসিল!
রন্ধন বিলম্ব, কারণ পুছিল॥
রঘু বলে, "ভাই, গুরু ফাঁকি দিল।
ভাবিতে ভাবিতে, সারাদিন গেল॥
এখনি উত্তর, গুরুকে কহিল।
তাহাতে বিলম্ব, রান্ধিতে হইল" ॥

হাসিয়া নিমাই কহে, "রঘু শুন।
তোমার ভাবিতে, গেল সারাদিন ॥
অবশ্য সে ফাঁকি, কতই কঠিন।
শুনিতে আমার, কুতূহল মন ॥"
শুনি রঘু ফাঁকি, নিমায়ে বলিল।
শুনি মাত্র নিমাই, উত্তর করিল ॥
অবাক্ হইয়া রঘু, চাহিয়া রহিল।
উঠিয়া নিমাই, দু'কর ধরিল ॥
বলে "বিশ্বম্ভর, ভাঁড়াইস্ না মোরে।
তুই কি মানুষ, না দেব বিশ্বম্ভরে ?"

নিমাই ন্যায় পড়িতে আরম্ভ করিয়াই একখানি ন্যায়ের টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করিলেন। রঘুনাথও সেই সময় তাঁহার দীধিতি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রঘুনাথ কোনরূপে শুনিলেন, বিশ্বম্ভরও একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ লিখিতেছেন। একথা শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। চৌপাঠীতে বিশ্বম্ভরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি না কি একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ লিখিতেছ ?" বিশ্বম্ভর বলিলেন, "হাঁ একটু একটু লিখিয়া থাকি বটে, তুমি কিরূপে জানিলে ?" রঘুনাথ বলিলেন, "ভাই, তোমার সে পুঁথিখানা আমাকে কি একবার দেখাইবে ?" নিমাই বলিলেন, "তাহার আর বিচিত্র কি ? কল্য যখন চৌপাঠীতে আসিব পুঁথিখানা সঙ্গে করিয়া আনিব, আর যখন গঙ্গা পার হইব, তখন নৌকার উপর তোমাকে পড়িয়া শুনাইব।"

তৎপর দিন নিমাই ও রঘুনাথ, নৌকায় পার হইবার সময়, সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। নিমাই তাঁহার নিজের পুস্তক পড়িতে লাগিলেন, আর রঘুনাথ শুনিতে লাগিলেন। রঘুনাথের সমাজে

লাভের আশা অতি বলবতী। তিনি যে ভারতবর্ষে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবেন, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার একমাত্র কণ্টক বিশ্বম্ভর। তিনি ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, বিশ্বম্ভর আর তিনি এক পথে গমন করিলে তাঁহার সে প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে না। তিনি যে ন্যায়ের গ্রন্থখানি লিখিতেছেন, তাহা যে জগতে আদৃত হইবে, তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু বিশ্বম্ভর আবার আর একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ লিখিতেছেন, এই জন্য সচিন্তিত মনে নিমাইয়ের গ্রন্থ শুনিতে লাগিলেন।

গ্রন্থ পাঠারম্ভ মাত্র রঘুনাথের মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, যে ভাব ব্যক্ত করিতে তাঁহার দশ পাতা লিখিতে হইয়াছে, নিমাই তাহা দুই এক ছত্রে অতি পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। নিমাই যতই পড়িতে লাগিলেন, ততই রঘুনাথ ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তিনি তখন বেশ বুঝিলেন যে, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের আশা তাঁহার কিছুমাত্র নাই। শেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ইহাতে নিমাই পাঠ বন্ধ রাখিয়া অতি ব্যস্তভাবে বাহু প্রসারিয়া রঘুনাথকে ধরিলেন এবং গদ্‌গদ ভাবে বলিতে লাগিলেন, "একি ভাই, কি হইল? তুমি রোদন কর কেন?"

তখন রঘুনাথ কান্দিতে কান্দিতে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "ভাই বিশ্বম্ভর! তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, আমার সাধ ছিল, আমি সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত হইব এবং আমি যে গ্রন্থ লিখিয়াছি, তাহা জগতে চলিবে। এই নিমিত্ত দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলাম। আজ আমার সকল আশা ফুরাইল। কারণ তোমার এ গ্রন্থ থাকিতে আমার গ্রন্থ কে পড়িবে?"

তখন নিমাইয়ের নয়নে জল আসিল। তিনি রঘুর গলায় হাত দিয়া

তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "এ অতি সামান্য কথা! তুমি রোদন সম্বরণ কর। এ অফল শাস্ত্র, ইহার আবার ভালমন্দ কি?" ইহাই বলিয়া নিজকৃত গ্রন্থখানি গঙ্গায় টানিয়া ফেলিয়া দিলেন। আর সেই অফল শাস্ত্রের চর্চ্চাও ছাড়িয়া দিলেন।

নিমাইয়ের সেই হইতে ন্যায় পড়া সমাপ্ত হইল এবং টোলে পড়াও শেষ হইল। তখন আপনি টোল করিলেন। মুকুন্দ সঞ্জয় নামক একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। নিমায়ের নিজ বাড়ীতে স্থান না হওয়ায়, সেই চণ্ডীমণ্ডপে টোলের স্থান হইল। তখন তাঁহার বয়স সবে ষোল বৎসর। এত অল্প বয়সে কেহ কখন টোল করিতে পারেন নাই,—বিশেষতঃ নবদ্বীপে! যদিও নবদ্বীপে বড় বড় পণ্ডিতের বড় বড় টোলের অবধি ছিল না, তবু নিমায়ের টোলের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এই টোল হইবার কিছুকাল পরে, বনমালী নামক একজন ব্রাহ্মণ-ঘটক নিমায়ের বিবাহের সম্বন্ধ আনিলেন। বল্লভাচার্য্যের লক্ষ্মী নামে পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিলেন। বনমালী আচার্য্য এই সম্বন্ধের কথা শচীদেবীর নিকট উত্থাপন করিলেন। সম্বন্ধ স্থির করিয়া শচীদেবী পুত্রকে বিবাহের কথা বলিলেন, এবং মাতাপুত্রে পরামর্শ করিয়া যথাসাধ্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের অঙ্গে তৈল হরিদ্রা মাখান হইল। শচীর বাড়ীতে বহুদিবস পরে আবার আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। শচী তখন সব দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন, পতির শোক ভুলিয়াছেন। ভুলিয়া, অভ্যাগতা রমণী-গণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিতেছেন। শচী রমণীগণকে বলিতেছেন, "বাছা, তোমরা কিছু মনে করিও না। আমরা কাঙ্গাল, পুত্র বালক, তাহাতে পিতৃহীন। তোমাদের যথাযোগ্য সমাদর করি আমাদের এমন কি সাধ্য?" রমণীগণও তাহার যথোপযুক্ত উত্তর দিতেছেন। এমন

সময় হঠাৎ সকলে দেখেন যে, নিমাই মস্তক অবনত করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতেছে, আর মলিন বদন বহিয়া ধারার উপর ধারা পড়িতেছে।

তখন শচী মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন, "নিমাই, ও কি হ'লো? তুই কান্দিস্ কেন? এ শুভদিনে কি কান্দিতে আছে?" কিন্তু নিমাই শান্ত হইলেন না, নয়নে আরও জলধারা পড়িতে লাগিল। তখন শচী কাতর হইয়া আঁচল দিয়া পুত্রের নয়ন মুছাইয়া বলিলেন, "বাছা, এ শুভ দিনে কান্দিয়া অমঙ্গল করিতেছ কেন? আমার সুখের দিনে তোমার মুখ মলিন দেখিলে আমার প্রাণ কি করে একবার ভাবিয়া দেখ!"

তখন নিমাই অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, "মা তোমাকে দুঃখ দিয়া ভাল করি নাই। কিন্তু মা, তুমি অজ্ঞান, কিছু বুঝ না। আমার এই বিবাহের দিনে আমার পিতা ও ভ্রাতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে. তাহাতে আমার ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহারা থাকিলে বড় সুখী হইতেন, এই কথা মনে হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

অনন্তর নিমাই বিবাহ করিয়া বাড়ীতে ঘরণী আনিয়া সংসারী হইলেন। নিমাই পণ্ডিত দীর্ঘকায়, সুগঠিত অঙ্গ, শরীরে জীবনাবধি কখন রোগ হয় নাই, অসীম শক্তি;—তাঁহার মত চঞ্চল নবদ্বীপে কেহ ছিল না; তিনি প্রত্যহ দুই বেলা গঙ্গায় সন্তরণ দিয়া অনায়াসে এ-পার ওপার হইতেন। অধ্যাপনা সমাপ্ত হইলে, শিষ্যগণ লইয়া যখন গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিতেন, তখন লোকে অস্থির হইত। কেহ বা মন্দ বলিত, কেহ বা গালি দিত, কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের শরীরে ক্রোধ ছিল না। পথে সর্ব্বদাই দ্রুতগতিতে চলিতেন। তখন যদিও অধ্যাপক হইয়াছেন, তবু রাজপথে দৌড়াদৌড়ি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। যাহারা কখন নিমাই পণ্ডিতকে দেখে নাই, তাহারা তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিত,

"এই নিমাই পণ্ডিত ? এ দেখি চঞ্চলের শিরোমণি, যেরূপ চঞ্চল তাহাতে পাঠে মন কিরূপে দেয় !" কিন্তু উচিত কথা বলিতে কি, যখন নিমাই পণ্ডিত টোলে বসিতেন, তখন তিনি অটল ও গম্ভীর ; কাহার সাধ্য তাঁহার সহিত তখন চপলতা করে ? অতি বৃদ্ধ ও অতি বিখ্যাত অধ্যাপক তাঁহার কাছে আসিয়া ভয়ে ভয়ে বসিতেন।

নিমাই পণ্ডিত নিজে শ্রীহট্টিয়, আর বহুতর শ্রীহট্টবাসী নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিত। নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে দেখিলেই তাহাদের শ্রীহট্টিয়া কথা অনুকরণ করিয়া বিদ্রূপ করিতেন। তাহারা রাগে গরগর হইয়া বলিত, তুমি যে ঠাট্টা কর তোমার বাড়ী কোথায় ? কিন্তু নিমাই পণ্ডিত এ সকল কথায় কর্ণপাতও করিতেন না, আরও ঠাট্টা করিতেন। শেষে তাহারা ঠেঙ্গা হাতে করিয়া অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাই পণ্ডিতকে তাড়া করিত। তখন নিমাই পণ্ডিত দৌড় মারিতেন। দৌড় মারিতে যে তিনি চিরকাল বড়ই মজবুত, তাহা তাঁহার ভক্তগণের বিশেষরূপে জানা ছিল। নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে ঠাট্টা করিয়াছেন বলিয়া, তাহারা কখনও দেওয়ানে নালিশ করিত, কখনও বা পেয়াদাও আসিত ; আরও দারোগা অন্যায় করিয়া, নিমাই পণ্ডিতের দিকে হইয়া, উলটিয়া বাদিগণকে ঠাট্টা করিত। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। নিজদেশীয় ব্যতীত অন্য কোন দেশীয় বালকগণকে তিনি কখন ঠাট্টা করিতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈষ্ণব ব্যতীত কাহারও সঙ্গে তিনি শাস্ত্রযুদ্ধ করিতেন না। এ সকল কথা একত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে।

মুকুন্দ দত্ত নামে একজন চট্টগ্রামবাসী বৈদ্যকুমার নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ও সুগায়ক ছিলেন, এবং অদ্বৈত-সভায় কীর্ত্তন গান করিতেন। ইঁহাকে পাইলে নিমাই অল্পে ছাড়িতেন না। এক দিবস চঞ্চল নিমাই, চঞ্চল পড়ুয়াগণের সহিত রাজপথে চাঞ্চল্য

করিতে করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে. মুকুন্দ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে একপাশ হইতেছেন। নিমাই শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা বলিতে পার, ওটা আমাকে দেখিলে পলায় কেন?" শিষ্যগণ উত্তর করিল, 'বোধ হয়, অন্য কোন কাজ আছে।" নিমাই বলিলেন, "তা নয়। তোমরা বুঝিতেছ না। ওটা বৈষ্ণব, আর বৈষ্ণবে শাস্ত্র পড়ে, আমার সঙ্গে বৃথা শাস্ত্রের কচ্‌কচি করিতে চাহে না, আমাকে পাষণ্ড ভাবে।" ইহাই বলিয়া হাসিতে হাসিতে মুকুন্দকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "তুই পলা'স্‌ কোথা? আমার হাত হ'তে তুই কখনই পল'াতে পারবি না। কিছুকাল পরে তোকে এমন করে বাঁধব যে, তুই চিরকাল আমার নিকট আবদ্ধ থাকৃবি।" তাহার পরে শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ভাই সব, আমি ঠিক কথা বল্‌ছি, তোমরা দেখ্‌বে আমিও বৈষ্ণব হ'ব, কিন্তু উহার মত হ'ব না। আমি এমনই বৈষ্ণব হ'ব স্বয়ং শিব আমার দ্বারস্থ হ'বেন।" ইহা বলিয়া আপনি হাসিলেন, শিষ্যগণও হাসিতে লাগিল। কেহ বা ইহাও ভাবিল, নিমাই পণ্ডিত নাস্তিক, মহাদেবকে মানেন না।

মাধব মিশ্রের তনয় গদাধর মিশ্র নিমাই অপেক্ষা ছোট। দেখিতে অতি সুন্দর, চরিত্র অতি মধুর, ন্যায় পাঠ করেন। তাঁহাকে দেখিলেই অমনি নিমাই তাঁহার দুইখানি হাত ধরিয়া শাস্ত্রযুদ্ধ করেন। শেষে গদাধর নিতান্ত কাতর হইয়া অনুনয় বিনয় করিয়া মুক্তি পান। নিমাই বলিতেছেন, "গদাধর, কল্য যেন আবার তোমার দেখা পাই।" গদাধর ভাবিতেছেন, এইবার পলা'তে পার্‌লে বাঁচি।

এই সময়ে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিলেন। ইনি বৈদ্য কি কায়স্থ বংশীয়, হালিসহরের একাংশ কুমারহট্টে ইঁহার পূর্ব্বনিবাস। ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্রপুরীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

মাধবেন্দ্রের অন্তর্দ্ধানকালে তাঁহার শিষ্য ঈশ্বরপুরী তাঁহার বড় সেবা করেন। তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সমুদায় প্রেম ঈশ্বরপুরীকে অর্পণ করিয়া যান। মাধবেন্দ্রপুরী এই শ্লোকটি মৃত্যুকালে রচনা করিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে অপ্রকট হয়েন ; যথা :—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥

ঈশ্বরপুরী সর্ব্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল। তিনি একখানি রাধাকৃষ্ণ-রসঘটিত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত নামক কাব্যগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ নিশিতে গদাধরকে লইয়া সেই গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করেন।

এক দিবস ঈশ্বরপুরীর সহিত পথে নিমাইয়ের দেখা হইল। নিমাই তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ঈশ্বরপুরী শুনিলেন ইনি নিমাই পণ্ডিত। তিনি নিমাইকে বড় পণ্ডিত বলিয়া জানিতেন, কিন্তু বোধ হয়, চঞ্চল বলিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন নাই। এখন নিমাইকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। একদৃষ্টে তাঁহার আপাদমস্তক দর্শন করিতে লাগিলেন, আর মনে ভাবিতেছেন, "এ বালক যেন যোগসিদ্ধ পুরুষ। এ বস্তুটী কি ?" নিমাই একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, শ্রীপাদের আমার ওখানে অদ্য ভিক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলে এখন যেরূপ আমাকে দেখিতেছেন, তখন সারাদিন আমাকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইবেন।" উভয়ে ইহাতে একটু হাসিলেন। ঈশ্বরপুরী আগ্রহ করিয়া সেই ভিক্ষা স্বীকার করিলেন।

নিমাইয়ের সহিত ঈশ্বরপুরীর এই প্রথম পরিচয়। তদবধি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গদাধর ও নিমাই শ্রবণ করেন এবং ঈশ্বরপুরী তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করেন। ঈশ্বরপুরি বলিতেছেন, "পণ্ডিত, আমার গ্রন্থখানি তুমি শ্রবণ কর এবং ইহাতে যে দোষ আছে তাহা সরলভাবে বলিয়া দাও, আমি

সংশোধন করি।” তাহাতে নিমাই বলিলেন, “কৃষ্ণের কথা, ভক্তের বর্ণন, তা’তে দোষ ধরে এমন সাহস কা’র?” সে যাহা হউক, এক দিবস গ্রন্থ পাঠের সময় নিমাই একটী শ্লোকের ধাতু লাগে না বলিয়া ভুল ধরিলেন। ঈশ্বরপুরী তখন উত্তর করিতে পারিলেন না। সারা নিশি ভাবিয়া তাহার পর দিন নিমাইকে বলিতেছেন “তুমি যাহা পরস্মৈপদী করিয়াছ, আমি তাহা আত্মনেপদী করিয়াছি।” নিমাই হারি মানিলেন। কিছুকাল পরে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এইরূপে নিমাই পণ্ডিত অহর্নিশ বিদ্যাচর্চ্চা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার টোলের ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে হঠাৎ একদিন তিনি অপ্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ বিহ্বল হইয়া, কখন হাস্য, কখন রোদন করিতেন, কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতেন। শচী ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের সহজ জ্ঞান উদয় করিবার নিমিত্ত নানা উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, নিমাই যেরূপ সেইরূপই রহিলেন। তখন পাড়ায় যাঁহারা পরমাত্মীয় ছিলেন, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া শচী তাঁহার বিপদের কথা বলিলেন। তাঁহারা আসিয়া নিমাইয়ের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে ইহাই স্থির করিলেন যে, নিমাইয়ের বায়ুরোগ হইয়াছে, তাঁহাকে বিষ্ণুতৈল মাখাইতে হইবে। বিষ্ণুতৈল সংগৃহীত হইল, আর নিমাইকে ঐ তৈল দ্বারা উত্তমরূপে সকলে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে নিমাইয়ের সে ভাব সারিয়া গেল। আরোগ্য হইলেও, মায়ের অনুরোধে নিমাই বিষ্ণুতৈল মাখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার পীড়া আর ছিল না। পাঠক কৃপা করিয়া এই ঘটনাটী স্মরণ রাখিবেন। পরে এই ঘটনা লইয়া কিছু বিচার করিবার ইচ্ছা রহিল।

এখন নিমাইয়ের যৌবনারম্ভ। কিছুকাল পরে ইচ্ছা হইল পূর্ব্বদেশে গমন করিবেন। এই অভিপ্রায় মায়ের কাছে ব্যক্ত করিলেন। জননী নিমাইকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। কিন্তু নিমাই তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ দিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে গমনের উদ্যোগ করিলেন। আপনার ঘরণী লক্ষ্মী-দেবীকে মায়ের কাছে রাখিয়া, সঙ্গে কয়েকটী শিষ্য লইয়া, একেবারে পদ্মার ধারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাহার পর পদ্মা পার হইয়া কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, এই উদ্যোগে তিনি শ্রীহট্টে নিজ পিতামহের বাটীতে গিয়াছিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠতাত-তনয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কর্ত্তৃক প্রণীত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রোদয়াবলী' গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, তিনি তখন সেখানে যান নাই।

যখন নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বাঞ্চলে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সঙ্গিগণ দেখিলেন যে তাঁহার যশ, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই, পূর্ব্বদেশে ব্যাপিয়াছে। নিমাই পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া পূর্ব্বাঞ্চলের পড়ুয়াগণ মহা আনন্দিত হইয়া দলে দলে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। তাহারা বলিল যে, তাহারা তাঁহার টিপ্পনি দেখিয়া ব্যাকরণ অভ্যাস করিয়া থাকে। আর তাহাদের বহুভাগ্য যে, তিনি এখন স্বয়ং তাহাদের দেশে আগমন করিয়াছেন।

যে নিমাই পণ্ডিত এত চঞ্চল, যিনি বিদ্যারসে দিবানিশি উন্মত্ত, যিনি বৈষ্ণব দেখিলে বিদ্রূপ করিতেন, সেই নিমাই পণ্ডিত, পূর্ব্বাঞ্চলে কয়েক-মাস মাত্র বাস করিয়া, তাহারই মধ্যে সেই দেশ হরিনামে উন্মত্ত করিলেন। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থকার বলেন যে, নিমাই পণ্ডিত কয়েকমাস পূর্ব্বাঞ্চলে থাকায়, ঐ প্রদেশ একেবারে উদ্ধার হইয়াছিল।

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকার বলেন যে, সেই সময় তিনি হরিনামের নৌকা সাজাইয়া সজ্জন দুর্জ্জন, আচারী বিচারী, পতিত ও অধম সকলকে পার

করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যখন নবদ্বীপে ছিলেন, তখন তাঁহার এ ভাব কিছুই ছিল না: আবার নবদ্বীপে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখনও এ ভাব কিছুই রহিল না।

এই পূর্ব্বাঞ্চলে থাকিবার সময় তপন মিশ্র নামক একজন অতি সাধু ব্রাহ্মণ নিমাই পণ্ডিতের নিকট আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডবৎ হইয়া বলিলেন, —তিনি স্বপ্নে জানিয়াছেন যে, নিমাই পণ্ডিত পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। অতএব তিনি তাঁহার নিকট উদ্ধার পাইতে আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, "এ কথা বলিতে নাই, জীবে ভগবৎ বুদ্ধি মহাপাপ।" ইহাই বলিয়া তাঁহাকে "হরে কৃষ্ণ" মন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দিলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কথা বলিলেন। সে কথাটী এই,—"তুমি কাশীতে গিয়া বাস কর, সেখানে তোমার সহিত আমার দেখা হইবে" যথা শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি খণ্ডে—

মিশ্র কহে আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি।
প্রভু কহে তুমি শীঘ্র যাহ বারাণসী॥
তথায় আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য ও সাধন॥

এই আজ্ঞা পাইয়া তপন মিশ্র সস্ত্রীক অনতিবিলম্বে বারাণসীতে গমন করিলেন। সেখানে তপন পথ চাহিয়া রহিলেন, আর দশ বৎসর পরে নিমাইকে দেখিতে পাইলেন।

কয়েক মাস পরে নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বদেশ হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ী পৌছিলেন। সঙ্গে বহুতর দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন। সমস্তই জননীর চরণে রাখিয়া তাঁহাকে অন্ন প্রস্তুত করিতে বলিয়া সঙ্গিসহ গঙ্গাস্নানে গেলেন।

ফিরিয়া আসিয়া নিমাই পণ্ডিত ভোজন করিলেন; করিয়া, বহির্দ্বারে

আসিলে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি বহু লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। ইহাদিগের নিকট তিনি পূর্ব্বাঞ্চল-বাসের বিবরণ বলিতে লাগিলেন। আর যে যে বাঙ্গালিয়া কথা শুনিয়াছেন ও শিখিয়া আসিয়াছেন, তাহা একে একে শ্রোতৃবর্গকে শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহার অনুকরণের পারিপাট্য দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন, নিমাই আপনিও হাসিলেন।

তাহার পর নিমাই বাড়ীর ভিতরে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত আত্মীয়গণও চলিলেন। তখনই জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, তোমার মুখ মলিন কেন? বিদেশ হইতে আমি বাড়ী আসিলাম, ইহাতে তুমি আনন্দিত না হইয়া, দুঃখিতের মত রহিয়াছ কেন?" এই কথা শুনিয়া শচী কান্দিয়া উঠিলেন। জননীর রোদন শুনিয়া নিমাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "মা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমার বোধ হয় তোমার বধূর কোন অমঙ্গল হইয়া থাকিবে।" তখন সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "তাহাই বটে। তোমার ঘরণী বৈকুণ্ঠলাভ করিয়াছেন। তাঁহার সর্পাঘাত হইয়াছিল, আর বহু চেষ্টায়ও তাহার প্রতিকার হয় নাই।"

তখন নিমাই বদন হেঁট করিলেন ও নীরবে অল্পক্ষণ রোদন করিলেন। একটু পরে ধৈর্য্য ধরিয়া জননীকে বলিলেন, "মা, তুমি কি শুন নাই, যে স্ত্রীলোক স্বামীর আগে দেহত্যাগ করে সে বড় ভাগ্যবতী? সে উত্তম ভাগ্য পাইয়াছে, আমাদের ক্ষোভ করা কর্ত্তব্য নহে।" ইহাই বলিয়া আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন।

নিমাই পণ্ডিত যখন নবদ্বীপে আসিলেন, তখন পূর্ব্ব দেশ হইতে বহুতর শিষ্য তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে আসিল। পূর্ব্বকার তাঁহার যে সকল পড়ুয়া ছিল, আর নবাগত পড়ুয়া লইয়া তিনি পুনরায় মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল বসাইলেন। নিমাই পণ্ডিত অল্প বয়সে অধ্যাপক, এই জন্য তাঁহার বড় মহিমা। তাহার পর বিদ্যা ও

বুদ্ধিতে তাঁহার যশ সমস্ত দেশ ব্যাপিয়াছে। চরিত্র অতি নির্ম্মল, শিষ্যের সহিত কি অন্যান্য লোকের সহিত ব্যবহার অতি মধুর। পড়ুয়াগণ তাঁহার নিকটে পড়া মহাভাগ্য বলিয়া মনে করিত। পূর্ব্বদেশে গোপনে গোপনে প্রেমভক্তি বিতরণরূপ যে একটী কাণ্ড করিয়া আসিয়াছেন, নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার সে ভাবের চিহ্নমাত্রও নাই। নিমাই পূর্ব্বাঞ্চল যখন পরিত্যাগ করেন, তখন সে দেশের লোকেরা কি বলিতে লাগিল, তাহা চৈতন্যমঙ্গলে এইরূপ বর্ণিত আছে—

ঐ শোন আমার নিমাই ডাকেরে।
কে যাবি আয় ভবসাগর পারে ॥ধ্রু॥
চণ্ডাল পতিত কিবা সজ্জন দুর্জ্জন।
সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম ॥
শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার।
নাম দিয়া সবারে কৈল ভব পার ॥
নাম-সংকীর্ত্তন প্রভু নৌকা সাজাইয়া।
পার কৈল সর্ব্ব লোক আপনি যাচিয়া ॥
যে জনারে পায় তারে ধরি কোলে করি!
ভবনদী পার করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
এ হেন করুণা নাহি শুনি কোন যুগে।
কোন্ অবতারে কোথা কেবা পাপ মাগে ॥
সভারে পবিত্র কৈল সমভাব করি।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের করিল অধিকারী ॥
দয়ার সাগর প্রভু সর্ব্বলোক-গতি।
করুণা প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধ মতি ॥

বস্তুত নিমাই পূর্ব্ববঙ্গে আর যান নাই। কিন্তু সেখানে অধিকাংশ

লোক তাঁহার ভক্ত। অতএব যে শক্তিতে নিমাই ঐ দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা অননুভবনীয়।

নিমাইয়ের বয়স তখন অষ্টাদশ, ব্যাকরণ পড়াইয়া থাকেন। তাঁহার কথায় তপনমিশ্র দেশত্যাগ করিবেন কেন? কিন্তু তাহা তিনি করিলেন। আবার নিমাই ভবিষ্যতে বারাণসীতে যাইবেন, তাহা তিনি জানিতেন, নতুবা একথা কিরূপে বলেন যে, তোমায় আমায় বারাণসীতে দেখা হইবে? আর তপন এই আশায় দশ বৎসর প্রতিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

ভাল, তপন মিশ্র না হয় নিকটে আসিয়া নিমাইকে দর্শন কি স্পর্শ করিয়া উদ্ধার হইলেন। কিন্তু সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চলকে সেই ব্যাকরণের শিশু অধ্যাপক নিমাই কিরূপে হরিনামে উন্মত্ত করিলেন?

চণ্ডাল পতিত কিবা সজ্জন দুর্জ্জন।
সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম॥

কেন করিলেন তাহার কারণ লেখা আছে—

দয়ার সাগর প্রভু সর্ব্বলোক-গতি।
করুণা প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধ মতি॥

কিন্তু কিরূপে করিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

নিমাই পড়াইতে এরূপ তৎপর যে, তাঁহার নিকট পড়িলে পড়ুয়ার ক্লেশ হইত না, আর অতি অল্প সময়ে পাঠ অভ্যাস হইত। সুতরাং নিমাই পণ্ডিতের টোল ক্রমেই শ্রীসম্পন্ন হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ হইতে এই কয়েক চরণ উদ্ধৃত করিলাম।—

কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হয়ে পড়ে ঠাঁই ঠাঁই॥
প্রতি দিন দশ বিশ ব্রাহ্মণ-কুমার।
আসিয়া প্রভুর পায়ে করে নমস্কার॥

এখন আর শচীর ঘরে দারিদ্র্য নাই, এখন নিমাই নবদ্বীপের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। বড় বড় বিষয়িগণ নিমাই পণ্ডিতকে রাজপথে দেখিলেই, অমনি দোলা হইতে নামিয়া তাঁহাকে নমস্কার করেন। যেথানে ক্রিয়া-কর্ম্ম হয় তাহার উপহার অবশ্যই তাঁহার বাড়ীতে আসে। কিন্তু নিমাই বড় ব্যায়শীল বলিয়া ধনসঞ্চয় হইত না। অতিথি পাইলেই তাঁহাকে যত্ন করিয়া আহার করাইতেন। সাধু দেখিলেই তদ্দণ্ডে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এইরূপে শচীদেবীকে প্রত্যহ দশ বিশটি অতিথির সেবা করিতে হইত। এই সময় কেশব-কাশ্মিরী নামক একজন মহাপণ্ডিত নবদ্বীপে আসিলেন।

পণ্ডিত কেশব, কাশ্মীর দেশীয়; দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছেন। ভারতবর্ষে যেথানে যেথানে পণ্ডিতের স্থান আছে, সর্ব্বস্থান জয় করিয়া শেষে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। এই নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলেই তিনি অদ্বিতীয় হইবেন। চাল-চলন খুব বড় মানুষের মত। সঙ্গে হাতী ঘোড়া লোক জন বিস্তর আছে। তিনি 'আটোপ টঙ্কারে' বলিলেন, "এই নবদ্বীপের যদি কোন পণ্ডিত সাহসী থাকেন, তবে আসিয়া আমার সহিত বিচার করুন, নতুবা আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিউন।" বিচারে যদি তিনি জয়লাভ করিতে পারেন, তবে নবদ্বীপ-সমাজ হইতে তাঁহাকে উপহার দিতে হইবে। যদি তিনি পরাজিত হয়েন, তবে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নবদ্বীপবাসিগণের হইবে।

নবদ্বীপে জয় করা তখন সহজ ব্যাপার ছিল না। যেহেতু রঘুনাথ, রঘুনন্দন, নিমাই পণ্ডিত প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী তখন নবদ্বীপে বিরাজিত ছিলেন। কিন্তু কেশবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটী কথা প্রচার হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, তিনি সরস্বতীর বরপুত্র। সরস্বতী স্বয়ং কেশবের জিহ্বায় বসিয়া বিচার করেন, তাঁহাকে পরাজয় করিবার কাহারও সম্ভাবনা

নাই) এই জনরবে বিশ্বাস হওয়াতে, সমস্ত প্রধান পণ্ডিতের মুখ শুকাইয়া গেল। সরস্বতীর সহিত কে যুদ্ধ করিবে ? যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন, তাঁহার সহিত নবদ্বীপের পণ্ডিতের বিচার করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু সরস্বতীর সহিত কে বিচার করিবে ? সকলে মহা-চিন্তিত হইয়া, কিরূপে নবদ্বীপের মান থাকে তাহার নানাবিধ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এমন সময়, কেশব কাশ্মিরীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের দেখা হইল।

সে এইরূপে। গ্রীষ্মকাল, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। নিমাই পণ্ডিত বহুতর শিষ্য সহ সুরধুনীতীরে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, কৌতুক-রহস্যও চলিতেছে। এমন সময় সেই পথ দিয়া কেশব যাইতেছিলেন। বহুতর পড়ুয়া দেখিয়া এবং অন্তর হইতে নিমাই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া, একটু কৌতুহলী হইয়া অধ্যাপকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, নিমাই পণ্ডিত। নিমাই পণ্ডিত বড় পণ্ডিতের মধ্যে একজন। কেশব ভাবিলেন যে, ইনি কি বস্তু জানিয়া যাইবেন। তাঁহার কোথাও যাইতে দ্বিধা কি ভয় নাই, কারণ তিনি দিগ্বিজয়ী।

তখন কেশব সেই সভায় প্রবেশ করিয়া নিজ জন দ্বারা আপনার পরিচয় দিলেন। এই কথা শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত শিষ্যগণের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া মহা-সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পরে সকলে বসিলে কেশব বলিতেছেন, "তুমি নিমাই পণ্ডিত ?" নিমাই কোন কথা কহিলেন না। কেশব নিমাইকে অতি বালক দেখিয়া একটু মুরুব্বিপণা ভাবে বলিতেছেন, "তোমার বয়স অল্প, কিন্তু তোমার ব্যাকরণে বড় প্রতিষ্ঠা এ কথা আমি শুনিয়াছি।" তাহাতে নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "আমি ব্যাকরণ পড়াই বটে, কিন্তু সে আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। আমিও বুঝি না, আমার শিষ্যেরাও বুঝে না। কোথায় আপনি প্রবীণ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, আর কোথায় আমি বালক—অজ্ঞ।" কেশব ইহার

সমুচিত উত্তর দিলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত বলিতেছেন, "এই গঙ্গা সম্মুখে, আপনি কিঞ্চিৎ গঙ্গাস্তব প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে শ্রবন করান, আমরা শুনিয়া তৃপ্ত হই ও আমাদের পাপও অন্তর্হিত হউক।" ইহাতে কেশব, "তাহাই হউক" বলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

কেশব স্তব পড়িতেছেন, ঝড়পে—না ঝড়ের ন্যায়! একবারও চিন্তা করিতেছেন না। একটী শ্লোক যেই শেষ হইতেছে, অমনি আর একটী আওড়াইতেছেন।

স্তব শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত। মুহূর্ত্ত মধ্যে এরূপ একটী স্তব প্রস্তুত করা মনুষ্যের সাধ্য নয় বলিয়া, সকলের বোধ হইল। ছাত্রগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, "হরি হরি" স্মরণ করিতে লাগিলেন। নিমাই পণ্ডিতের উপর তাঁহাদের অতীব ভক্তি। কিন্তু কেশবের পাণ্ডিত্য দেখিয়া মনে এই ভয় হইল যে তাঁহাদের নবীন অধ্যাপক এরূপ পণ্ডিতের সহিত বিচারে পারিবেন কি না।

কিন্তু নিমাই সেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না; না হইয়া দিগ্বিজয়ীর বহুল প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, "আপনার ন্যায় কবি জগতে দুর্ল্লভ। আপনার শক্তি অমানুষিকী। এখন আমার একটী বিনীত নিবেদন আছে। শ্লোকের দোষগুণ বিচার না করিলে, উহা ভালরূপ আস্বাদন করা যায় না। অতএব আপনি যে শ্লোকগুলি পাঠ করিলেন, ইহার একটী লইয়া বিচার করিয়া আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করুন।"

তখন দিগ্বিজয়ী বলিলেন, "কোন্ শ্লোকটী লইয়া আমি বিচার করিব বল, আমি তাহার অর্থ করিতেছি।" ইহাতে নিমাই পণ্ডিত কেশবের পঠিত শ্লোকের মধ্যে একটী আওড়াইলেন। সেটী এই :—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাম্
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ।।

ইহা শুনিয়া কেশব বিস্মিত হইলেন, হইয়া বলিতেছেন, "আমি ঝঞ্ঝা-বাতের ন্যায় শ্লোক পড়িয়া গেলাম, তুমি ইহার মধ্যে একটী কিরূপে কণ্ঠস্থ করিলে ?" দিগ্বিজয়ীর মনের ভাব যে, নিমাই পণ্ডিত সম্ভবতঃ শ্রুতিধর হইবেন। নিমাই পণ্ডিত কেশবের মনের ভাব বুঝিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, উত্তর করিলেন, "কেহ বা সরস্বতীর বরে কবি হয়, কেহ বা তাঁহার বরে শ্রুতিধর হয়।" এই কথায় কেশবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, নিমাই পণ্ডিত নিশ্চয়ই শ্রুতিধর হইবেন। ইহাই ভাবিয়া নিমাইয়ের প্রতি ভক্তি হইল। তখন একটু পরিশ্রম করিয়া সেই শ্লোকের গুণ বিচার করিতে লাগিলেন। গুণ বিচার সমাপ্ত হইলে নিমাই পণ্ডিত বলিতেছেন, "আপনি যেরূপ গুণ বিচার করিলেন, ইহাতে নিতান্ত কৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে ঐ শ্লোকে কি কি দোষ আছে বলুন।''

বিচার করিয়া, দিগ্বিজয়ীর জিগীষাবৃত্তিটা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছিল। নিমাই পণ্ডিতের মুখে "শ্লোকের কি দোষ আছে" এই কথাটা শুনিয়াই কেশব ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন বলিতেছেন, "তুমি বৈয়াকরণ, কিন্তু শ্লোকের দোষ গুণ বিচার করা অলঙ্কার শাস্ত্রের কার্য্য। তুমি ব্যাকরণ শিশু-শাস্ত্র পড়িয়াছ, অলঙ্কার পড় নাই, তুমি শ্লোকের দোষ-গুণ-বিচার কি বুঝিবে ?"

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "আমি অলঙ্কার পড়ি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি, তাহাতেই শ্লোকের যে যে দোষ বলিতেছি।'' এই বলিয়া নিমাই শ্লোকের দোষ বিচার করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এই বিচার ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পড়িবেন। সেই গ্রন্থে নিমাই পণ্ডিত কোন্ নয় কি দোষ ধরিলেন, তাহা সমস্তই পরিষ্কাররূপে লেখা আছে। নিমাই পণ্ডিত শ্লোকের দোষ

ধরিতে থাকিলে, কেশব উহার অপর পক্ষ সমর্থন করিতে গেলেন কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহার সমুদয় প্রতিভা নষ্ট হইয়া গেল। শেষে সংজ্ঞাহারা লোকের ন্যায় প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। দিগ্বিজয়ী, বালক অধ্যাপকের নিকট, সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে এরূপ অপদস্থ হইয়া, ঘৃণা লজ্জা ও অপমানে তাঁহার সহজ জ্ঞান একেবারে লোপ পাইল। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া নিমাইয়ের কোন কোন শিষ্য হাসিতে লাগিল।

নিমাই পণ্ডিত তখন রুক্ষভাবে সেই সকল পড়ুয়াকে নিবারণ করিলেন। পরে কেশবকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেছেন, "কবিত্বে দোষ থাকা কোন গ্লানির কথা নহে, কালিদাস ও ভবভূতিতেও দোষ আছে। কবিত্বশক্তি থাকাই ভাগ্যের কথা, তাহা আপনার প্রচুর পরিমাণে আছে। অতএব কোন শ্লোকে যদি কিছু দোষ থাকে, তাহাতে আপনার কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে গমন করুন; কল্য আপনার সহিত ভাল করিয়া বিচার করিব।"

দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের মধুর বাক্যে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ধীরে ধীরে বাসায় গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না, সমস্ত রাত্রি দুঃখে সরস্বতীর স্তব পড়িতে লাগিলেন। প্রত্যূষে একেবারে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত। নিমাই শয়ন-ঘর হইতে যেমন বাহিরে আসিলেন, অমনি কেশব তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহা দেখিয়া নিমাই পণ্ডিত দুই বাহু ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। উঠাইয়া বলিলেন, "আপনি প্রবীণ পণ্ডিত, আমি বালক। আমার নিকট এরূপ দীন হইয়া কেন আমাকে অপরাধী করিতেছেন?" তখন কেশব বলিতেছেন, "আপনি আমার কাহিনী অগ্রে শ্রবণ করুন। আমি আপনার নিকট অপদস্থ হইয়া সারা রাত্রি সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলাম। অল্প রজনী থাকিতে

একটু তন্দ্রা আইসে। তখন সরস্বতী দেবী আমাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, 'তুমি যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছ, তাঁহার অগ্রে আমি লজ্জায় যাইতে পারি না। তাঁহার সম্মুখে আমার কিছু স্ফূর্ত্তি হয় না। তিনি আমার কান্ত। তুমি এতদিন আমাকে সেবা করিয়া, যাহা মনুষ্যের পুরুষার্থ তাহা পাইয়াছ। তুমি অতি প্রত্যুষে তাঁহার নিকট গিয়া আত্মসমর্পণ করিও।' এই আজ্ঞা পাইয়া এখন আমি আপনার চরণে শরণ লইলাম। সর্ব্বদা বিচার-যুদ্ধ করিয়া আমার কুপ্রবৃত্তি সকল অতিশয় বলবতী হইয়াছে। এখন আপনি কৃপা করিয়া আমার সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া দিউন।" ইহা বলিয়া দিগ্বিজয়ী কান্দিতে কান্দিতে নিমা'য়ের চরণে আবার পড়িলেন। তখন নিমাইপণ্ডিত তাঁহাকে দুই চারিটি কথা বলিলেন,—কি বলিলেন তাহা জানা যায় না। তবে কেশব তদ্দণ্ডে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আপনার যে সম্পত্তি ছিল সমুদয় বিতরণ করিলেন এবং দণ্ডকমণ্ডলুধারী হইয়া ও কৌপীন পরিয়া জন্মের মত সংসার ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

কৌতুক রহস্য সদা ভক্ত সঙ্গে। সাঁতারে আনন্দে গঙ্গার তরঙ্গে॥
নগরে ভ্রমন চঞ্চলের মত। নৌকা-বিহারাদি দৌড়াদৌড়ি রত॥
আমার গৌরাঙ্গ বড়ই চঞ্চল। সেই গুণে মোর পরাণ হরিল॥

—শ্রীবলরাম দাসের গৌরাঙ্গাষ্টক।

নিমাই পূর্ব্ববঙ্গে যাহাই করুন, আর কাহারও কাহারও কাছে যাহাই বলুন, নবদ্বীপের রাজপথে তিনি যেরূপ চঞ্চল ছিলেন, সেইরূপই রহিলেন। টোলের মধ্যে তিনি নিতান্ত গম্ভীর, কিন্তু বাহিরে আসিলে সে গাম্ভীর্য্যের

লেশমাত্র থাকিত না। নিমাইপণ্ডিতের যশ পূর্ব্বেই প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাহার পর দিগ্বিজয়ীকে জয় করায় স্বভাবতঃ সেই যশ আরও বাড়িয়া গেল। তখন তাঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া যাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিত, তাহারাও বলিতে লাগিল যে, নিমাই পণ্ডিতের মত পণ্ডিত জগতে আর নাই; তিনি এবার নবদ্বীপের মানরক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় নিমাই পণ্ডিতের অন্যান্য অধ্যাপকের ন্যায় গম্ভীর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা হইলেন কৈ?

এই সময় তাঁহার বয়স উনবিংশতি বৎসর। পট্টবস্ত্র পরিয়া, বামহস্তে পুঁথি লইয়া, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে নিমাইপণ্ডিত কয়েকটি ছাত্র সঙ্গে করিয়া নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার অমানুষিক রূপ, কমললোচন ও নূতন যৌবন। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত পথে লোক জমিত। কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া হাস্যকৌতুক করিতে করিতে যাইতেন। একদিন পথে শ্রীবাসের সহিত তাঁহার দেখা হইল। শ্রীবাস পরম বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য্য ব্যতীত আর সকলেরই প্রধান। নিমাইপণ্ডিতের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল এবং তাঁহার ঘরণী মালিনীর সহিতও শচীদেবীর অত্যন্ত প্রীতি ছিল। শ্রীবাস ও মালিনী নিমাইপণ্ডিতকে ছেলেবেলায় কোলে করিয়াছেন। সুতরাং তখন হইতেই নিমাইকে ইঁহারা বাৎসল্য বা স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন। শ্রীবাস দেখিতে পাইলেন যে, নিমাইপণ্ডিত শিষ্যগণ সঙ্গে করিয়া হাসিতে হাসিতে দক্ষিণ হস্ত দোলাইয়া দ্রুতগমনে আসিতেছেন। তখন শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কোথা যাইতেছ উদ্ধতের শিরোমণি?"

নিমাইপণ্ডিত শ্রীবাসকে নমস্কার করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। মুখখানি দেখিয়া মনে হইল, যেন হাসি আসিতেছে, কেবল শ্রীবাসের মান

রক্ষার জন্য অনেক কষ্টে গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীবাস তাঁহার ভাব দেখিয়া বলিলেন, "নিমাই, তুমি পরম পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান। তুমি জান যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্য। আমাকে বুঝাইয়া বল দেখি. শ্রীভগবচ্চরণ ভজন না করিয়া এই যে 'দিবানিশি বিদ্যাচর্চ্চা করিতেছ তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে ?"

ইহাতে নিমাই সেই কপট গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত ! আমি বালক বলিয়া আমাকে কেহ গ্রাহ্য করে না। আর কিছুকাল পড়িলে, লোকে আমাকে মানিবে ও চিনিবে। তখন আমি একটী ভাল দেখিয়া বৈষ্ণব খুজিয়া লইব এবং নিজে এরূপ বৈষ্ণব হইব যে, আপনারা পর্য্যন্ত অবাক্ হইয়া যাইবেন। পণ্ডিত ! আমি আপনাকে মনের কথা বলিতেছি, আমি এরূপ বৈষ্ণব হইব যে, অজভব পর্য্যন্ত আমার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।" ইহাই বলিয়া নিমাই পণ্ডিত গাম্ভীর্য্য হারাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীবাসও হাসিলেন, আর আপনাপনি বলিলেন, "ভাল চঞ্চলকে আমি ধর্ম্ম-উপদেশ দিতে আসিয়াছি।" তৎপরে প্রকাশ্যে বলিলেন, "নিমাই, তুমি কি দেবতা ব্রাহ্মণ মান না ?" ইহাতে নিমাই উত্তর করিলেন, "সোঽহং। শ্রীভগবান্ যিনি আমিও তিনি, তবে আর কাহাকে মানিব ?" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিলেন। শ্রীবাসও হাসিলেন বটে. কিন্তু সে দুঃখের সহিত ; কারণ নিমাই তাঁহার স্নেহের পাত্র, তাঁহার মুখে এইরূপ মূঢ় নাস্তিক-তত্ত্ব শুনিয়া তাঁহার দুঃখিত হইবারই কথা। তাহার পরে শ্রীবাসের মনে একটি আশাও ছিল। সেটি এই যে,—নিমাইপণ্ডিত বৈষ্ণবের পুত্র অবশ্য বৈষ্ণব হইবে। আর নিমাইপণ্ডিতের ন্যায় যদি কোন শক্তিধর লোক বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ করে, তবে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প দেখিয়াও শ্রীবাস

দুঃখিত হইলেন। শ্রীবাসকে দেখিয়া, কপট দীনতার সহিত নিমাই যে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইতেন, কি কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেন, কি কখন কখন নিতান্ত চঞ্চলের ন্যায় "আমি সেই" বলিয়া তাঁহার মনে ভয় জন্মাইয়া দিতেন,—এই সকল কথা ইহার কয়েক বৎসর পরে মনে করিয়া, শ্রীবাস বড় সুখ পাইতেন।

নিমাইয়ের আর একটি চাঞ্চল্যের কথা বলিব। স্ত্রীলোকেরা হাবভাব ও কটাক্ষে পুরুষকে ভুলাইয়া থাকে,—এ অধিকার তাহাদের সর্ব্বদেশে আছে। এই হাবভাবে পুরুষকে বাধ্য করিয়া, স্ত্রীলোকে রঙ্গ দেখে। নিমাইও এইরূপ হাবভাব ও কটাক্ষে বাধ্য করিতেন, কিন্তু স্ত্রীলোককে নয়—পুরুষকে। নিমাইয়ের নবদ্বীপে এই গুণের বড় সুখ্যাতি ছিল। নিমাই পথে স্ত্রীলোক দেখিলেই, মস্তক নত করিয়া, পাশ দিতেন। কুলবালাগণ পথে পুরুষ মানুষ দেখিলে যেরূপ কুণ্ঠিত হয়, নিমাইও স্ত্রীলোক দেখিলে সেইরূপ হইতেন। কিন্তু পুরুষের নিকট তাঁহার আর এক ভাব ছিল। তাঁহার কি একটা অমানুষিক শক্তি ছিল যে, ইচ্ছা করিলে যাহাকে তাহাকে সেইরূপ বাধ্য করিতে পারিতেন। তখন মিশ্রকে একটী কথা দ্বারা সস্ত্রীক বারাণসী পাঠাইলেন। ইচ্ছামত কেশবকাশ্মিরীকে উদাসীন করিলেন। আবার একদিন পড়ুয়াগণকে বলিলেন, "চল বাজারে যাই, সংসারে অনেক দ্রব্যাদির প্রয়োজন আছে।" পড়ুয়াগণ বলিল, "পণ্ডিত! বাজরে চলিলেন, কড়ি ত লইলেন না?" নিমাই বলিলেন "গৃহে সম্বল মাত্র নাই। চল যাই দেখি, যদি দুটো মিষ্ট কথা বলিয়া কিছু আনিতে পারি।"

নিমাই প্রথমে তাম্বুলিয়ার দোকানে গমন করিলেন। তাম্বুলিয়া নিমাইকে দেখিয়া বলিতেছে; "ঠাকুর, একটু অপেক্ষা করুন। আমি অতি উত্তম খিলি প্রস্তুত করিতেছি।" তাহার পরে নিমাইয়ের হস্তে একটী

খিলি দিলে, তিনি ঈষৎ হাসিয়া উহা গ্রহণ করিলেন ও চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "তুমি ত পান দিলে, আমার কিন্তু সম্বলমাত্র নাই।" তাম্বুলিয়া বলিতেছে, "আপনি কড়ি দিলে আমি লইব কেন? আপনি তাম্বুল খাইলেন ইহাই আমার পরম লাভ।" তাহার পরে নিমাই সঙ্গিগণ লইয়া তন্তুবায়ের দোকানে গমন করিলেন। দোকানী সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইল। নিমাই বলিতেছেন, "কিছু ভাল কাপড় বাহির কর।" তন্তুবায় কাপড় বাহির করিল। নিমাই কাপড় দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন, "এই জোড়া আমার মনোমত বটে, কত মূল্য লইবে?" আবার বলিতেছেন, "মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়াই বা কি করিব হস্তে কপর্দ্দকও নাই।"

তন্তুবায় নিমাইয়ের মুখপানে চাহিতেছে। ইচ্ছা হইতেছে যে বস্ত্র-জোড়া অমনি দেয়, কিন্তু অত্যন্ত কৃপণস্বভাব, একেবারে কাপড় ছাড়িয়া দিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তখন মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা স্থির করিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! তা মূল্যের জন্য ভাবনা কি? এখন না হয় পরে দিবেন।"

নিমাই বলিতেছেন, "ঋণ করিয়া লওয়া আমার নিতান্ত অনিচ্ছা। পারতপক্ষে ঋণ করিতেও নাই। তবে অদ্য থাকুক, অন্য একদিবস সম্বল সঙ্গে করিয়া আসিব। ইহাতে তন্তুবায় ব্যস্ত হইয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! তোমার ঋণ করিতে হইবে বা! তুমি ব্রাহ্মণ ঠাকুর, তোমার গা দিয়া ব্রাহ্মণের তেজ বাহির হইতেছে। ঠাকুর! তুমি মূল্য মোটেই দিও না, অমনি গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার মঙ্গল হইবে!" নিমাই কাপড় আনিয়া পথে পড়ুয়াদিগকে দেখাইয়া হাসিতে লাগিলেন, পড়ুয়াগণও হাসিতে লাগিল। এইরূপে নিমাই নানা পসারে গমন করিলেন। শেষে প্রকাণ্ড একবস্তা সওদা হইল। অথচ হস্তে এক কড়াও ছিল না, সওদা করিতে ঋণও করেন নাই।

কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "নিমাই এইরূপে লোককে ভুলাইয়া দ্রব্যাদি লইতেন, একি ভাল কার্য্য হইত?" ইহার উত্তর এই যে, তাঁহাকে দেখিয়া যদি কেহ মুগ্ধ হইয়া কিছু দিত, তাহা তিনি লইতেন, তাহাতে দোষ কি? আর তিনি মূল্য যে দিতেন না, তাহারও প্রমাণ নাই। আর যদি মূল্য না দিয়াও থাকেন, তবুও সে কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিবার অধিকার যাঁহাদের অন্যের অপেক্ষা বেশী আছে, তাঁহারা ইহা দোষ বলেন না। যে তন্তুবায়গণ নিমাই পণ্ডিতকে বস্ত্র, যে গন্ধবণিকগণ তাঁহাকে গন্ধদ্রব্য দিয়াছিলেন, তাঁহারা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে সে কথা মনে করিয়া আনন্দে ও গৌরবে অদ্যাপি নয়নজল ফেলিয়া থাকেন। আর এক কথা। নবশাক কি সুবর্ণবণিকের এখনকার যে পদমর্য্যাদা তাহা এই নিমাই পণ্ডিতের দ্বারাই হয়।

শ্রীধর নামে একজন পসারী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ বাজারে কলার খোলার পাত্র ও থোড় মোচা বিক্রয় করিতেন। স্বভাব নিতান্ত সাধুর ন্যায়। ঐরূপ ব্যবসায় যৎকিঞ্চিৎ যাহা আয় হইত, তাহা দ্বারা নিজের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, এবং যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা ঠাকুর-দেবতাকে দিতেন। তিনি দিবানিশি উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম জপ করিতেন। তাঁহার নাম জপিবার উপদ্রবে ভব্যলোকে নিদ্রা যাইতে পারিত না: স্থূল কথা, শ্রীধর একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং নিমাই পণ্ডিতের তাঁহার উপর নিতান্ত আক্রোশ। নিমাই কখন কখন বাজারে যাইতেন, আর তাঁহাকে দেখিলেই শ্রীধরের মুখ শুকাইয়া যাইত। নিমাই বাজারে আসিয়াই প্রথমে শ্রীধরের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীধর ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, "ঠাকুর! কাড়াকাড়ি করিবেন না, আমি যা মূল্য বলিব, তাহার কম লইব না। আপনি আমার নির্দ্ধারিত মূল্য দিয়াই লইয়া যান, নতুবা অন্য পসারীর নিকট ক্রয় করুন। নিমাই বলিতেছেন, "আমি

যোগানিয়া ছাড়ি না। সে যাহাহউক, শ্রীধর তুমি যেরূপ কৃপণ, তোমার অনেক টাকা আছে।" শ্রীধর বলিতেছেন, "ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি, দ্বন্দ্ব করিও না। আমি দরিদ্র, টাকা কোথা পাব?" তখন নিমাই পণ্ডিত, শ্রীধর যে মূল্য বলিল, তাহার অর্দ্ধেক বলিয়া হাতে করিয়া দ্রব্য উঠাইলেন। আর শ্রীধর অমনি দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অন্য পসারীর কাছে যাও।"

তখন নিমাই কৃত্রিম কোপ করিয়া বলিতেছেন "তুমি যে আমার হাতের দ্রব্য কাড়িয়া লও, এ কাজ কি তুমি ভাল করিতেছ? জান তুমি যে গঙ্গাকে প্রত্যহ নৈবেদ্য দাও, আমি তাহার পিতা?" ইহাতে শ্রীধর শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া, দুই কর্ণে হাত দিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! বয়স হইলে লোক ক্রমে ধীর হয়, কিন্তু তুমি ক্রমেই চঞ্চল হইতেছ! তোমার কি গঙ্গাকেও কিছু ভয় নাই?"

নিমাই বলিতেছেন, "ভাল, তুমি দেবতাকে বিনা মূল্যে প্রত্যহ উপহার দিয়া থাক, আমাকে না হয় অল্প মূল্যে কিছু ছাড়িয়া দিলে।" তখন শ্রীধর বলিতেছেন, "ঠাকুর! আমি হারি মানিলাম, কিন্তু আমি মূল্য কমাইব না। তবে তুমি নিতান্তই যদি না ছাড়, তবে তোমাকে প্রত্যহ একখণ্ড থোর ও আহার করিবার খোলার পাত্র বিনামূল্যে দিব, কিন্তু আমার সহিত দ্বন্দ্ব করিও না।" তখন নিমাই বলিতেছেন, "বেশ, এই কথা। তবে আর বিবাদ কি?" এই শ্রীধরের খোলায় নিমাই প্রত্যহ ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

> বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখবালা সোণা।
>
> —শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

শচী যখন গঙ্গাস্নানে গমন করেন, তখন দেখেন যে, একটি বালিকা বিনীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করে। কন্যাটী অতি সুশ্রী, বিবাহ হয় নাই। প্রথমে তিনি তাহার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু প্রত্যহ এইরূপে ঘাটে তাঁহার সহিত দেখা হইলেই, সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া নমস্কার করে দেখিয়া, তাহার প্রতি শচী ক্রমেই আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। বালিকাটি এমনি লাজুক যে, নমস্কার করিয়া তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইয়া থাকে, মুখ উঠায় না। শচী তাহাকে এই নিমিত্ত প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করেন। শচী বলেন, "বাছা! তুমি জন্ম-এয়োস্ত্রী হও। তোমার সুন্দর বর হউক।" আর অমনি সে বালিকাটি লজ্জায় অভিভূত হয়।

একদিন শচী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! তুমি কা'র মেয়ে?" কন্যাটি বলিল যে তাহার বাপের নাম সনাতন মিশ্র। শচী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! তোমার নাম কি?" কন্যাটি বলিল, "বিষ্ণুপ্রিয়া।"

শচী দেখিলেন, কন্যাটি শুধু সুশ্রী ও লজ্জাশীলা নয়, বড় ভক্তিসম্পন্নাও বটে। সে প্রত্যহ তিনবার গঙ্গায় স্নান করে, আর তীরে বসিয়া বালিকাদের যে পূজা তাহা করে। শচী মনে ভাবিতেছেন, "এটি সনাতন মিশ্রের কন্যা, অবিবাহিতা, পরমা সুন্দরীও বটে। দেখিতে যেমন সুশ্রী, চরিত্রও তেমনি মধুর, আমার ভাগ্যে কি উহা হইবে?"

সনাতন মিশ্র রাজপণ্ডিত, ধনবান্ লোক, বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও শচীর আদান-প্রদানের ঘর। শচী ভাবিতেছেন, যে, কন্যাটি যদি পান

তবে নিমাইয়ের সহিত বিবাহ দেন। কিন্তু উহা কিরূপে ঘটিবে? সনাতন বড় মানুষ ও বড় কুলীন। তাঁহার ন্যায় লোক আমার ন্যায় দরিদ্রের ঘরে, পিতৃহীন বালককে কন্যাদান কেন করিবেন?

যাহা হউক, শচী কাশীমিশ্র ঘটককে ডাকাইলেন এবং তাহাকে মনের কথা জানাইয়া শেষে বলিলেন, "তুমি ঐ কন্যাটি আমার ঘরে আনিয়া দাও। মেয়েটির উপর আমার বড় মায়া হইয়াছে। তাহাকে দেখিলেই আমার কোলে করিতে ইচ্ছা করে।" কাশীমিশ্র এই আদেশ পাইয়া সনাতন মিশ্রের বাটিতে গমন করিয়া, আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে সমুদয় কথা তাঁহাকে জানাইলেন ও শেষে বলিলেন, "তা যাহাই বলুন মহাশয়, নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় সুপাত্র নবদ্বীপে নাই।"

সনাতন 'হাঁ' কি 'না' কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আপনি একটু বসুন, আমি আসিতেছি।" ইহাই বলিয়া দ্রুতপদে ভিতর বাটীতে গমন করিলেন। যাইয়া তাঁহার ঘরণীর নিকট অতি প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন; "এতদিনে বিধি সুপ্রসন্ন হইলেন।"

সনাতন মিশ্রের এক কন্যা ও এক পুত্র। কন্যাটি বড়, নাম বিষ্ণুপ্রিয়া; পুত্রের নাম যাদব। কন্যাটি পরমা-রূপসী ও সুচরিত্রা, পিতামাতার প্রাণ। তাহাকে সুপাত্রে দান করিবেন, ইহা মনের স্থির-সঙ্কল্প; কিন্তু সুপাত্র পাইবেন কোথা? বৈদিক-শ্রেণী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্প, তাঁহার আদান-প্রদানের ঘর আরও অল্প। কন্যাটির বিবাহের নিমিত্ত এই কারণে তিনি দিবানিশি চিন্তিত। নিমাই পণ্ডিতের যশ যখন প্রচার হইতে লাগিল, তখন নবদ্বীপের সকলে তাঁহাকে জানিলেন,—সনাতনও তাঁহার নাম শুনিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের ঘরের সহিত তাঁহার আদান-প্রদান চলে সুতরাং নিমাইকে কন্যাদান করিবার কথা স্বভাবতঃই তাঁহার মনের মধ্যে উদয় হইল।

এদিকে নিমাইপণ্ডিতের যশ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আবার যখন দ্বিগ্বিজয়ীকে জয় করিলেন, তখন তাঁহার প্রশংসায় নবদ্বীপ পরিপূর্ণ হইল। নবদ্বীপ বিদ্বজ্জন-সমাজ, সেখানে বিদ্যা লইয়া লোকের ছোট বড় বিচার। যাঁহারা ধনবান্ তাঁহারা পণ্ডিতগণের দ্বারস্থ। যিনি মহাপণ্ডিত, তাঁহার কিছুমাত্র অভাব নাই, সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ, তিনিই সমাজের কর্ত্তা। ধনবান্ দোলা করিয়া যাইতেছেন, পথে যদি কোন পণ্ডিতকে দর্শন করিলেন, অমনি দোলা হইতে নামিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন।

শচীদেবী ভাবেন যে, নিমাই কাঙ্গাল ও বালক এবং একটু পাগল, তাহাকে সনাতন কেন কন্যাদান করিবেন? কিন্তু সনাতন তাহা ভাবেন না। তিনি ভাবেন যে, নিমাই নবদ্বীপের মধ্যে বিদ্বজ্জন-সমাজের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত, তিনি তাঁহার কন্যা কেন গ্রহণ করিবেন?

নিমাইকেও তিনি দেখিয়াছেন। যাঁহারা সরল, তাঁহারা নিমাইকে দেখিলে জন্মের মত আকৃষ্ট হইতেন। সনাতন অতি সরল, নিমাইকে দেখিয়া তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, এটি ত মনুষ্য নয়, কোন দেবতা কি স্বয়ং মদন। ইনি কি তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিবেন? দিবানিশি মনে মনে এই নিমিত্ত দেবতার নিকট নিমাই পণ্ডিতকে জামাতারূপে কামনা করেন। ঘরণীও এই কথা বলিয়াছিলেন, আর ইহা কিরূপে সংঘটন হইবে, দুই জনে বসিয়া বসিয়া তাহাই যুক্তি করিতেন। এমন সময় কাশী মিশ্র আসিয়া সনাতনকে বলিলেন, শচীদেবীর ইচ্ছা তোমার কন্যাকে তাঁহার পুত্রবধূ করেন।" ইহাতে সনাতন আনন্দে কিছু বলিতে পারিলেন না, উঠিয়া দৌড়িয়া ঘরণীকে শুভ-সংবাদ দিতে গেলেন।

এখন সেই কন্যাটির কথা শুনুন। বালিকাটীর রূপ অতি মনোহর কিন্তু তাঁহার রূপ অপেক্ষাও গুণ অধিক, আবার হৃদয়ে ভক্তি থাকায়

সেই রূপ যেন প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে লজ্জা, বিনয় ও ভক্তি, বাহিরের সুগঠন, কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, হিঙ্গুলের ন্যায় অধর, কমলের ন্যায় নয়ন ও কুন্দেকাটা বদন। কন্যাটী তাঁহাকে প্রণাম করিলে শচী তাহাকে শুধু আশীর্ব্বাদ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, নিকটে রাখিয়া তাহার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা করিতেন। কন্যাটীও যেন তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না। শচী মনে মনে ভাবিতেন, "মা, আমি যদি তোমাকে ঘরে আনিতে পারি, তবেই আমার নদীয়া-বসতি সার্থক হয়।"

এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ রমণী স্নান করে, কে কাহাকে চিনে? সেখানে সেই কন্যাটী, এত রমণী থাকিতে, যাঁহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই এমন যে শচীদেবী, তাঁহাকে বাছিয়া প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক কেন প্রণাম করেন? শুধু তাহা নয়। বালিকার বয়ঃক্রম একাদশের ঊর্দ্ধ নয়, কিন্তু তবু প্রত্যহ তিনবার গঙ্গাস্নান করেন ও দিবানিশি ঘরের ঠাকুরসেবায় রত থাকেন, ইহারই বা কারণ কি?

নিমাইয়ের পার্ষদ মুকুন্দ পণ্ডিত, তাঁহার "শ্রীগৌরাঙ্গ-উদয়" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শ্রীনিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে উদয় হয়েন, তাহাতে তিনি নবানুরাগে পাগলিনীর মত হয়েন। চৈতন্যভাগবত এই সম্বন্ধে একটু আভাস দিয়া বলিয়াছেন যে, কন্যাটী দেবভক্তিতে সর্ব্বদা রত থাকিতেন; তিনবার গঙ্গাস্নান করিতেন ও শচীদেবীকে দেখিলেই প্রণাম করিতেন। সে যাহা হউক, নিমাই পণ্ডিতই স্বপ্নে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করুন, কি তিনি নিমাইকে গঙ্গার ঘাটে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হউন, ইহা নিশ্চয় যে, শচীদেবী তাঁহার নিকট বড় মিষ্ট লাগিতেন। আর শচী দেবী মিষ্ট কেন লাগিতেন, না নিমাই পণ্ডিতের মা বলিয়া।

কন্যাকালে নিমাই পণ্ডিতকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া বালিকাটী বড় ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন। মুহুর্মুহুঃ গঙ্গাস্নান করিতে আসেন; মনে

আশা—তাঁহার বরকে দেখিতে পাইবেন। আবার, শচীকে দেখিলে ইচ্ছা করে যে, তাঁহার নিকট গমন করেন। কিন্তু কি বলিয়া যাইবেন? এক উপলক্ষ্য—প্রণাম করা। তাই শচীকে দেখিলেই ধীরে ধীরে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করেন, আর প্রণাম করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া থাকেন;—শচীকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। মনে মনে কি ভাবেন জানি না; বোধ হয় ভাবেন, "তুমি আমার মা, আমাকে ঘরে লইয়া যাও। আমি চিরজীবন তোমার সেবা করিব।" দেবতাগণের নিকট ঠাকুর-ঘরে দিবানিশি যাপন করেন। সেখানেও ঐরূপ কিছু মনে ভাবেন, এবং ঠাকুরদিগের নিকট মনে মনে নিবেদন করেন।

সনাতন মিশ্র আনন্দে ডগমগ হইয়া কাশী মিশ্রের প্রস্তাব আপনার ঘরণীকে শুনাইলেন। তাহাতে তিনিও আনন্দে পুলকিত হইলেন। এ সংবাদ বিষ্ণুপ্রিয়াও শুনিলেন। সেদিন তাঁহার তিনবার গঙ্গাস্নান, দেবদেবীর পূজা, ঘরের ঠাকুর-অর্চ্চনা ও ভাবী শ্বাশুড়ী শচীদেবীকে প্রণাম করা, সমুদয় সফল হইল। সুতরাং তখন তাঁহার কি ভাব হইল, তাহা পাঠক হৃদয়ঙ্গম করুন, আমরা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব না। সনাতন মিশ্র বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া কাশী মিশ্রকে বলিলেন, "এ কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, বহুভাগ্যে নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় জামাতা মিলে। আপনি শচীদেবীকে গিয়া বলিবেন যে, তিনি আমার কন্যাটিকে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া আমাকে ও আমার গোষ্ঠীকে কৃতার্থ করিলেন।" কাশী মিশ্রও এই শুভ সংবাদ শচীদেবীকে জানাইলেন।

সনাতন মিশ্র ধনবান, কন্যাটী তাঁহার প্রাণ, নিমাই পণ্ডিত তাঁহার জামাতা হইবেন, এই সমস্ত কারণেই পণ্ডিত মিশ্র আহ্লাদে সংজ্ঞাহারা হইলেন। তিনি এই বিবাহ উপলক্ষ্যে সর্ব্বস্ব দান করিবেন, স্থির করিলেন। তখন স্বর্ণকার ডাকাইয়া নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও বিবাহের অন্যান্য দ্রব্য

প্রস্তুত করিতে দিলেন। "শুভস্য শীঘ্রং" ভাবিয়া এই কার্য্য যাহাতে অনতিবিলম্বে নির্ব্বাহ হয়, তাহার নিমিত্ত লগ্ন স্থির করিতে এক গণককে ডাকাইলেন।

গণক সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে আসিতেছেন, এমন সময় পথে চঞ্চল নিমাই পণ্ডিতের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তখন গণক হাসিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত! জান, আমি কোথায় যাইতেছি?" নিমাই বলিলেন "না, আমি জানি না।" গণক বলিলেন, "আমি সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে বিবাহের লগ্ন স্থির করিতে যাইতেছি।" নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার বিবাহ?" গণক উত্তর করিলেন, "তোমার, আর কাহার?" ইহাতে নিমাই পণ্ডিত অত্যন্ত হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমার বিবাহ? কৈ আমি ত তাহার কিছুই জানি না।" ইহা বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

গণক, সনাতনের বাড়ীতে আসিলে, সনাতন তাঁহাকে লগ্ন স্থির করিতে বলিলেন। শুনিয়া গণক গম্ভীরভাবে বলিলেন যে নিমাই পণ্ডিতের সহিত একটু পূর্ব্বে তাঁহার দেখা হইয়াছিল, আর বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটী কথাও হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল, যেন তাঁহার এ বিবাহে মত নাই।

সনাতন ভাবিলেন যে, বিবাহের কথাবার্ত্তা শচীদেবীর সহিত হইয়াছে। তিনি বৃদ্ধা, পুত্র বড় হইয়াছে। নিমাই পণ্ডিতের এখন স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করাই সম্ভব। যখন নিমাইয়ের মত নাই, তখন শচীদেবীর মতে কি হইবে? এই ভাবিয়া সনাতন মর্ম্মাহত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। ক্রমে এ কথা তাঁহার ঘরণীর কর্ণে উঠিল, তিনি হাহাকার করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও শুনিলেন, তখন তাঁহার কি অবস্থা হইল তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। সনাতন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে ডাকাইলেন ও সমুদয় কথা বলিলেন। কিন্তু পাত্রের যখন বিবাহে মত

নাই তখন বন্ধুবান্ধব আর কি পরামর্শ দিবেন? এইরূপে সনাতন মিশ্র দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একথা নিমাই পণ্ডিত শুনিলেন। তিনি কেন যে গণকের কাছে ওরূপ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বিচার করা নিষ্ফল। তাঁহার মাতা তাঁহার প্রতি শিশু-সন্তানের মত ব্যবহার করিতেন। নিমইও সংসারের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না,—জননীই সংসারের কর্ত্রী। তিনি যখন যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, জননীর শ্রীচরণে রাখিয়া অবসর লইতেন। শচী আপন ইচ্ছামত সংসার চালাইতেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়া তাঁহার নিজের কাজ, ইহাই ভাবিয়া শচী আপনি কন্যা দেখিলেন, ঘর দেখিলেন, সম্বন্ধ নির্ণয় করিলেন। আবার আপনা আপনিই বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিমাইকে আবার এ সম্বন্ধে কি বলিবেন? সুতরাং একথাও হইতে পারে যে, প্রকৃতই নিমাই বিবাহ সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না, তাই গণককে ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

আবার ইহাও হইতে পারে যে, সকল বিষয় উপেক্ষা করা নিমাইয়ের মজ্জাগত স্বভাব ছিল। হঠাৎ কাহারও করস্থ হইতেন না। কারণ যদিও তাঁহার বয়ঃক্রম্ তখন বিংশতি বৎসরের বেশী নহে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অতি তেজীয়ান পুরুষ। তিনি উপেক্ষা করিলে, উপেক্ষিতের তাঁহার উপর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পাইত;—সনাতন মিশ্র সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিল। সনাতন মিশ্র ও তাঁহার গোষ্ঠী নিমাই কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া, তাঁহাকে পাইবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন।

যেখানে প্রীতি গাঢ়, সেখানে উপেক্ষায় উহা বর্দ্ধিত হয়। যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে উপেক্ষা করিলেন, তখন শ্রীমতী অচেতন হইয়া পড়িলেন, চেতন পাইয়া চতুর্দ্দিক কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও আবার উপেক্ষা

করিয়া বড় ক্লেশ পাইলেন। তাঁহার উপেক্ষায় শ্রীমতী মর্ম্মাহত হইবেন ভাবিয়া তিনি নিকুঞ্জবনে শয়ন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। সেইরূপ যেমন সনাতন হাহাকার করিতে লাগিলেন, নিমাইও একথা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তখন ব্যস্ত হইয়া একজন সুহৃদকে সনাতন মিশ্রের নিকট পাঠাইলেন।

নিমাই পণ্ডিতের প্রেরিত লোক আসিয়া সনাতনকে বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত জননীর আজ্ঞাবহ। জননী যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাই তাঁহার শিরোধার্য্য। অতএব আপনি দিন স্থির করিয়া বিবাহের উদ্যোগ করুন।" ইহাতে সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে পুনরায় আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল।

এদিকে নিমাই পণ্ডিতের আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধব পড়ুয়াগণ শুনিলেন যে, সনাতন মিশ্রের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছে; এই কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। কায়স্থ জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ বলিলেন যে, বিবাহের সমুদায় ব্যয়ভার তিনি একাকী বহন করিবেন। ইহাতে, নিমাইপণ্ডিত যে মুকুন্দসঞ্জয়ের বাড়ীতে টোল করিয়াছিলেন তিনি আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, তিনিও ব্যয়ভারের অংশ লইবেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁ তখনই ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন,—এ বামুনের বিবাহ নয়, তিনি নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ এরূপ সমারোহের সহিত দিবেন যে, রাজপুত্রের বিবাহও সেরূপ হয় না। যাহা হউক, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, মুকুন্দ সঞ্জয় এবং নিমাইয়ের পড়ুয়াগণ সকলে একত্র হইয়া বিবাহের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। উদ্যোগও প্রকাণ্ডরূপে হইতে লাগিল।*

*অল্পদিন হইল একখানি সংস্কৃত পুস্তকে বুদ্ধিমন্ত খানের মহিমা জানিলাম। গ্রন্থখানির নাম "বল্লাল চরিত"। প্রণেতার নাম শ্রীমৎ আনন্দ ভট্ট। গ্রন্থকর্ত্তা বুদ্ধিমন্ত খানের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। তিনি খান মহাশয়কে নদীয়ার রাজা বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। ইহাতে নদীয়ার রাজা দুইজন হইলেন,—"জগাই মাধাই" আর "বুদ্ধিমন্ত"। জগাই মাধাই

এখনকার আর তখনকার বিবাহের উৎসব প্রায় একই রূপ। বিবাহের নিমিত্ত নবদ্বীপের সমস্ত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও অন্যান্য জাতির মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহারা সকলে নিমন্ত্রিত হইলেন। বিবাহের উদ্যোগও সেইরূপ হইতে লাগিল। নিমাইয়ের বাড়ী চন্দ্রাতপে, নিশানে, কদলীবৃক্ষে, আম্রসারে সুসজ্জিত হইল। নারীগণ সমস্ত বাড়ী আলিপনা দিলেন। বিবাহের নিমিত্ত বিস্তর আহারীয় দ্রব্য সংগৃহীত হইল। ভোজ্য ও বস্ত্র সমস্ত নবদ্বীপে বিতরিত হইল। সনাতন মিশ্র অধিবাস করিতে লোক পাঠাইলেন। শচীদেবীও অধিবাস করিতে সনাতন মিশ্রের বাড়ী লোক পাঠাইলেন। বিবাহের যেরূপ সমারোহ হইল, নবদ্বীপে সেরূপ সমারোহের বিবাহ কেহ কথনও দেখে নাই। চৈতন্যভাগবত বলেন যে, যে সমুদায় দ্রব্য পড়িয়া রহিল, তাহা দ্বারা পাঁচটী উত্তম বিবাহ সম্পন্ন হয়। চৈতন্য-ভাগবত আরও বলিয়াছেন যে নিমাইয়ের অলৌকিক শক্তিতে দ্রব্যাদি অফুরন্ত হইয়াছিল। শচী মহানন্দে জল সওয়া, ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতি নারীদিগের নিয়মিত সমুদায় কার্য্য করাইলেন।

নিমাই স্নানাদি করিতে বসিলেন। এয়োগণ তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জনা, পদদ্বয় পরিষ্কার, কেশ বিন্যাস করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া পরিশেষে তৈল আমলকী ও হরিদ্রা মাখাইলেন। যে রমণীগণ নিমাইয়ের অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছেন, কিম্বা সেখানে দাঁড়াইয়া যাঁহারা দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর যুবা পুরুষের ঐরূপ অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে

কোটাল, সুতরাং রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। আর বুদ্ধিমন্ত খান প্রকৃতপক্ষে রাজা অর্থাৎ জমিদার ও ধনী বলিয়া। নিমাইয়ের বয়স যথন বিংশতির ন্যূন ব্যতীত উর্দ্ধ হইবে না, তিনি তখন প্রকাশ পায়েন নাই, অথচ বুদ্ধিমন্ত তাঁহার ভৃত্য—ইহাতে বুদ্ধিমন্তের কি শক্তি ছিল, পাঠক তাহা কতক বুঝিবেন।

গেলে, কোন কোন রমণীর মন বিচলিত হইবার কথা। কিন্তু যাঁহারা নিমাইয়ের সেবা করিতেছিলেন তাঁহাদের মনের মধ্যে কোন কুভাব উদয় হইল না। যে ভাবের উদয় হইল, তাহাতে কেবল বিমলানন্দ উঠিতে লাগিল। নিমাইয়ের এই শক্তির কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। নিমাইকে দর্শন করিয়া যাঁহারা মুগ্ধ হইতেন, তাঁহাদের সেই সঙ্গে সঙ্গে মন নির্ম্মল হইত।

তাহার পর, অন্যান্য নিয়মিত কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে, নিমাইয়ের বয়স্যগণ তাঁহার বেশভূষা করিতে বসিলেন। কপালে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনের ফোঁটা দিয়া, উহার মধ্যস্থলে মৃগমদবিন্দু দেওয়া হইল। সমস্ত মুখ অলকাবৃত ও নয়নে কজ্জল দেওয়া হইল। গলায় ফুলের মালার উপর মতির মালা দুলিতে লাগিল। বাহুতে রত্ন-বাজু ও কর্ণে কুণ্ডল পরান হইল। নিমাই কটী আঁটিয়া পীত ও পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন। গাত্রে পট্ট চাদর দেওয়া এবং মস্তকে মুকুট পরানো হইল। নিমাই তখন উঠিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া, অতি ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন; আর শচীদেবী, ধানদূর্ব্বা দিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নিমাই গোধূলি লগ্নে বয়স্যগণ সহ দোলায় আরোহণ করিলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁর পদাতিক ঘিরিয়া চলিল। নানাবিধ বাদ্যের সঙ্গে নিমাই প্রথমে সুরধুনী তীরাভিমুখে চলিলেন। তখন এখনকার মত ঢোল ছিল না। ঢোলের পরিবর্ত্তে মৃদঙ্গ মাদল জয়ঢাক বীরঢাক প্রভৃতি বাদ্য ছিল। নাচওয়ালারা নাচিয়া ও কাচুকেরা কাচ-কাচিয়া, সঙ্গী লোক সমূহের আমোদ-বিধান করিতে করিতে চলিল। তাহাদের ব্যঙ্গ দেখিয়া নিমাই হয় ত একবার হাসিলেন। এইরূপে নিজ ঘাটে কিছুকাল বিবিধপ্রকার বাদ্যে ও বাজীতে বাড়ীর নিকটস্থ লোক সকলকে আনন্দিত করিয়া, নিমাই সনাতন মিশ্রের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

সনাতনের বাড়ীতেও ঐরূপ উদ্যোগ। সনাতন বান্ধের সমভিব্যাহারে অগ্রবর্ত্তী হইয়া জামাতাকে লইতে আসিলেন। আপনি কোলে করিয়া জামাতাকে দোলা হইতে উঠাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি ও খইবৃষ্টি হইতে লাগিল, আর শত শত স্ত্রীলোক হুলুধ্বনি ও শঙ্খবাদ্য দ্বারা মঙ্গল ঘোষণা করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিতেছেন :—

"তবে সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়ায় আনিলেন সভায় ধরিয়া॥"

যখন বিষ্ণুপ্রিয়া সভায় আসিলেন, তখন সভাস্থ লোক কিরূপ দেখিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

"বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখবালা সোণা। ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা॥"

বিষ্ণুপ্রিয়াকে, শুভদৃষ্টির নিমিত্ত, নিমাইয়ের অগ্রে পিঁড়ির উপর বসাইয়া সকলে উচ্চ করিয়া ধরিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায় অভিভূতা হইয়া বদন অবনত করিয়া রহিলেন। তখন বর কন্যা উভয়ের মুখ একখানি বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করা হইল। সকলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নয়ন মেলিয়া বরের মুখ দেখিতে কহিলেন। কিন্তু লজ্জায় তিনি তাহা পারিলেন না। তখন সকলে বলিলেন যে, বরের মুখ দেখিতে হয়, না দেখিলে দোষ। কাজেই বিষ্ণুপ্রিয়া নয়ন মেলিলেন। তখন নিমাইয়ের দুই চক্ষে আর বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই চক্ষে মিলন হইল। এ মিলন চকিতের মত হইয়া গেল। কিন্তু এই নিমিষের মধ্যে চারি চক্ষে চারিটী কথা হইল, তাহা এই, "তুমি আমার, আমি তোমার।" তাহার পরে উভয়ে উভয়ের গলায় মাল্য দিলেন ও ফুল ফেলাফেলি করিতে লাগিলেন। পরে বরকন্যা একত্রে দাঁড়াইলেন! সেই সময়ের ছবিটী বলরাম দাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"ঘোমটা আড়ালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। আড় চোখে হেরে পতি-মুখ ছবি॥
ভাবিছেন মনে কি সুন্দর মুখ। কি তপেতে বিধি দিল এত সুখ॥

এই যে লোভের সামগ্রী দক্ষিণে। কারু অধিকার নাহি এই ধনে॥
দক্ষিণে দাঁড়ায়ে এটী মোর বর। এ ধন আমার কেবল আমার॥
মুখ হেট করি হেরিছে চরণ। আপনারে চির করিছে অর্পণ॥
বিধি সাক্ষী করি কহিছেন মনে। আমি ত বালিকা কহিতে জানিনে।
মোর যত সুখ ধর তুমি করে। তোমার যে দুঃখ দাও মোর শিরে॥
দুঃখে কিবা সুখে যেন রাখ মোরে। ওই চন্দ্রমুখ যেন মোরে স্ফুরে॥
শত অপরাধ করিব চরণে। ক্ষমিবা সকল তুমি নিজ গুণে॥"

বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বামে দাঁড়াইয়া নানা ছলে অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে বরের মুখ দেখিতেছেন। কখনও বা চারি চক্ষে মিলন হইতেছে, আর বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায় একেবারে জড়ীভূত হইতেছেন। এই বরটাকে বিবাহের পূর্ব্বে চিত্ত সমর্পণ করিয়া বালা বিষ্ণুপ্রিয়া নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। আবার গণকের সেদিনকার কথা মনে করিয়া ভাবিলেন যে তাঁহাকে পাইতে পাইতে হারাইতেছিলেন। অদ্য তাঁহার সেই সাধনের ধন তাঁহার দক্ষিণে পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার কিছু মাত্র বাহ্যজ্ঞান নাই। কখন ভাবিতেছেন—'এ স্বপ্ন', কখন ভাবিতেছেন—'এ কাহার বিবাহ?' 'এ কাহার বিবাহ, কাহার সহিত হইতেছে?' কখন নয়ন-জলে তারা ডুবিয়া যাইতেছে, কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। কখন বা বরের অঙ্গ-স্পর্শ সুখ অনুভব করিতেছেন। ভাবিতেছেন, 'কি মিষ্ট! কি সুখের সামগ্রী," আবার তদ্দণ্ডে ভাবিতেছেন—'এত সুখ কি থাকিবে?' আর ভয়ে মুখ শুকাইয়া যাইতেছে॥

তারপর বরকন্তা বাসরঘরে চলিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছে, চলিতে পারিতেছেন না। নিমাই এক প্রকার তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। এমন সময় ঝনাৎ করিয়া একটী শব্দ

হইল,—বিষ্ণুপ্রিয়ার দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে উছট লাগিল। তিনি দারুণ ব্যথা পাইলেন ও রক্ত পড়িতে লাগিল।*

কিন্তু তখনি একটি কথা মনে হওয়ায় ব্যথিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার আর ব্যথার কথা মনে থাকিল না। তিনি ভাবিলেন,—'বাসরঘরে যাইতে এ কি অমঙ্গল!' অমনি সকল সুখ ফুরাইয়া গেল, আর তখন তাঁহার নূতন আশ্রয়, সেই বরের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন।

নিমাই, বিষ্ণুপ্রিয়ার পায়ে উছট লাগিবামাত্র জানিতে পারিলেন, আর তাঁহার নব-প্রিয়ার দুঃখ ও ভয় দেখিয়া আপনার পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিলেন। এই প্রথমে বরকন্যার আলাপ হইল। যদিও এ আলাপ অঙ্গুষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠে, তবুও উভয়ের মনের ভাব উভয়ে বুঝিতে পারিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের ভাব এই যে, 'হে বর! হে নব-পরিচিত! হে আশ্রয়! আমি বিপদাপন্ন, আমাকে আশ্রয় দাও। আর নিমাইয়ের মনের ভাব, 'হে দুর্ব্বলে! 'হে প্রিয়ে! এই ত আমি আছি।' নিমাইয়ের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শে বিষ্ণুপ্রিয়ার সমুদায় বেদনা গেল, শোণিত-ক্ষরণ বন্ধ হইল।

পরদিবস নিমাই যুগল হইয়া গুরুজনকে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সনাতন তাঁহার পুত্র যাদবকে নিমাইয়ের হস্তে সঁপিয়া দিয়া; শেষে কন্যাটীর হস্ত লইয়া নিমাইয়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "আমার কন্যা তোমার দাসীর যোগ্যা নয়, তবে তুমি নিজগুণে ইহাকে কৃপা করিবে।" নিমাই মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। সনাতনের নয়নে জল পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ধৈর্য্য হারাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের আঁখিও ছল-ছল করিতে লাগিল। সনাতন

---

* শ্রীখণ্ডের গোস্বামীগণ বলেন, লোচন তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন, আর সেই সময়ে ঐ গ্রন্থে উপরি উক্ত ঘটনা লিখেন নাই বলিয়া ক্ষোভ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

আপনার পুত্রটিকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমার এই পুত্রটিকে পালন করিবে।" নিমাই সম্মত হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে সনাতন সান্ত্বনা করিলেন। তখন বহুতর দান-সামগ্রী লইয়া নিমাই নববধূসহ বাড়ীতে আসিলেন। শচী অগ্রবর্ত্তী হইয়া বধূমাতাকে কোলে করিয়া মুখে শত চুম্বন দিলেন, ও জ্ঞানহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে :—

"বধূ কোলে করি তবে শচীর নাচন।"

সপ্তম অধ্যায়

"যে প্রভু আছিলা অতি পরম গভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

এইরূপে আন্দাজ দুই বৎসর গত হইল। এই দুই বৎসরে নিমাই কিঞ্চিৎ স্থির হইলেন। এই দুই বৎসর শচীর আনন্দের সীমা ছিল না। এক দিবস নিমাই শচীর নিকট গয়াক্ষেত্রে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। পিতৃঋণ শোধ করিতে যাইবেন, শচী নিমাইকে নিষেধ করিতে পারিলেন না। তবে সঙ্গে নিমাইয়ের মেসো চন্দ্রশেখর চলিলেন এবং নিমাইয়ের অনেক শিষ্যও চলিলেন। আশ্বিন মাসে বাড়ীর বাহির হইলেন; গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া মন্দারে আসিয়া নিমাইয়ের জ্বর হইল। এই নিমাইয়ের প্রথম পীড়া, শেষ পীড়াও বটে। ইহাতে সকলে চিন্তিত হইলেন। চিন্তিত হইবার কারণও ছিল, জ্বর কিছু কঠিন বলিয়া বোধ হইল। তখন নিমাই তাঁহার নিজের চিকিৎসা নিজে করিলেন। তিনি বলিলেন যে, সেখানকার ব্রাহ্মণের পাদোদক আনা হউক। তাহাই করা হইল, আর উহা পান করিবামাত্র তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল।

নিমাইয়ের এই পীড়া লইয়া মহাজনগণ কিছু বিচার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, সে দেশের ব্রাহ্মণের আচার দেখিয়া নিমাইয়ের কোন সঙ্গী মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলেন। নিমাই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য এই রঙ্গ করিলেন। কেহ কেহ এ রোগের কারণ অন্যরূপ বলেন। জ্বরের উদ্দেশ্য শরীর-যন্ত্রকে পরিষ্কৃত করা। নিমাইয়ের দেহযন্ত্রে কোন ময়লা ছিল না। কিন্তু তিনি পৃথিবীতে আসিয়া এ জগতের নিয়মাধীন হইয়াছেন। এই পৃথিবীর ময়লাতে সেই বস্ত্রটিতে কিছু ময়লা হইয়াছিল, আর জ্বর হইয়া উহা পূর্ব্বের ন্যায় বিশুদ্ধ হইল। এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই জ্বরের অল্পকাল পরেই তিনি আর একরূপ হইলেন, নিমাই পণ্ডিত আর পূর্ব্বের মত রহিলেন না।

গয়ায় গমন করিয়া নিমাই দুইকর জুড়িয়া গয়াধামকে প্রণাম করিলেন। তখন নিমাইয়ের চাঞ্চল্য নাই, দ্রুতগমন নাই, হাস্য-কৌতুক নাই। ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন, অতি গম্ভীরভাবে সমুদায় কার্য্য করিতেছেন। ভক্তি-উদ্দীপক যাহা দেখিতেছেন, তাহাই প্রণাম করিতেছেন। ক্রমে গয়ার সমুদায় কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পিতৃকার্য্য করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে আবার স্নান করিলেন, তাহার পর চক্রবেড় আসিয়া শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে চলিলেন। এখানে গয়াসুরের মস্তকে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম দিয়াছিলেন, আর সেই পদের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। সেই গদাধরের পদচিহ্নকে ব্রাহ্মণগণ স্তব করিতেছেন; আর যাত্রিগণকে শুনাইয়া বলিতেছেন, "দেখ, শ্রীভগবানের পদচিহ্ন দেখ! যে শ্রীভগবানের পদনখ-জ্যোতিঃ সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যায় দর্শন পাওয়া যায় না, তাঁহার কৃপা দর্শন কর। দেখ, তিনি কত করুণাময়! ঐ পদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, ঐ শ্রীপদের নিমিত্ত মহাদেব উন্মত্ত!"

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়াই নিমাই

স্তম্ভিত হইলেন। নিমাই একদৃষ্টে সেই পদপানে স্পন্দহীন হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ঠোঁট দুটি কাঁপিতে লাগিল। যেন নিমাইয়ের নয়নে জল আসিতেছে, আর তিনি নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। শেষে নিমাইয়ের বড় বড় দুটি নয়নতারা জলে ডুবিয়া গেল। নয়ন-জল নয়নে স্থান পাইল না,—না পাইয়া বহিয়া বদনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে নূতন জলধারার সৃষ্টি হইল। উহা আবার নয়নে স্থান না পাইয়া বদনে আসিল। সুতরাং পূর্ব্বকার নয়ন-জলধারা আর বদনে থাকিতে পারিল না, বহিয়া বুকে আসিতে লাগিল। তখন প্রশস্ত বুকেও উহার স্থান হইল না, ত্রিধারা হইয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল। ক্রমে আঁখিবারির বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অগ্রে অপাঙ্গ হইতে একটি ধারা পড়িতেছিল, ক্রমে নাসিকার কোণ হইতে আর একটি ধারার সৃষ্টি হইল। সে ধারা স্বতন্ত্র পথ ধরিয়া মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আসিল। আর সেই পথ দিয়া জল বহিতে লাগিল। নয়ন-জলের বেগ আরও বাড়িয়া উঠিল, তখন নয়নের মধ্যস্থান দিয়া আর একটি ধারার সৃষ্টি হইল। পরে সমুদায় ধারাগুলি মিশিয়া গেল; তখন সমস্ত নয়ন বহিয়া বদন যুড়িয়া একটিমাত্র ধারা পড়িতে লাগিল; ইহাতে নিমাইয়ের উপবীত ভিজিয়া গেল, উত্তরীয় ভিজিয়া গেল, বসন ভিজিয়া তাঁহার নয়ন-জলে সে স্থান জলমগ্ন হইল।

নিমাইয়ের বদনে বাক্য নাই, কণ্ঠে শব্দ নাই, বিম্বোষ্ঠ দুইখানি মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে। বদন-চন্দ্রমা এত প্রফুল্লিত হইয়াছে যে, দর্শকগণ নিমিষহারা হইয়া উহার সুধা পান করিতেছেন। সমস্ত অঙ্গ অল্প অল্প কাঁপিতেছে, পড়িতে পড়িতে পড়িতেছেন না; কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ করে এমন সাহসও কাহার হইতেছে না। দর্শকগণের মধ্যে ঈশ্বরপুরীও ছিলেন। তিনিও শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সেই সময় গয়ায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি

নিমাইকে দেখিয়াছেন, কিন্তু নিমাই তাঁহাকে দেখেন নাই। তিনি নিমাইয়ের ভাব একদৃষ্টে দর্শন করিতেছেন। তিনিও ঐ রসের রসিক সুতরাং নিমাইয়ের শ্রীবদনে যে তরঙ্গ খেলিতেছে, তিনি উহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন। এরূপ দৃশ্য পূর্ব্বে কখনও তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। শুধু তাহা নয়,—মনুষ্যে যে এরূপ গাঢ় ভাব উদয় হইতে পারে, তাহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। মেঘ দেখিলে মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হইত, হইয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইতেন।

নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া ঈশ্বরপুরী বুঝিলেন. উহা অমানুষিক। তিনি অধিকক্ষণ এই দর্শনসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না; কারণ তিনি দেখিলেন নিমাই মূর্চ্ছিত হইতেছেন। নিমাইয়ের অবস্থা দেখিয়া ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে ধরিলেন। তখন নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান হইল; ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেন, আর পুরী গোসাঞী অমনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন। উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া প্রেমবারিতে উভয়ে উভয়কে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

নিমাই চৈতন্য পাইয়া বলিতেছেন, "আজি আমার গয়াযাত্রা সফল হইল, আজি আমার জনম সফল হইল, আজি আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস হইলাম,—যেহেতু তোমার অমূল্য চরণ দর্শন করিলাম। গোসাই, আমি ভবসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি; তুমি দয়াময়, আমাকে উদ্ধার কর। আমার এই দেহ আমি একেবারে তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। তুমি আমার উপর এরূপ শুভ-দৃষ্টিপাত কর, যেন আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসুধা পান করিতে পারি।"

ঈশ্বরপুরী বলিলেন, "পণ্ডিত! যে অবধি আমি তোমাকে নবদ্বীপে দর্শন করিয়াছি, সেই অবধি তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছ। আমি তোমাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া, অবিচ্ছিন্ন সুখভোগ করিতেছি। এখন আমি স্ববশে নহি, তোমারই অধীন। তুমি যেরূপ আজ্ঞা করিবে, আমি তাহাই করিব।"

নিমাই বিদায় লইয়া বাসায় আসিলেন, আসিয়া রন্ধন করিতে বসিলেন। রন্ধন প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় সেখানে ঈশ্বরপুরী আসিয়া উপস্থিত। ঈশ্বরপুরী আর নিমাইকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছেন না। ঈশ্বরপুরী সকল বন্ধন ছেদন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া, শেষে নিমাইয়ের বন্ধনে পড়িয়াছেন। তাই আবার নিমাইয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত। নিমাই ইহাতে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঈশ্বরপুরী রহস্য করিয়া বলিলেন, "তোমার রন্ধন সমাপ্ত হইল, আমিও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার নিকটে আসিলাম, আমার বড় ভাগ্য।"

নিমাই বলিলেন, "রন্ধন সমাপ্ত হইয়াছে, তুমি কৃপা করিয়া ভোজন কর।" ঈশ্বরপুরী বলিলেন, "আমি ভোজন করিব, তুমি কি খাইবে? বরং যে অন্ন রন্ধন করিয়াছ, আইস আমরা দুই জনে ভাগ করিয়া তাহাই আহার করি।" নিমাই সে কথা শুনিলেন না। অতি যত্ন করিয়া সমস্ত অন্নই ঈশ্বরপুরীকে ভুঞ্জাইলেন। ঈশ্বরপুরীকে ভোজন করাইয়া তাঁহার অঙ্গে চন্দন লিপ্ত করিয়া, গলে ফুলের মালা দিলেন। পরে আপনি রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেন।

তৎপরে শুভদিনে শুভক্ষণে ঈশ্বরীপুরী নিমাইয়ের কর্ণে মন্ত্র দিলেন। মন্ত্রটি দশাক্ষরী, "গোপীজন বল্লভের"। মন্ত্র দিয়া নিমাই পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করিলেন, আর উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। এখন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের কথাটী স্মরণ করুন, যথা, "মাধবেন্দ্র যে অঙ্কুর রোপন করিয়াছিলেন, তাহার বৃক্ষ গোরাঙ্গ ঠাকুর হইলেন।"

ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের এই শেষ দেখা। তিনি কেন, কোথায় গমন করিলেন, আর নিমাই বা কেন তাঁহাকে যাইতে দিলেন, এই সমস্ত কাহিনী আমরা জানি না। তবে নবদ্বীপে নিমাইকে দেখিয়া

ঈশ্বরপুরীর মনে হইয়াছিল যে,—এ বস্তুটী কি? গয়াতে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মনের সন্দেহ গেল। তিনি স্থির করিলেন যে, নিমাই বস্তুটী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। সেই নিমাই তাঁহার নিকট মন্ত্র লইলেন, ইহাতে তিনি পূর্ণকাম হইলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার অন্য একটী দুঃখের সৃষ্টি হইল। সেটী এই যে—শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে গুরুরূপে প্রণাম করিতে লাগিলেন। নিমাই গুরুকে প্রণাম করেন, তাহা না করিলে আচারবিরুদ্ধ কার্য্য হয়। নিমাই কখনও আচারবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেন না। আবার পুরীও বা কিরূপে,—যাহাকে তিনি শ্রীভগবান বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিবেন? ইহা কেহই পারে না, পুরীও পারিলেন না,—কাজেই নিমাইয়ের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তখন তিনি নিমাইয়ের মধুর রূপ হৃদয়ে পুরিয়া ও জন্মের মত অঙ্কিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনাবধি নিমাইয়ের প্রকৃতি ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে,—দিন দিন ভক্তি বাড়িতেছে। নিমাই বাক্যালাপ ছাড়িলেন,—দেহ-চেষ্টা ছাড়িলেন। তখন ঊর্দ্ধ-মুখ হইয়া নিমেষ হারাইয়া কখনও চাহিয়া থাকেন, কখন-বা আপনা আপনি কথা বলেন, আবার কখন-বা বিরলে বসিয়া কি ভাবিয়া রোদন করেন। নিমাইয়ের সঙ্গিগণ তাঁহার ভাব কিছুই বুঝিতে পারেন না। কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না, জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পান না। তাঁহারা দেখেন যে নিমাইয়ের হৃদয়ে কি প্রবল তরঙ্গ খেলিতেছে, আর উহা বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সেটী কি?*

* এখানে চণ্ডীদাসের একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম, যথা :—

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহারও কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা॥

একদিন নিমাই গয়াধামে নিভৃতে বসিয়া, তাঁহার গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতেছেন, এমন সময় "কৃষ্ণ আমার বাপ কোথায়" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সঙ্গিগণ আস্তে ব্যস্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি চেতন পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু আবার তাঁহার অঙ্গ এলাইয়া ভূমিতে পড়িল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণ বাপ! আমার প্রাণ! আমি তোমা বিনা আর জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না। আমি অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়াছিলাম; কিন্তু আর পারি না, তুমি আর লুকাইয়া থাকিও না। তুমি দয়াময়, দর্শন দিয়া আমার প্রাণ রাখ। আমি তোমাবিহনে ভুবন অন্ধকার দেখিতেছি।" এইরূপে কাতরধ্বনি করিতে করিতে নিমাই ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কে প্রবোধ মানে? নিমাই তখন আর নিমাই নাই। যাঁহারা প্রবোধ দিবেন, তাঁহারা প্রবোধ দিতে আসিয়া আপনারাই ধৈর্য্যহারা হইলেন। নিমাইয়ের সেই করুণ রোদন, সেই আর্ত্তি, বদনের সেই কাতর ভাব, আর নয়নের সেই অবিশ্রান্ত ধারা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন।

নিমাই বলিলেন, "তোমরা বাড়ী যাও। আমি আর বাড়ী যাইব না, আমি কৃষ্ণের উদ্দেশে বৃন্দাবন চলিলাম। আমার জননীকে তোমরা সান্ত্বনা করিও,—বলিও যে, নিমাই কৃষ্ণের উদ্দেশে বৃন্দাবনে গিয়াছে।" ইহাই বলিয়া নিমাই ক্ষিপ্তের ন্যায় বৃন্দাবন অভিমুখে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন।

তখন চন্দ্রশেখর ও নিমাইয়ের শিষ্যগণ বড় বিপদে পড়িলেন। শেষে নিমাইকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে লইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলেন, এবং পৌষ মাসের শেষে সকলে নবদ্বীপে আসিয়া পৌছিলেন।

নিমাই আসিতেছেন শুনিয়া, নদীয়াবাসী অনেকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে আনিতে চলিলেন। শচী এই শুভ-সংবাদ শুনিয়া আহ্লাদে জ্ঞানহারা হইয়া বাহিরে আসিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও ধৈর্য্যহারা হইয়া পতিমুখ দর্শন আশায় সলজ্জভাবে দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইলেন। এমন সময় নিমাই আসিয়া পৌছিলেন, এবং জননীকে বহির্দ্বারের সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার চরণদুটি ধরিয়া প্রণাম করিলেন। শচী আর আনন্দে কথা কহিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের আগমন সংবাদ দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপময় প্রচারিত হইল, সনাতন মিশ্র ও তাঁহার পত্নী শুনিয়া মহাহর্ষে মগ্ন হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

"গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল।
সেই হতে নিমাই আমার পাগল হইল॥"

নিমাই গৃহে আসিলে, তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্ব শিষ্য-সেবক সকলে দেখিলেন যে, তাঁহার আর পূর্ব্বভাবের কোন চিহ্ন নাই, একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; এমন কি, যেন তাঁহাকে চেনা যাইতেছে না। সে উদ্ধত স্বভাব নাই, সে বিদ্রূপাত্মক মুখভাবও নাই; নিমাই তখন বিনয়ের অবতার হইয়াছেন; যেন সকলের অধীন, কি সকলের নিকট অপরাধী; অল্প অল্প হাসিতেছেন, কিন্তু মুখখানি মলিন, যেন সর্ব্বদা অন্যমনস্ক; এক কহিতে আর বলেন, কথা কহিতে যেন নিতান্ত অনিচ্ছা, তবে বাধ্য হইয়া কথা কহেন। অনবরত যেন নয়নে জল আসিতেছে; আর কষ্টে তাহা নিবারণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে নয়ন-জলে তারা

ডুবিয়া যাইতেছে, আর সেই বেগ গোপন করিবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি নয়ন মুছিতেছেন। এদিকে কিন্তু শরীর হইতে তেজ বাহির হইতেছে, আর সেই বিপুল শরীর যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সুবলিত হইয়াছে।

নিমাইয়ের বিনয় ও ভাব দেখিয়া সকলে মুগ্ধ ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যাঁহারা গুরুজন তাঁহারা মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা সখা তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন! কি গুরুজন, কি সখাগণ, সকলেই যেন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবার শক্তি হারাইলেন। তখন নিমাই সকলকে মধুর বাক্যে বিদায় করিলেন।

বিকালে বহির্বাটীতে নিমাই তাঁহার তিনটী বন্ধু লইয়া তীর্থকথা কহিতে বসিলেন। সে তিন জনের নাম,—শ্রীমান পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ ও মুরারি গুপ্ত। এই মুরারি গুপ্তেরই থালে শিশুবেলা নিমাইয়ের কীর্ত্তি, আর ইনিই নিমাইয়ের আদিলীলা বর্ণন করিয়াছেন।

তীর্থের কথা বলিতে বলিতে নিমাই গয়াসুরের আখ্যান তুলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে গয়াসুরের শিরে পাদপদ্ম দিয়াছিলেন, আর সেই চিহ্ন যে গয়াতে অদ্যাপি আছে, তাহাই বলিয়া পরে নিমাই বলিতেছেন, "ভাই, আমি শ্রীপাদপদ্ম দেখিতে গেলাম। দেখি ব্রাহ্মণগণ পাদপদ্মের মাহাত্ম্য বর্ণণা করিতেছেন। আমি সেই কৃষ্ণের পাদপদ্ম—" ইহাই বলিতে বলিতে নিমাই নীরব হইলেন। মুরারি প্রভৃতি ইহাতে নিমাইয়ের মুখ পানে ভাল করিয়া চাহিলেন; দেখেন যে, তাঁহার চক্ষু নিমেষশূন্য এবং তারা স্থির হইয়াছে। একটী মহাজনের পদের দ্বারা, নিমাইয়ের কি ভাব হইল তাহা ব্যক্ত করিতেছি। শ্রীমতী রাধা ললিতার নিকট কৃষ্ণকথা বলিতেছেন। বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন ললিতা ব্যস্ত হইয়া বিশাখাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "বিশাখা, শীঘ্র আয়; দেখে যা আমাদের রাধা কেমন হ'য়ে প'লো।" বিশাখা

আসিয়া শ্রীমতীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "একি হ'লো? তখন ললিতা বলিতেছেন :—

"এই যে ধনী কৃষ্ণ-কথা কহিতেছিল।
কথা কইতে কইতে নীরব হ'লো॥"

সেইরূপ কৃষ্ণকথা কহিতে গিয়া নিমাইয়ের হৃদয়ে যে তরঙ্গ উঠিল, তাহা বাহির হইতে পথ না পাওয়ায় তিনি মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এবং দেখিতে দেখিতে মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন সকলে ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিলেন ও তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। একটু পরে চৈতন্য পাইয়া নিমাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই নয়ন-জলে, সেখানে যে পুষ্পের বাগান ছিল, তাহা ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

মুরারি প্রভৃতি, নিমাইয়ের তখন যেরূপ ভাব দেখিলেন, এরূপ ভাব পূর্ব্বে কাহারও কখন দেখেন নাই। মনুষ্যের যে এত নয়ন-জল পড়ে, ইহা তাঁহারা চক্ষে ত দেখেনই নাই, কর্ণেও শুনেন নাই। তাঁহারা তখন নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন। কেহ ভাবিতেছেন,—'ইহার কি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ঘটিয়াছে?' কেহ চুপে চুপে আর একজনের নিকটে বলিতেছেন,—"কি আশ্চর্য্য! তিনমাস পূর্ব্বে কে বলিতে পারিত যে নিমাই পণ্ডিত এরূপ অদ্ভুত ভক্ত হইবেন।" অনেক ক্লেশে নিমাইকে তাঁহারা একটু শান্ত করিলেন। তখন নিমাই গদগদ ভাবে বলিতেছেন, "ভাই, তোমরা আমার চিরসুহৃদ, আমার মনের ব্যথা আর কাহাকে বলিব? কল্য সকালে তোমরা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী যাইও, আমিও সেখানে যাইব, যাইয়া আমার সমুদায় কথা তোমাদিগকে বলিব।" তাহার পরে মুরারি প্রভৃতি উঠিয়া গেলেন, নিমাইও অভ্যন্তরে গমন করিলেন।

শচী, নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া, কিছু চিন্তিত হইলেন; তাহার

বিশেষ কারণ এই যে, নিমাইয়ের এ অবস্থার হেতু কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

রজনীতে নিমাই শয়ন করিতে গেলেন, প্রিয়ার সহিত দু'একটী কথা বলিলেন, বলিতে বলিতে কণ্ঠরোধ হইল। এতক্ষণ বহিরঙ্গ সম্ভাষে ধৈর্য্য বাঁধিয়াছিলেন, প্রিয়ার কাছে আসিয়া ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন মস্তক অবনত করিয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন।

অন্যের রোদন দর্শনে মন কোমল হয়। বলবান পুরুষের রোদন দর্শনে দুর্ব্বলা স্ত্রীলোকের মনে বড়ই আঘাত লাগে। আবার সেই পুরুষ যদি স্বামী হন, তবে স্ত্রার কি ভাব হয়, তাহা অনুভব করুন; কারণ উহা বর্ণনা করা অসাধ্য। বিশেষতঃ, তাঁহার স্বামী কেন কান্দিতেছেন? তাঁহার কি দুঃখ? তিনি কিসে শান্ত হইবেন? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ইহার তথ্য কিছুই জানেন না।

বিষ্ণুপ্রিয়া সেই ভাবহিল্লোল দেখিয়া কাজেই বড় বিকল হইলেন। তখন তাঁহার কাঁদিবার সময় নয়, তখন তাঁহার কর্ত্তব্য সান্ত্বনা করা। কিন্তু বয়সে বালিকা, সান্ত্বনা করিতে জানেন না; সাহসও হইল না। তিনি ভীত ও ব্যস্ত হইয়া, শাশুড়ীর কাছে দৌড়াইলেন। শাশুড়ীর ঘরে যাইয়া দুয়ারে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "মা উঠ, শীঘ্র উঠ।"

শচী ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দ্বার খুলিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "মা! একবার এই ঘরে এসো।" শচী ব্যস্ত হইয়া, পুত্রের ঘরে দ্রুতগমনে গিয়া দেখেন, নিমাই নয়ন মুদিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, নিরবে রোদন করিতেছেন, আর তাঁহার বদন বাহিয়া শত শত ধারা পড়িতেছে। শচী তখন ব্যস্ত হইয়া পুত্রের মাথায় হাত দিয়া বলিতেছেন, "বাপ নিমাই, তুমি কান্দ কেন?" কিন্তু শচী যদিও অতি ব্যস্ত হইয়া নিমাইকে সম্বোধন করিলেন, কিন্তু সে স্বর নিমাইয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল না। শচী তখন

আরও ব্যগ্র হইয়া, "নিমাই কান্দ কেন" বলিয়া বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে নিমাইয়ের কর্ণে মাতার আকুল ধ্বনি গেল। তখন মাতার দুঃখ নিবারণ নিমিত্ত তিনি বেগ সম্বরণ করিতে গেলেন, কিন্তু তাহাতে সে বেগ আরও বৃদ্ধি পাইল।

তখন শচী বলিতেছেন, "বাপ আমার! তুমি বড় জ্ঞানবান, তোমার মত পণ্ডিত নদীয়ায় নাই। বাপ! তুমি অত উতলা কেন হইলে? অন্যে উতলা হইলে তুমি শান্ত কর, তোমাকে কে শান্ত করিবে? বাপ! তুমি এত গম্ভীর, তুমি এত ব্যাকুল হইলে কেন?" যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে :—

"বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে।
কি লাগিয়া কান্দ বাপ, তোর দুঃখ কিসে?"

পুনঃ যথা শ্রীচৈতন্যচরিত কাব্যে :—

কিমু তাত! রোদিতি ভবানবদৎ।"

নিমাই অতি কষ্টে মনের বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া বলিতেছেন, "মা! আমি রোদন করিতেছি ভাবিয়া তুমি দুঃখ পাইও না। আমি এই মাত্র স্বপ্নে অতি রূপবান শ্যামবর্ণ বনমালাধারী একজন নবীন পুরুষকে দেখিয়া এত আনন্দ পাইলাম যে, আমার আঁখি দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মা! এমন মধুর রূপ আমি আর কখনও দেখি নাই, রূপখানি আমার হৃদয়ে জাগিতেছে।" নিমাই ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, আর দেবীদ্বয় শুনিতে লাগিলেন। এইরূপ কৃষ্ণকথায় প্রথম রজনী গত হল। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া গদগদ হইয়া সেই অপূর্ব্ব কথা শুনিলেন এবং আনন্দে সারা নিশি কাটাইলেন।

অতি প্রত্যুষে শ্রীমান পণ্ডিত শ্রীবাসের বাড়ী কুসুম চয়ন করিতে গিয়াছেন। শ্রীবাসের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইনি জগন্নাথ

মিশ্রের বন্ধু, তাহার সমবয়স্ক ও পরম বৈষ্ণব। ইঁহার বাড়ীতে কুন্দ পুষ্পের একটী ঝাড় ছিল। ইহাতে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফুটিত, পাড়ার সকলে সেই ফুল তুলিতে যাইতেন। শ্রীমান পণ্ডিত ফুল তুলিতে গিয়া কাজেই সেখানে অনেককে দেখিতে পাইতেন।

সকলে ফুল তুলিতেছেন। শ্রীমান পণ্ডিতও ফুল তুলিতেছেন, আর মন্দ মন্দ হাসিতেছেন। নিমাই পণ্ডিতের পূর্ব্ব দিনের কথা মনে করিয়া তিনি সারা নিশি আনন্দে যাপন করিয়াছেন। তখনও আনন্দ রহিয়াছে, তাহা লুকাইতে পারিতেছেন না। আবার যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সকলকে বলিতেও নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় যে হাসি দেখিতেছি?" শ্রীমান বলিতেছেন, "অবশ্য কারণ আছে।" শ্রীবাস বলিতেছেন, "কারণ কি শুনি?" তখন শ্রীমান বলিলেন, "তোমরা শুনেছ, নিমাই পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন? গয়া হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া কল্য বিকালে আমরা কয়েকজন দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখি যে, এমন নম্র পুরুষ বুঝি জগতে আর নাই। সে নম্র ভাব দেখিলেই চিত্ত আকর্ষণ করে। আমাদের নিকট তীর্থের কথা বলিতে বলিতে গদাধর-পাদপদ্মের কথা বলিতে গেলেন, কিন্তু পাদপদ্মের নাম করিবামাত্র আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পরে যে কাণ্ড দেখিলাম সেরূপ চক্ষে ত দেখি নাই, কর্ণেও শুনি নাই,—তাহার বর্ণনা করাও আমার সাধ্য নহে। ফল কথা, নিমাই পণ্ডিতের যেরূপ চরিত্র দেখিলাম, তাহাতে আমার আর তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ নাই।"

এই কথা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, ইহা বড় শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই। একজন উগ্র স্বভাবের বৈষ্ণব বলিয়া উঠিলেন, "নিমাই পণ্ডিত যদি বৈষ্ণব হয়, তবে আমাদের বিদ্বেষী মহাশয়দিগকে

এইবার দেখিব।” শ্রীবাস বলিলেন, “আজ বড় শুভ সংবাদ শুনিলাম। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ এত দিনে আমার মনস্কামনা সিদ্ধি করিলেন। শ্রীভগবান্ আমাদের বৈষ্ণব পরিবার বৃদ্ধি করুন!”

শ্রীমান পণ্ডিত বলিলেন, “নিমাই পণ্ডিত চেতনা পাইয়া আমাদিগকে অগ্য প্রাতে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী যাইতে বলিয়াছেন, সেখানে তাঁহার মনের দুঃখ ও আর কি কি বলিবেন। আমি ফুল তুলিয়া সেখানে যাইব।”

শ্রীমান পণ্ডিত পুষ্প তুলিয়া তাড়াতাড়ি গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী গেলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে গদাধর পণ্ডিতও ফুল তুলিতেছিলেন। তিনিও এই কথা শুনিয়া শুক্লাম্বরের বাড়ী গেলেন, কিন্তু তাঁহার সেখানে থাকিতে অনুমতি ছিল না বলিয়া, গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। ক্রমে সদাশিব ও মুরারি আসিলেন, এবং সকলে বসিয়া নিমাই পণ্ডিতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে তাঁহারা দেখেন, নিমাই পণ্ডিত আসিতেছেন। অতি দীর্ঘকায় সবল পুরুষটী চলিতেছেন, কিন্তু প্রতি পদে পদস্খলন হইতেছে। মুখ পানে চাহিয়া দেখেন যে, নয়ন দিয়া অজস্র ধারা পড়িতেছে, ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না, আর বাহ্যজ্ঞান অতি অল্প মাত্র আছে, তাহাতেই পদস্খলন হইতেছে। নিমাই পিঁড়ায় উঠিয়া, বন্ধুগণকে দেখিয়া আপনার যেটুকু জ্ঞান ছিল তাহাও রাখিতে পারিলেন না। “হা কৃষ্ণ” বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িবার সময়, পিঁড়ার একটি খুঁটি ধরিয়াছিলেন, উহার সহিত মুক্তকেশে পড়িয়া গেলেন।

নিমাই মৃত্তিকায় পড়িলে, আস্তে ব্যস্তে মুরারি প্রভৃতি সকলে বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। দেখেন, জীবনের চিহ্নমাত্র নাই, চক্ষু স্থির হইয়াছে, মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ। তখন তাঁহার মুখে জল সিঞ্চন করিতে করিতে, নিমাইয়ের অর্দ্ধ-চেতন হইল। একটু

চেতন পাইয়া নিমাই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া অতি করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে "আমার কৃষ্ণ নাই" এই বলিয়া মনের ক্লেশে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এইরূপ গড়াগড়ি দিতে দিতে নিমাইয়ের সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইল। তাঁহার সঙ্গিগণ অনেক যত্নে তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন, কিন্তু তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। এইরূপ মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে একটু চৈতন্য হইতেছে, আর বলিতেছেন "এই যে কৃষ্ণ এখানে ছিলেন, তিনি কোথা গেলেন?" কখন বা ক্ষণিক চেতনা পাইয়া, অতি কাতরে বলিতেছেন, "আমার কৃষ্ণ নাই!" সে সময় তাঁহার মুখ দেখিলে, কি স্বর শুনিলে, পাষাণও বিদীর্ণ হয়। এই অবস্থার বর্ণনা করিয়া আমার মেজদাদা শ্রীল হেমন্তকুমার ঘোষ একটী গীত রচনা করেন, সেটী এই :—

"হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ধূলায় পড়িল গোরা।
ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ দু'নয়নে বহে ধারা॥
ক্ষণেক চেতন পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই,
এই ছিল কোথা গিয়া লুকাইল মনচোরা।
হা হরি হরি হরি, হরি তুমি কোথা হে,
তুমি সরবস্ব ধন তুমি নয়নের তারা॥"

অপরাহ্ণ উপস্থিত হইল, কিন্তু সে জ্ঞান কাহারও নাই। নিমাই পণ্ডিত যে তরঙ্গে ডুবিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে তাহাতে নিমগ্ন হইয়াছেন; এবং ভক্তিতে গদগদ হইয়া সকলেই রোদন করিতেছেন। আর নিমাই করিতেছেন কি, না মুরারির গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "মুরারি! শ্রীকৃষ্ণ ভজ। শ্রীকৃষ্ণ কি ভজিবে না? মুরারি! কৃষ্ণ আমার বড় মধুর। সদাশিব, তুমি ও আমি দুইজনে মুকুন্দ ভজন করিব। কেমন?" নিমাই এইরূপে প্রলাপ বকিতেছেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণকুহরে রোদনধ্বনি গেল।

কান-পাতিয়া শুনিলেন যে, ঘরের মধ্যে কে রোদন করিতেছে। তখন একটু বাহ্য পাইয়া বলিতেছেন, "ঘরের মধ্যে কে উনি?"

মুরারি বলিলেন, "তোমার গদাধর।" "তোমার গদাধর" ইহার অর্থ এই যে, গদাধর নিমাইয়ের ছায়ার স্বরূপ সর্ব্বদা বেড়াইতেন। নিমাই বড়, গদাধর ছোট। গদাধর পরম রূপবান, শিশুকাল হইতেই ভক্তিপথের পথিক, গদাধরের চরিত্র মধু হইতেও মধুতর। পাঠক, ক্রমে তাঁহার পরিচয় পাইবেন।

তখন নিমাই গদাধরকে ডাকিলেন এবং বাহির হইলে বলিলেন, "গদাধর! তুমিই সার্থক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি শিশুকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেছ; আর আমার জীবন কেবল বৃথা-রসে গেল।" এই কথা শুনিয়া গদাধর নিমাইচাঁদের চরণে পড়িলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, "গদাধর! আমি কৃষ্ণকে পাইয়াছিলাম, আবার নিজের দোষে হারাইয়াছি। আমার যে কি দুঃখ তাহা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শুন—" ইহাই বলিয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না,—একেবারে মৃত ব্যক্তির ন্যায় আবার ধূলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার সময় নিমাই ঢুলিতে ঢুলিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। সমস্ত দিবস স্নানাহার হয় নাই। শচী যত্ন করিয়া স্নানাহার করাইলেন। মুরারি গদাধর প্রভৃতি আপনাপন গৃহে গমন করিলেন। সকলেই একেবারে বিস্মিত! নিমাইয়ের ভক্তির উদয় হইয়াছে, ইহা বিচিত্র নহে; কিন্তু এরূপ ভক্তি কি মনুষ্যের হইতে পারে? শাস্ত্রেও এরূপ ভক্তির কথা শুনা যায় না। নিমাই কি মনুষ্য? এ শক্তি নিমাইপণ্ডিত কোথা হইতে পাইলেন? মনুষ্যের এত শক্তি ত সম্ভবে না? পরস্পরে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে নিমাইয়ের কথা চারিদিকে প্রচার হইতে লাগিল। নবদ্বীপ একটি প্রকাণ্ড নগর, সেখানে কে কাহার সন্ধান রাখে, কিন্তু

তবু অনেক ভাগবত শুনিলেন যে নিমাইপণ্ডিত অদ্ভুত ভক্ত হইয়াছেন। কেহ বা এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন স্থির করিলেন।

এদিকে পড়ুয়াগণ নিমাই পণ্ডিতকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া নিমাইয়ের প্রথম স্মরণ হইল যে, তাঁহার অধ্যয়ন করান একটী কার্য্য আছে। ইহাতে গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কথাও মনে পড়িল। নিমাই তখন শিষ্যগণ সঙ্গে করিয়া গঙ্গাদাসের বাড়ী গমন করিলেন এবং গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

গঙ্গাদাস অতিশয় আনন্দিত হইয়া নিমাইকে "বিদ্যালাভ হউক" বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমি কুশলে পিতৃকার্য্য করিয়া আসিয়াছ, ইহা কেবল আমার সুহৃদ, তোমার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের পুণ্যবলে। বহু দিবস বৃথা গিয়াছে, আর পাঠ বন্ধ করা উচিত নহে। পড়া অল্প ক্ষান্ত দিলেই অনভ্যাস হইয়া যায়। তোমার পড়ুয়াগণ তোমা-ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না। তুমি যে অবধি গিয়াছ, সেই অবধি তাহারা পুঁথিতে ডোর দিয়া বসিয়া আছে। তাহারা বলে যে, যদি পড়ে, তবে তোমার নিকট পড়িবে; তাহাদের আর কাহারও কাছে পড়িয়া তৃপ্তি হয় না।"

সেখান হইতে নিমাই পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের বাড়ী গেলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহারই চণ্ডীমণ্ডপে নিমাইয়ের টোল ছিল। নিমাই চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলেন।

পুরুষোত্তমের পুত্র মুকুন্দসঞ্জয় নিমাইয়ের শিষ্য, তিনি নিমাইকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। নিমাই তখন বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে কোলে করিলেন, করিয়া স্নেহে আর্দ্র হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

পণ্ডিত আসিতেছেন শুনিয়া, নারীগণ আনন্দে হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে যেখানে যেখানে যাওয়া প্রয়োজন সেই সমুদায় স্থানে ভ্রমণ করিয়া নিমাই গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

নবম অধ্যায়

"কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়।

—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

পরদিবস প্রত্যুষে নিমাই গঙ্গাস্নান করিয়া টোলে পড়াইতে গেলেন। নিমাই আসিলেন, আর শত শত পড়ুয়া উপস্থিত হইল। যাহারা প্রবীণ তাহারা নিকটে বসিল। গ্রন্থ সমুদয় ডোর দিয়া বান্ধা। হরি হরি বলিয়া পড়ুয়াগণ পুস্তকের ডোর খুলিল। সেই হরিধ্বনি নিমাইয়ের কর্ণে প্রবেশ করাতে তাঁহার অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইল। তখন নিমাই বলিতেছেন, "কি মধুর নাম! শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের মঙ্গল করুন। তোমরা অনর্থক বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছ কেন? শ্রীভগবচ্চরণ-প্রাপ্তিই জীবনের পরমপুরুষার্থ।" পড়ুয়াগণ অধ্যাপকের পানে চাহিয়া রহিল, আর নিমাই আবিষ্ট হইয়া পরমার্থ কথা কহিতে লাগিলেন।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন যে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, নিমাই পণ্ডিত তাহা বুঝাইতে লাগিলেন, আর ছাত্রগণ একচিত্তে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। নিমাই বলিতে বলিতে হঠাৎ চুপ করিলেন। কেন করিলেন তাহার কারণ বলিতেছি। তিনি ছাত্রগণকে পড়াইতে টোলে আসিয়াছেন। পাঠ দিবেন এমন সময় হরিধ্বনি শুনিয়া, কোথায় কি করিতে আসিয়াছেন, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, তিনি আবিষ্ট হইয়া ভগবদ্গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন কি করিতে আসিয়া কি করিতেছেন ইহা মনে উদয় হওয়ায়, অত্যন্ত লজ্জা পাইলেন, এবং নীরব হইয়া অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন। ক্ষণকাল পরে নিমাই ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "অদ্য মঙ্গলাচরণ করিয়া ক্ষান্ত দেওয়া গেল। এখন

চল সকলে গঙ্গাস্নানে যাই, কল্য হইতে পাঠারম্ভ হইবে।" এইরূপে নিমাইপণ্ডিত প্রথম দিন কাটাইলেন।

দ্বিতীয় দিন নিমাই গৃহ হইতে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলেন, অত্য ভাল করিয়া পাঠ দিবেন। কিন্তু টোলে বসিয়া আবার বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন, এবং নিয়মিত পাঠ না দিয়া ভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে দিবসও পাঠ বন্ধ হইল। কিন্তু ছাত্রগণ ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত হইল না। কারণ, নিমায়ের মুখে কৃষ্ণকথা অতি মধুর লাগিতেছিল। এইরূপে তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষ হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত যে কৃষ্ণকথা বলেন, পড়ুয়াগণ তাহা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া শ্রবণ করে। যখন নিমাই কৃষ্ণকথা বলেন, তখন তিনি অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেন। পড়ুয়াগণ দেখে যে, নিমাইয়ের আবিষ্ট চিত্ত—বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। অথচ তাঁহার বাক্যের ছটা যেরূপ, তাহা মানুষে সম্ভব নহে। সুতরাং যাহারা বিদ্যানুরাগী তাহারা নিমাইয়ের কৃষ্ণকথায় বিদ্যার পরিচয় পাইয়া, যাহারা কবিতানুরাগী তাহারা কবিত্বের আস্বাদ পাইয়া, যাহারা ভক্ত তাহারা ভক্তি দেখিয়া, যাহারা প্রেমিক তাহারা প্রেমতরঙ্গে ডুবিয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত, এইরূপে নিমাইয়ের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিল। তবে ইহার মধ্যে দুই পাঁচ জন পড়ুয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

কেহ বলিল, "আমরা বাড়ী ছাড়িয়া দূর দেশে বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত আসিয়াছি, কৃষ্ণকথা শুনিতে নহে। অধ্যাপকের এ কি দশা হইল?" কেহ বলিল, "পণ্ডিতের স্কন্ধে আবার কি প্রাচীন বায়ু ভর করিল?" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তাহারা পরামর্শ করিয়া কয়েকজন জুটিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী গেল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আপনাদের দুর্দ্দশার কথা বলিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "নিমাইপণ্ডিতের ন্যায় অধ্যাপক ত্রিজগতে আর নাই। আমরাও তাঁহাকে শ্রীভগবানের ন্যায়

ভক্তি ও পিতার ন্যায় মান্য করিয়া থাকি। কিন্তু গয়া হইতে আসা অবধি তিনি পড়ান একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। টোলে আসিয়া কেবল "শ্রীকৃষ্ণ ভজ," "শ্রীকৃষ্ণ ভজ," এই কথা বলেন। আপনি তাঁহাকে ডাকিয়া, যাহাতে তিনি আমাদিগকে ভাল করিয়া পাঠ দেন সেই মত বলিয়া দিউন।"

গঙ্গাদাস একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, কিন্তু কার্য্যে এক প্রকার নাস্তিক। তাঁহার বিবেচনায় শাস্ত্রাভ্যাসই জীবের একমাত্র প্রধান কর্ম্ম। তিনি নিমাইয়ের এইরূপ আচরণের কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আর বলিলেন, "বটে, নিমাই ইহার মধ্যে 'হরিবোলা' হইয়াছে। আচ্ছা, তাহাকে তোমরা এখানে লইয়া আইস, আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব।"

পরদিবস প্রাতে আবার নিমাই পড়াইতে আসিয়াছেন, আবার আবিষ্ট হইয়া ছাত্রগণকে পাঠ না দিয়া, তাহাদের নিকট শ্রীভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, আর সকলে স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছেন। এমন সময় নিমাইয়ের চেতন হইল। তিনি যে ছাত্রগণকে পাঠ না দিয়া কৃষ্ণকথা কহিতেছেন, তাহা মনে উদয় হওয়াতে লজ্জায় অধোবদন হইলেন। অন্যান্য দিন এরূপ অবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র টোল ভাঙ্গিয়া স্নানে যাইতেন। কিন্তু সে দিবস তাহা না করিয়া, প্রধান ছাত্রগণের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমাকে সত্য করিয়া বল দেখি আমি ব্যাখ্যা কিরূপ করিলাম?" ইহাতে ছাত্রগণ কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া থাকিল। তখন নিমাই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কিরূপ পড়াইতেছি, সরলভাবে বল। আমার বোধ হয় তোমাদের ভালরূপ পাঠ হইতেছে না।" তখন একজন প্রধান শিষ্য বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহাই ঠিক। আপনার শক্তির অবধি নাই। যে শব্দের যেরূপ অর্থ করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি

তাহাই করিতে পারেন। যে আপনাকে যে পাঠ জিজ্ঞাসা করে, আপনি তাহারই অর্থে কেবল হরিনাম ব্যাখ্যা করেন। আপনি যে অর্থ করেন, তাহাই ঠিক। তবে আমরা যে উদ্দেশ্যে পড়িতে আসিয়াছি, তাহা সিদ্ধ হইতেছে না। এবার গয়া হইতে আসা অবধি আপনি একদিনও সচেতনে পুঁথির অর্থ করেন নাই।"

তখন নিমাই লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইলেন, বলিলেন, "ভাই সকল! আমার কি হইয়াছে, আমি কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর কিছু পড়াইতে পারি না।" একটু নীরব থাকিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিলেন; "তোমাদের নিকট সরল কথা বলাই ভাল। বল দেখি, আমার কি আবার সেই পূর্ব্বের বায়ুরোগ উপস্থিত হইল?"

শিষ্যগণ বলিলেন, "বায়ুরোগ কি করিয়া বলি? আপনার অর্থ খণ্ডন করে এরূপ লোক জগতে নাই। আপনার যেরূপ ভক্তি এরূপ কেহ কখন দেখে নাই। বায়ুরোগ হইলে, আপনার কথা এত মধুর কেন হইবে?"

তখন নিমাই ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "একটি অতি গোপনীয় কথা তোমাদিগকে বলি। এ কথা অন্যত্র অকথ্য। তোমরা নিজ জন বলিয়া বলিতেছি। আমি যখন পড়াইতে আসি, তখন মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করি যে, অদ্য ভাল করিয়া পড়াইব। কিন্তু তখনই একটি পরম সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ শিশু আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতে থাকেন, তাহাতে আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ এবং অঙ্গ অবশ হয়।" ইহা বলিতেই নিমাইয়ের অঙ্গ অবশ হইল, কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া টোল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিকালে গঙ্গাদাসের আদেশক্রমে ছাত্রগণ সমভিব্যবহারে নিমাই তাঁহার বাড়ীতে গেলেন। নিমাই প্রণাম করিলেন। গঙ্গাদাস 'বিদ্যা

লাভ হউক', বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বিশ্বম্ভর! অনেক জন্মের তপস্যায় একজন অধ্যাপক হয়। তুমি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। তোমার মাতামহ ও পিতা বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তোমাকে আমি পরিশ্রম করিয়া পড়াইয়াছিলাম, তুমিও আমার নাম রাখিয়াছ। সমস্ত গৌড়দেশে তোমার যশ ব্যাপিয়াছে। তোমার ব্যাকরণের টিপ্পনী ক্রমে সমাজে আদৃত হইতেছে। তুমি নাকি এ সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া এখন হরি-ভজা হইতেছ? ভাল, তোমার পিতা ও মাতামহ, ইঁহারা কি নরকে যাইবেন? এ সমস্ত পাগলামি ছাড়িয়া দিয়া মনযোগপূর্ব্বক পাঠ দাও। তোমার শিষ্যগণ আর কাহারও কাছে পড়িবে না, তোমার কাছেও পড়িতে পাইতেছে না। তাহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছে। পাগলামি ছাড়িয়া দাও, দিয়া—আমার মাথা খাও—ভাল করিয়া পড়াইতে আরম্ভ কর।"

নিমাই লজ্জিত হইয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন। গঙ্গাদাসের নিকট "ক্ষমা করুন" বলিয়া করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আর এই অবধি ভাল করিয়া পড়াইবেন স্বীকার করিলেন। তখন সকলে বিদ্যাচর্চ্চা করিতে করিতে রত্নগর্ভ আচার্য্যের দুয়ারে আসিয়া বসিলেন। রত্নগর্ভ শুধু শ্রীহট্টের লোক নহেন, জগন্নাথ মিশ্রের এক গ্রামের লোক। সেখানে তাঁহার বাহির দুয়ারে, যোগপট্ট ছাঁদের চাদর বাঁধিয়া, শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বসিয়া নিমাই শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। চারিদণ্ড রাত্রি হইয়াছে, শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়া নিমাইয়ের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য অনুভব করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত রত্নগর্ভ অতি সুস্বরে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন, যথা :—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতু প্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।

বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জম্
কর্ণোৎপলালকপোলমুখাব্জলাসন্ ॥

(১০ম স্কন্ধ ২৩ অধ্যায় ২২ শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার এই শ্লোকটি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ছাত্রগণ তাঁহার এরূপ ভাব আর কখন দেখেন নাই। তাহার কারণ, ছাত্রগণ বাহিরের লোক। আর পাছে তাহাদিগের নিকট কোনরূপ ভাবের উদয় হয়, এই নিমিত্ত নিমাইপণ্ডিত অত্যন্ত সশঙ্ক ও সতর্ক থাকিতেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী হঠাৎ শুনিয়া আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না, বাণবিদ্ধ পক্ষীর ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন।

ইহা দেখিয়া শিষ্যগণ আস্তে ব্যস্তে তাঁহাকে ধরিলেন। দেখেন যে, জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। তখন সকলে অত্যন্ত ভীত হইয়া মুখে জলের ছিটা মারিতে লাগিলেন। অনেক পরে নিমাই চৈতন্যলাভ করিলেন। তখন নয়ন দিয়া প্রেমধারা বহিতে লাগিল। নিমাই প্রেমতরঙ্গে স্থির থাকিতে না পারিয়া মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নয়ন-জলে সে স্থান কর্দ্দমময় হইয়া গেল। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন। নগরের লোক যাঁহারা যাইতেছেন, তাঁহারাও দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। কেহ কেহ নিমাইকে প্রণামও করিতেছেন। এমন সময় নিমাই গড়াগড়ি দিতে দিতে বলিয়া উঠিলেন, "শ্লোক বল"। রত্নগর্ভ আবার সেই শ্লোক পড়িলেন। শ্লোক শুনিতে শুনিতে নিমাই উঠিয়া বসিলেন, পরক্ষণেই আবার মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া যাইয়া আবার বলিতে গেলেন "শ্লোক পড়", কিন্তু তাহা বলিতে পারিলেন না ; কেবল "বোল" "বোল" বলিতে লাগিলেন। রত্নগর্ভের প্রতি শ্লোক পড়িবার আদেশ হইতেছে বুঝিয়া, তিনি আবার শ্লোক পড়িলেন। তখন নিমাই উঠিয়া

আনন্দে রত্নগর্ভকে আলিঙ্গন করিলেন। রত্নগর্ভ আলিঙ্গন পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। রত্নগর্ভ নিমাইয়ের প্রথম কৃপাপাত্র।

তখন রত্নগর্ভ একবার নিমাইয়ের চরণ ধরিতেছেন, একবার রোদন করিতেছেন, একবার শ্লোক পড়িতেছেন। সেখানে অবশ্য গদাধর ছিলেন। কারণ যেখানে নিমাই, সেইখানেই গদাধর। তিনি দেখিলেন, রত্নগর্ভ যত শ্লোক পড়িতেছেন, নিমাই ততই অস্থির হইতেছেন। নিমাই যে ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, ইহাতে গদাধরের হৃদয়ে দুঃখ হইতেছে, তাই তিনি তখন রত্নগর্ভকে শ্লোক পড়িতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং যদিও নিমাই "বোল" "বোল" বলিতে লাগিলেন, কিন্তু রত্নগর্ভ আর শ্লোক পড়িলেন না।

একটু পরে নিমাই অল্প চেতন পাইলেন। তখন সেই সোনার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছে। ক্রমে সম্পূর্ণ চেতন পাইয়া নিমাই আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া লজ্জিতভাবে বলিতেছেন, "ভাই সকল! আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম, বল দেখি?" কেহ কোন উত্তর করিলেন না তখন সকলে তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন।

পর দিবস প্রাতে, নিমাই ছাত্রগণ পরিবেষ্টিত টোলে আসিয়া বসিলেন। ছাত্রগণ পূর্ব্ব দিনের অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া আনন্দে নিশি যাপন করিয়াছেন। নিমাইয়ের পূর্ব্ব নিশির ভাব দর্শনে তাঁহাদের মনে যে ভক্তির উদয় হইয়াছিল, তাহা তখনও সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে। পড়ুয়াগণ দেখিতেছেন, তাঁহাদের নবীন অধ্যাপক তাঁহার উপবেশন স্থানে যোগাসনে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার সোনার সুবলিত অঙ্গ দিয়া মহাপুরুষের ন্যায় তেজ বাহির হইতেছে। সরল ও সুন্দর বদন— মলিন, কিন্তু আনন্দময় পদ্ম-চক্ষু কান্দিয়া কান্দিয়া রক্তবর্ণ হইয়াছে, নবীন অধ্যাপক চেষ্টা করিয়াও নয়ন-জল নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। শিষ্যগণ স্তব্ধ হইয়া সেই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিতেছেন। নিমাইয়ের চরিত্র, বিশেষতঃ তাঁহার

পূর্ব্বরাত্রের ব্যবহার দেখিয়া, তাঁহারা এই স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদের অধ্যাপক শুক কি প্রহ্লাদ, কিম্বা স্বয়ং নরনারায়ণ হইবে; ঠিক তাঁহাদের ন্যায় মনুষ্য নহেন। নিমাই যে পরমানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া আছেন, তাহা ভঙ্গ করিয়া, তাঁহার নিকট সামান্য পাঠ জিজ্ঞাসা করিতে কোন শিষ্যের প্রবৃত্তি হইতেছে না। এমন সময় নিমাই চেতন পাইয়া আবার লজ্জিত হইলেন। তখন শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! এরূপ করিয়া আর তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারি না। আমার এখন তোমাদিগের কাছে একটী ভিক্ষা আছে। আমাকে তোমরা কৃপা করিয়া মুক্তি দাও; আমি তোমাদিগকে আর পড়াইতে পারিবনা। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি পড়াইতে গেলেই দেখিতে পাই, একটী কৃষ্ণবর্ণ শিশু মুরলী বাজাইতেছেন, তখন আমার সকল বুদ্ধি লোপ পায়; আর তখন আমার মুখে কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর কিছু আসে না। সুতরাং আমার কাছে এখন তোমাদের পড়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই আমি সরল মনে তোমাদিগকে অনুমতি দিতেছি, তোমাদের যাহার কাছে ইচ্ছা গিয়া পাঠ কর, আর আমাকে মুক্তি দাও।" ইহাই বলিয়া অধোমুখ হইয়া রোদন করিতে করিতে নিমাই পুস্তকে ডোর দিতে লাগিলেন।

শত শত শিষ্য একাগ্রচিত্তে নবীন অধ্যাপকের কথা শুনিতেছেন। করুণ স্বরে নিমাই যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহার প্রতি অক্ষর তাহাদের হৃদয়ে বিষ-শরের মত বিন্ধিতেছে। আর অধ্যাপকের সজল-নয়ন দেখিয়া তাহাদের সমুদায় অঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। সকলেই কান্দিয়া উঠিলেন। তখন একজন প্রধান শিষ্য কান্দিতে কান্দিতে করজোড়ে কহিলেন, "গুরুদেব! তোমাকে ছাড়িয়া আমরা আর কাহার কাছে পড়িব? আর কাহারও কাছে পড়িতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কে আর আমাদিগকে তোমার মত স্নেহ ও যত্ন

করিয়া পড়াইবে ? তোমার কাছে যাহা পড়িলাম, সেই বিস্তর। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, তাহাই হৃদয়ে থাকুক। তবে তোমার সহিত দিবানিশি বাস করিতাম, অদ্যাবধি আর তাহা হইবে না, এই দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।" এই কথা বলাতে সকল শিষ্য অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, আর কেহ কেহ কান্দিতে কান্দিতে পুস্তকে ডোর দিতে লাগিলেন।

তখন নবীন অধ্যাপক, সম্মুখে যে শিষ্যটী ছিল, তাহাকে দুই হাত দিয়া কোলে করিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন ; এবং যত শিষ্য ছিল, সকলকে আরও নিকটে আসিতে বলিলেন। নবীন অধ্যাপকের কণ্ঠরোধ হইয়াছে, আর কথা কহিতে পারিতেছেন না। তখন প্রত্যেককে ধরিয়া আলিঙ্গন, মস্তক আঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। শত শত পড়ুয়ার ক্রন্দন রবে সে স্থান ও তাহার চতুস্পার্শ্ব কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অনেক কষ্টে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া, নিমাই বলিতেছেন, "ভাই সকল! আমি তোমাদের অধ্যাপক, আশীর্ব্বাদ করিবার আমার অধিকার আছে। আমি মনের সহিত তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যদি আমি একদিনও শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকি, তবে তোমাদের হৃদয়ে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হউক। আর বিদ্যারই বা প্রয়োজন কি ? শ্রীকৃষ্ণের শরণ লও, তাঁহার গুণগান কর ও তাঁহার নাম শ্রবণ কর। যাহা পড়িয়াছ যথেষ্ট হইয়াছে, এখন এস সকলে মিলিয়া কৃষ্ণ-গুণ গান করি।" শিষ্যগণ অধোমুখে রোদন করিতেছেন, আর নিমাই অতিকষ্টে হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া, মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। একটু থামিয়া নিমাই বলিলেন, "ভাই সকল! এতদিন একত্র হইয়া পড়িলাম, শুনিলাম, এখন আমাকে কৃতার্থ কর,—একবার কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয় শীতল ও সাধ পূর্ণ কর।" শিষ্যগণ তখন ভক্তি-সাগরে ডুবিয়াছেন। তাঁহাদেরও

নিতান্ত ইচ্ছা যে, ঐরূপ একটা কিছু করিয়া মনের বেগ শান্ত করেন। সুতরাং নিমাইয়ের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "গুরুদেব! তাহাই ভাল, আমরা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিব, কিন্তু কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কিরূপ জানি না, আমাদের শিখাইয়া দাও।"

তখন নিমাই বলিলেন, "এস আমরা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করি।" এই বলিয়া নিমাই হাতে তালি দিয়া তাল দেখাইয়া শিষ্যদিগকে এই গীতটি শিখাইতে লাগিলেন।

কেদার রাগ

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ

(যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ।)

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

নিমাই মধ্যস্থানে বসিয়া গাইতেছেন, আর শিষ্যগণ চারিদিকে বসিয়া হাতে তালি দিয়া তাঁহার সহিত গাইতেছেন। ক্রমে প্রেমের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল এবং সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, কেহ গড়াগড়ি দিতে, কেহ-বা নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে মহা কলরব হইল, আর লোকে কৌতুক দেখিতে ধাইয়া আসিল। কিন্তু সম্মুখের কাণ্ড দেখিয়া রহস্তবাঞ্ছা আর রহিল না, সকলে ভক্তিতে গদ গদ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল, আর নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, "জগতে যে এরূপ ভক্তি আছে, ইহা পূর্ব্বে কাহারও জানা ছিল না।"

শ্রীনবদ্বীপে এই প্রথমে শুভ শ্রীনাম-কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। নাচিয়া গাইয়া যে শ্রীভগবানের চরণলাভ করা যায়, তাহা নিমাই আপনি নাচিয়া ও গাহিয়া জীবকে প্রথম দেখাইলেন। একটি প্রাচীন পদে শ্রীনিমাইকে সম্বোধন করিয়া পদকর্ত্তা বাসুঘোষ বলিতেছেন যথা—

"আমার পরশমণির কি দিব তুলনা।
পরশমণির গুণে, জগতের জীবগণে,
নাচিয়া গাইয়া হৈল সোণা॥"

শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাগ, যজ্ঞ, পূজা, অর্চ্চনা, তপস্যা, প্রার্থনা, প্রভৃতি নানাবিধ উপায় পূর্ব্বাবধি ছিল। এই প্রথমে নিমাই ভজিয়া দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান আনন্দময়, আর তাঁহার ভজনাও আনন্দময়। এই "হরি হরয়ে নমঃ" কীর্ত্তন ১৪৩০ শকে গীত হইয়াছিল। অদ্যাপিও সেই সুরে সেই গীত শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ গাইয়া থাকেন। শ্রীনিমাইয়ের কণ্ঠ হইতে এই গীতটী যে শক্তি পাইয়াছিল, অদ্যাপিও উহাতে সেই শক্তি, সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক পরিমাণে আছে। অদ্যাপিও এই গীত গাইয়া শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ আনন্দে নৃত্য ও গড়াগড়ি দিয়া থাকেন; কেহ কেহ মূর্চ্ছা প্রাপ্তও হন। নিমাইয়ের অনেক শিষ্য সেইদিন হইতে তাঁহার ভক্ত হইলেন, আবার অনেকে উদাসীন পথও অবলম্বন করিলেন।

দশম অধ্যায়

"বাপ নিমাই, কি হয়েছে, কেন দিবানিশি কান্দ ?" —বলরাম দাস।

নিমাইয়ের তখন কিরূপ অবস্থা তাহা বিবরিয়া বলিতেছি। বহিরঙ্গ লোক দেখিলে অতিকষ্টে ভাব সম্বরণ করেন। যখন ভাব সম্বরণ করিতে না পারেন, তখন গৃহে লুকান। অন্তরঙ্গের মধ্যে থাকিলে ভাব সম্বরণ করেন না। নিতান্ত নিজ্জন দেখিলে তাহার গলা ধরিয়া রোদন করেন, আর যদি কথা কহেন, তবে কেবল বলেন, "কৃষ্ণ কোথা, তুমি কি

তাঁহাকে দেখিয়াছ ? তিনি কি আমাকে দেখা দিবেন ?" নয়ন সর্ব্বদাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া অরুণ হইয়াছে, আর নয়ন হইতে অবিরত বারিধারা পড়িতেছে, ইহার বিরাম নাই। আত্মীয়গণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে হয় কোন উত্তর দেন না, না হয় এক কথার আর এক উত্তর দেন।

পুত্রের দশা দেখিয়া শচী নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলে অনেক সময় উত্তর পান না ; যদি কখন পান, তাহা বুঝিতে পারেন না। নিমাই কখন বলেন, "মা ! আমার কি পীড়া হইয়াছে আমি বলিতে পারি না, আমার কেবল কাঁদিতে ইচ্ছা করে।"

কখন বলেন, "মা ! আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাই।" কখন একেবারে পাগলের মত শচীদেবীকে "মা যশোদা" বলিয়া আহ্বান করিয়া বালকের মত হাসেন।

শচীর ইচ্ছা নিমাই অন্যান্য যুবকের মত আমোদ আহ্লাদ করেন, অন্ততঃ অন্য লোকের মত চেতন অবস্থায় কথা বলেন। শচীর বয়ঃক্রম তখন সম্ভবতঃ ৬৭ বৎসর। স্বামী নাই, আর পুত্র নাই, কন্যাও নাই। সম্বলের মধ্যে পুত্র নিমাই, আর বালিকা-বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া। পুত্রের চরিত্রের কথা সকলের নিকট বলিতে প্রবৃত্তি হয় না, আর না বলিয়াও থাকিতে পারেন না। দিবানিশি পুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত, তিনি যেমন বুঝেন সেইরূপ চেষ্টা করিতে থাকেন। কখন সংসারের কথা বলেন, কখন বধূর কথা বলেন, কখন রাগ করেন, কখন বা রোদন করিয়া নিমাইকে চেতন করিবার চেষ্টা করেন। যখন নিমাই ভোজন করিতে বসেন, সেই শচীদেবীর বড় সুযোগ। নিমাইয়ের সন্তোষের জন্য তখন বধূর দ্বারা অন্ন পরিবেশন করান, আর আপনি অগ্রে বসিয়া নিমাইকে আনমনা করেন। নিমাইয়ের মন ভাবে বিভোর, কেবল অভ্যাসবশতঃ ভোজন করেন মাত্র। একদিন শচী পুত্রের অগ্রে বসিয়া তাঁহাকে সচেতন করিবার চেষ্টা

করিতেছেন, কিন্তু নিমাইয়ের বিভোর ভাব কিছুতেই যাইতেছে না। যথা—

"যত কিছু বোলে শচী পুত্রের উত্তর।
কৃষ্ণ বহি নাহি কিছু বোলে বিশ্বম্ভর॥"

শচী বলিতেছেন, "নিমাই আজ কি পড়িলে ?"

নিমাই। কৃষ্ণনাম পড়িলাম।

শচী। আমি তা বলিতেছি না, আজ কি বিচার করিলে ?

নিমাই। রাধা-কৃষ্ণ।

শচী। তা না ; নিমাই আমার মাথা খাস, ভাল কোরে কথা ক'।

নিমাই তখন চৈতন্য পাইয়া লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, "মা, আমি আর এক কথা ভাবিতেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর।"

শচী একে চিন্তায় ব্যাকুল, আবার পাড়ার নির্ব্বোধ লোক তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। তাহারা বলে, "তোমার পুত্র পাগল হ'য়েছে, উহাকে বান্ধিয়া রাখ।" এই সমুদায় কথা শুনিয়া, শচী আর নিমাইয়ের কথা গোপন রাখিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার পতির পরম আত্মীয়, শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে লোক পাঠাইয়া সমুদায় কথা বলিলেন। নিমাই পরমভক্ত হইয়াছেন শুনিয়া শ্রীবাস তাঁহাকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হউক এ পর্যন্ত আইসেন নাই। এখন শচীর লোকের মুখে নিমাইয়ের ভাবের কথা শুনিয়া তখনই তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন।

নিমাই পণ্ডিতের বাটীতে গিয়া শ্রীবাস দেখিলেন, নিমাই করযোড়ে তুলসী তরু প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আর নয়নজলে সে স্থান ভিজিয়া যাইতেছে। শ্রীবাস পরমভক্ত, তাঁহাকে দেখিয়া নিমাইয়ের কৃষ্ণ-ভক্তি একেবারে উথলিয়া উঠিল। তিনি শ্রীবাসকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিতে

গেলেন, কিন্তু পরিলেন না,—মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। পরে অনেক চেষ্টায় নিমাই চেতন পাইলেন,—চেতন পাইয়াই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের এই সমস্ত অপূর্ব্ব ভাব, শ্রীবাস বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে নিমাই সম্পূর্ণ বাহ্য পাইলেন, তখন শ্রীবাসকে আবার প্রণাম করিলেন। শ্রীবাস তাঁহাদিগের আত্মীয়, নিমাই সেই ভাবেই তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "পণ্ডিত! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য বলিয়া দাও। আমি কোন ক্রমে নয়নজল নিবারণ করিতে পারিতেছি না, আমার ঘন ঘন মূৰ্চ্ছা হইতেছে। লোকে বলে যে, আমার বায়ুরোগ হইয়াছে। কেহ বা এরূপও বলে যে, আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া শিবাদি ঘৃত প্রয়োগ করিতে হইবে। আমার মা অবশ্য বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। আমিও যে কি করিব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমি আমার স্ববশে নাই। বহু চেষ্টা করিয়াও আমি আমার চিত্তকে স্ববসে আনিতে পারিতেছি না।"

শ্রীবাস একটু হাসিলেন; হাসিয়া বলিলেন, "নিমাই, তোমার যে বায়ু দেখিতেছি, এ বায়ু ব্রহ্মা প্রভৃতি বাঞ্ছা করেন। তুমি তোমার ঐ বায়ু একটু আমাকে দাও, এই আমার ভিক্ষা। তুমি পরম ভাগ্যবান, ত্রিজগতে তোমার মত ভাগ্যবান আর নাই। তোমাতে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ কৃপা হইয়াছে। তোমার যেরূপ ভক্তি দেখিলাম, এরূপ ভক্তি যে জীবে সম্ভবে ইহা জানিতাম না।" শচী দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছেন,—কতক বুঝিতে পারিতেছেন, কতক পারিতেছেন না।

শ্রীবাসের মুখে এই কথা শুনিয়া, নিমাই তখনি তাঁকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। আর বলিলেন, "সকলে বলিতেছে বায়ু। আমি কেবল তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। তুমিও যদি আমাকে বায়ুরোগগ্রস্ত

বলিতে, তাহা হইলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। তুমি আশ্বাস দিয়া আমার ও আমার জননীর বড় উপকার করিলে।” নিমাইয়ের আলিঙ্গন পাইয়া শ্রীবাসের অঙ্গ পরমানন্দে পুলকিত হইল। তিনি শচীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি নির্ব্বোধ লোকের কথা শুনিয়া উতলা হইও না। তোমার পুত্রের বায়ুরোগ নহে, ইহা কৃষ্ণ-প্রেম। তবে এরূপ প্রেম জীবে সম্ভবে বলিয়া পূর্ব্বে জানা ছিল না। তুমি স্থির হইয়া থাক, কাহাকেও কিছু বলিও না, কৃষ্ণের কত রহস্য ক্রমে দেখিবে!”

তাহার পর নিমাইকে বলিলেন, “নিমাই! যাহার যাহা ইচ্ছা বলুক, তাহা তোমার শুনিবার প্রয়োজন কি? এসো এখন হইতে তোমার সহিত আমরা সকলে মিলিয়া আমার বাড়ীতে সংকীর্ত্তন করি।” নিমাই ইহা স্বীকার করিলেন, ইহাতে শচীও কতকটা শান্ত হইলেন। তাঁহার ভয় তবু একেবারে গেল না, কারণ বিশ্বরূপের কথা তিনি ভুলেন নাই! তিনি নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, হয় ত নিমাইও সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে।

এই গেল নিমাইয়ের আভ্যন্তরিক ভাব। বাহিরে নিমাইয়ের ভাব আর একরূপ। প্রত্যূষে যখন তিনি গঙ্গাস্নান করিতে যান, তখনই বাহিরের লোকের সহিত দেখা হয়। অন্য সময় প্রায় নির্জ্জনে থাকেন। সে অবস্থায় নিজজন ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গ তাঁহার ভাল লাগে না। গঙ্গাস্নানের সময় যখন বাহির হন, তখন গদাধর প্রভৃতি দুই একটী বয়স্য তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সঙ্গে থাকেন। বহিরঙ্গ লোক দেখিলে নিমাই একপাশ হন; কিন্তু ভক্ত দেখিলে লুকান না বটে, তবে অন্তরের ভাব গোপন করিয়া নয়নজল মুছেন, এবং নিকটে গিয়া কাহাকে নমস্কার, কাহাকেও বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। তখন “কর কি? কর কি?” বলিয়া অবশ্য তাঁহারা নিবারণ করেন। যে নবদ্বীপে বিদ্যা

লইয়া রাজ্য, তাহার রাজা নিমাইপণ্ডিত, ঐরূপ দীনভাবে ক্ষুদ্র লোককে প্রণাম করিলে, কাজেই তাহার কুণ্ঠিত হইবার কথা। কিন্তু নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া তাহাদের সেই কুণ্ঠিতভাব তখনই অপগত হয়, আর হৃদয়ে কারুণ্যরস উছলিয়া উঠে. তখন কেহ বা রোদন করিয়া ফেলেন। কারণ নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারেন যে, তিনি বিনয়ের আকর। প্রকৃতই তিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা নীচ মনে করিয়া অন্যের চরণ ধরেন। এইরূপে কখন নিমাই কাহারও হস্ত হইতে ফুলের সাজি লইয়া আপনি বহিয়া চলিলেন। কাহারও বস্ত্র আপনার হস্তে লইলেন। কাহারও স্নান হইলে তাহার বস্ত্র নিংড়াইয়া দিলেন। ইহাতে সকলে দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিষেধ করেন। তখন নিমাই উত্তর করেন, "আমি শুনিয়াছি, ভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণের কৃপা হয়, সুতরাং কেন আপনারা আপনাদের সেবারূপ মহাভাগ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছেন!" দীনভাব দেখিলেই লোকের মন কোমল হয়। আবার এই দীনভাব যখন তেজস্বী লোকের হৃদয়ে উদিত হয়, তখন তিনি অপরের হৃদয় দ্রব্য ও চিত্ত মোহিত করেন। সুতরাং নিমাইয়ের দৈন্য দেখিয়া সকলের হৃদয় যে দ্রব হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি?

কখন কখনও ভক্তগণ বলেন, "কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করুন।" উত্তরে নিমাই বলিলেন, "আপনাদের যখন আমার প্রতি এত কৃপা, তখন আমার বোধ হয় আমার ভাগ্যে ভালই আছে।" নিমাইয়ের ন্যায় পদস্থ লোকের এরূপ দৈন্য দেখিয়া, কি ভক্ত কি অভক্ত, সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলেন।

ক্রমে নিমাই পণ্ডিতের কথা লইয়া নানা স্থানে তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। যে সকল পণ্ডিত নিমাইয়ের প্রতিভায় স্তম্ভিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যিনিই

বিদ্রূপ করুন, নিমাইকে দর্শন করিলে,—তাঁহার সরল, স্বচ্ছন্দ, আনন্দপূর্ণ কারুণ্য-উদ্দীপক চন্দ্রবদন দেখিলে,—আর সে ভাব থাকে না।

যাঁহারা বৈষ্ণব-ভক্ত, তাঁহারা বড় আনন্দিত হইলেন। ক্রমে এ কথা অদ্বৈতের সভায় উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীঅদ্বৈত তখন বৈষ্ণবগণের প্রধান, আর তাঁহার সভায় বৈষ্ণবগণ যাইয়া, গ্রন্থ পাঠ এবং কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেন। সেখানে একদিন ভরপূর সভার মধ্যে একজন নিমাইয়ের কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে, যে নিমাই-পণ্ডিত পাণ্ডিত্যে জগৎ জয় করিয়া পৃথিবীকে সরার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, ভক্ত কি বৈষ্ণব দেখিলে তাহাকে বিদ্রূপ করিতেন,—আজ সেই নিমাইকে দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি দীনহীন কাঙ্গাল। তাঁহার ভক্তি দেখিলে শুক কি প্রহ্লাদ বলিয়া জ্ঞান হয়। সকলে তাঁহার নিগূঢ় ভাব দেখিতে পায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহার সে ভাব দেখিয়াছে, তাহার আর তখন তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ থাকে না।

শ্রীঅদ্বৈত তখন গদগদ হইয়া বলিলেন, "গত নিশি-শেষে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা তোমাদের কথা শুনিয়া তোমাদিগকে বলিতে হইল। আমি গীতার এক স্থানের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কল্য রাত্রি উপবাস করিয়া পড়িয়াছিলাম। শেষরাত্রে দেখি, যেন কেহ আসিয়া আমাকে ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন, আচার্য্য উঠ। তুমি যে শ্লোক বুঝিতে পার নাই; তাহার অর্থ এই। আর কেন তুমি দুঃখ করিতেছ? তোমার সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে, আমি স্বয়ং আসিয়াছি। এখন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে ও জীবগণ উদ্ধার পাইবে।"

"আমি এই সব কথা শুনিয়া নয়ন মেলিলাম, দেখি যে বিশ্বম্ভর কথা কহিতেছেন! দেখিতে দেখিতে তিনি অদর্শন হইলেন। সেই অবধি আমার অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইয়া রহিয়াছে। বাল্যকালে এই বিশ্বম্ভর

যখন উহার ভাই বিশ্বরূপকে ডাকিতে আমার এখানে আসিত, তখন সেই দিগম্বর শিশু আমার চিত্ত আকর্ষণ করিত। আমি ভাবিতাম, এ বস্তুটী কি ? আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস, আমার চিত্ত এ বালক এরূপে কেন অধিকার করে ? নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথের পুত্র, বিশ্বরূপের ভাই, নিজে দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিত,—এ হেন বস্তুর যখন ভক্তির উদয় হইয়াছে, তখন আমাদের পরম মঙ্গলের কথা। আর যদি তিনি কোন বিশেষ বস্তুই হয়েন তবে এ দাসের বাড়ীতে একবার আসিতেই হইবে, আমার সহিত এরূপ কথা আছে।"

অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত। তিনি ভাবিলেন "যদি তিনি সত্যই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে অগ্রে আমার নিকট আসিবেনই আসিবেন।" শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বয়ঃক্রম তখন সপ্ততি বৎসরেরও অধিক। ত্রিভুবনে তাঁহার ন্যায় শ্রীভগবানের ভক্ত আর নাই। কিন্তু তবু তিনি একটী দুঃখে বড় কাতর! সে দুঃখ প্রকৃত ভক্তমাত্রেরই হইয়া থাকে। জীবগণের প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া শ্রীভগবান্ ভক্তকে এই দুঃখটী দিয়াছেন। জীবগণ যে শ্রীভগবানের অভয় চরণ ভুলিয়া দুঃখ পায়, শ্রীঅদ্বৈতের মনে এই বড় দুঃখ। তিনি আপন পার্ষদগণের নিকট সর্ব্বদা এই দুঃখের কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন যে, জীবগণ যেরূপ মলিন হইয়াছে, তাহাতে স্বয়ং তিনি ব্যতীত আর কেহ তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। কখন ইহাও বলিতেন, তোমরা চুপ করিয়া থাক, তিনি সত্বর আসিবেন, আসিয়া সর্ব্ব-নয়নগোচর হইবেন।" কখন 'এসো' 'এসো' বলিয়া এরূপ হুংকার করিতেন যে, পার্ষদগণ কাঁপিয়া উঠিতেন। আবার গোপনে শাস্ত্র বিধানানুসারে দিবানিশি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া সেই কামনা করিয়া ভজনা করিতেন ; বলিতেন যে "প্রভু শ্রীভগবান, তুমি এসো। তুমি আসিয়া তোমার জীবগণকে উদ্ধার কর।" এইরূপে দিবানিশি শ্রীভগবান্‌কে

আকর্ষণ করিতেন। শ্রীভগবান্ স্বপ্নযোগে তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুতি হয়েন যে তিনি আসিবেন। সুতরাং এই যে নানা জনে নিমাইকে লইয়া নানারূপ অনুভব করিতেছিলেন, ইহার মধ্যে কেহ কেহ মনে মনে ইহাও ভাবিতে লাগিলেন যে, এ বস্তুটী কি স্বয়ং তিনি ?—সেই সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণ, মনের মানুষ, আরাধনার ধন, ভক্তের ভগবান্ ?

একদিন শ্রীনিমাই গদাধরের সহিত নবদ্বীপে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বাসা-বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত। দেখেন যে, আচার্য্য তুলসীর সেবা করিতেছেন। অদ্বৈত ভক্তশিরোমণি, তাঁহাকে দেখিয়া নিমাইয়ের হৃদয়-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল ; তিনি তখনই সেখানে হুঙ্কার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অদ্বৈত মুখ ফিরাইয়া সমুদয় দেখিতেছিলেন। নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, তিনি নিমাইয়ের নিকট আসিয়া তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের ভাব ও রূপ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি নিমেষ-শূন্য হইয়া যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, "তুমি কে গো ? সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া যাঁহাকে বিচলিত করা যায় না, সেই তুমি কি আজ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ ? তা বিচিত্র কি ! তোমার কাজই এইরূপ। আহা ! কি সুন্দর মুখ ! এরূপ মুখ তোমা ব্যতীত আর কাহারও সম্ভবে না। এই কি তোমার রূপ ? তুমি না কাল ? আর তুমি যে এখন আসিবে, তাহা ত শাস্ত্রে দেখিতে পাই না ? তা তুমি শাস্ত্রের অতীত। তুমি না হলে আমাকে প্রাণের সহিত এরূপ টানিতেছ কেন ? আজ আমার কি শুভদিন !" শ্রীঅদ্বৈতের মনে এইরূপ নানাবিধ অননুভবনীয় ভাব-তরঙ্গ খেলিতেছে। সেই তরঙ্গে তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছে ; শেষে অবিশ্বাস একেবারে গেল। তিনি মনে মনে নিশ্চিত বুঝিলেন যে, যাহাকে তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই বস্তু

এই,—তাঁহার সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন! তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া গঙ্গাজল, তুলসী, চন্দন আনিলেন। আনিয়া নিমাইচাঁদের সুন্দর পা দুখানি প্রথমতঃ গঙ্গাজল দিয়া ধুইলেন। তৎপরে তুলসী পত্রে চন্দন লিপ্ত করিয়া নিমাইচাঁদের পাদপদ্মে এই শ্লোক পড়িয়া অর্পণ করিতে লাগিলেন। যথা—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

এই শ্লোক পড়িয়া চরণে তুলসী দিতেছেন, আর প্রণাম করিতেছেন। গদাধর এই সমুদায় ব্যাপার দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। গদাধর নিমাইয়ের সহিত সর্ব্বদা ভ্রমণ করেন, নিমাইকে প্রাণের অপেক্ষা প্রীতি ও প্রগাঢ় ভক্তি করেন। আর শ্রীঅদ্বৈতকে মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন। সেই অদ্বৈত তুলসী গঙ্গাজল লইয়া নিমাইয়ের চরণপূজা করিতেছেন দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইলেন। নিমাইয়ের প্রতি গদাধরের যে প্রেম তাহার সীমা ছিল না, সুতরাং শ্রীঅদ্বৈতকে নিমাইয়ের চরণ-পূজা করিতে দেখিয়া পাছে তাঁহার সখা নিমাইয়ের কোন অকল্যাণ হয় ইহা ভাবিয়া, ভয়ে ব্যাকুল হইয়া অদ্বৈতকে বলিতেছেন, "গোসাঞি, করেন কি? নিমাইপণ্ডিত বালক, উনি আপনার কাছে কি অপরাধ করিয়াছেন যে আপনি চরণপূজা করিয়া উহার অকল্যাণ করিতেছেন?" তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গদাধরের দিকে চাহিয়া এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "নিমাইপণ্ডিত কিরূপ বালক, তুমি তাহা ক্রমে জানিতে পারিবে।" ইহা শুনিয়াই গদাধরের মনে হইল যে, নিমাইপণ্ডিত কি সত্যই শ্রীভগবান্? ইহাতে যুগপৎ আনন্দ এবং ভয় উদিত হইল। আনন্দ কেন হইল তাহার হেতু বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভয় কেন হইল বলিতেছি। এতদিন নিমাই পণ্ডিত তাঁহারই ছিলেন। যদি তিনি শ্রীভগবান্ হন, তবে কি আর

তাঁহার থাকিবেন,—তিনি না তখন সকলের হইবেন? ইহা ভাবিয়া গদাধর ত্রস্ত হইয়া নিমাই হইতে দুই এক পা সরিয়া দাঁড়াইলেন।

এমন সময় নিমাই চেতন পাইলেন, আর শ্রীঅদ্বৈতকে আপনার চরণের নিকটে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "গোসাঞি! আমি ভবসাগরে হাবুডুবু খাইতেছি। তুমি দয়াময়, আমাকে উদ্ধার কর। আমার এই অপবিত্র দেহ তোমাকে দিলাম. তুমি আমার মস্তকে চরণ স্পর্শ করিয়া, আমাকে পবিত্র কর। তোমাকে দর্শন করিব মনে বড় সাধ ছিল, আজি আমার ভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তোমার চরণ দর্শন পাইলাম"

তখন অদ্বৈত একটু সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। ভাবিলেন, "উনি যদি সত্যই শ্রীভগবান্ হইবেন, তবে আমার নিকট কেন গুপ্ত হইতেছেন, আর আমার নিকট এত দৈন্যই বা কেন করিতেছেন?" অদ্বৈত কিন্তু নিজ মনোভাব ব্যক্ত না করিয়া নিমাই যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার সহজ উত্তর দিলেন। বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি আমার বন্ধু জগন্নাথের পুত্র, আর আমার সুহৃদ্ বিশ্বরূপের ভাই, সুতরাং তুমি আমার অতি প্রিয়। বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম যে, তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ কৃপা হইয়াছে। এখন সকলে মিলিয়া স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করিব।"

নিমাইয়ের দৈন্য দেখিয়া, তাঁহার উপর অদ্বৈতের যে সন্দেহ হয়, তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। "এ বস্তু কি সত্যই ভগবান্?" এই চিন্তায় তিনি অহোরহঃ নিমগ্ন থাকিতেন। কিছুদিন পরে ভাবিলেন যে, যদি তিনি শ্রীভগবান্ হয়েন, তবে অবশ্য তাঁহার সন্ধান লইবেন। ইহাই ভাবিয়া নিমাইকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ফেলিয়া ও নদীয়া ছাড়িয়া শান্তিপুরে নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈতের মহিমা একবার অনুভব করুন।

একাদশ অধ্যায়

"শ্রীবাসের আঙ্গিনায় গোরা রায়, নাচে হরি বোলে।
নাচে হরি বোলে, দুটি বাহু তুলে।"

শ্রীবাস যত্ন করিয়া নিমাইকে আপনার বাড়ীতে কীর্ত্তন করিতে লইয়া গেলেন। তাঁহারা চারি ভাই সকলেই কীর্ত্তন করেন। অপূর্ব্ব কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দ দত্ত, এবং মুরারি, সদাশিব, গদাধর প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তগণও মিলিত হইলেন। যখন সকলে নিমাইকে ঘিরিয়া বসিলেন, তখন তিনি কি বলিতে যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংকীর্ত্তন আর হইল না,—সঙ্কীর্ত্তনের প্রয়োজনও হইল না। একি নিমাইয়ের সঙ্গগুণ? সহচরগণ সকলে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। যখন নিমাই কান্দিতে থাকেন, সে করুণস্বরে পাষাণও দ্রব হয়। তাহার পর নিমাই যখন হাসিতে লাগিলেন, এ হাস্যের বিরাম নাই। সে হাস্যের ধর্ম্মই এই যে অন্যকে হাস্যরসে মুগ্ধ করে। কখন নিমাই এমন কাঁপিতে থাকেন যে, সকলে ধরিয়া তাঁহার কম্পন নিবারণ করিতে পারেন না। কখন কাহারও গলা ধরিয়া তিনি কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই, কৃষ্ণ আনিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।" কখনও বলেন, "ভাই, কৃষ্ণ ভজ, এমন দয়াল ঠাকুর আর নাই।"

এ সমুদায়ই নিমাই আবিষ্ট অবস্থায় করিতেছেন, কিন্তু যখন যাহা করিতেছেন, তাহাই সুন্দর। ঘরের মধ্যে স্ত্রীলোক, বাহিরে ভক্তগণ ;—সকলেই আনন্দে উন্মত্ত অবস্থায় সমুদায় দর্শন করিতেছেন। হঠাৎ নিমাই চেতনা পাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল, আমার কৃষ্ণকে পাইয়া-ছিলাম, পাইয়া আবার হারাইয়াছি।" তাহার পর বলিতে লাগিলেন,

"গয়া হইতে আসিবার সময় গৌড়ের নিকট কানাই-নাটশালা গ্রামে প্রাতঃকালে একটি ভুবনমোহন পরমসুন্দর কৃষ্ণবর্ণ শিশু নৃত্য করিতে করিতে আমার নিকটে আসিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রীপদে নূপুর বাজিতেছিল। তিনি অতি চঞ্চলের ন্যায় হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া অমনি অদর্শন হইলেন। তিনি কোথায় গেলেন?" ইহাই বলিয়া নিমাই আবার অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই কাহিনী বলিবেন মনে করিয়া. নিমাই প্রথমে শুক্লাম্বরের বাড়াতে মুরারি প্রভৃতিকে পূর্ব্বে যাইতে বলিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন,, "ভাই সকল, কল্য প্রাতে আমার দুঃখের কথা তোমা-দিগকে বলিব।" সেদিনও বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে গিয়া মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে, সুখের নিশি পোহাইয়া গেল। অপূর্ব্ব দর্শনে লোক মুগ্ধ হয়, কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্গীগণ যে শুদ্ধ দেখিয়া শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, তাহা নয়। যেন নিমাইয়ের ভাবে, ভঙ্গীতে, স্পর্শে, কথায়, রোদনে এমন কি একটা শক্তি আছে যাহাতে, উপস্থিত ভক্তগণ বিব শহইতে লাগিলেন, আর নিমাইয়ের রোদনে রোদন, হাস্যে, হাস্য, আর আনন্দে আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

'এ ব্যাপারটা কি,' সকলে ভাবিতে লাগিলেন। একি তাহাদের জাগরণ অবস্থা, না নিদ্রার অবস্থা? একি পৃথিবী, না বৈকুণ্ঠ? তাহারা দেবতা না মনুষ্য? নিমাই কি শুকদেব, প্রহ্লাদ, না স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ? সে রজনীতে যে যে ব্যক্তি নিমাইয়ের সে ভাব দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের হৃদয়ই নিমাই জুড়িয়া বসিলেন। অন্য কথা, অন্য ধ্যান, অন্য চিন্তা করিবার শক্তি,—কি পুরুষ কি স্ত্রী,—কাহারও রহিল না। সকলের অন্তরেই কেবল 'নিমাই' জাগিতে লাগিলেন।

নিমাই প্রভাতে বাড়ী গেলেন। তখন তাঁহার নবানুরাগের সময়। নবানুরাগ বড় সুখের সময়। তখন যাহার যেরূপ অনুরাগের গভীরতা তাহার সেইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। নিমাইয়ের তখন আর বাহ্য জ্ঞান প্রায় হইত না, সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মত্ত থাকিতেন। এই সময় মুরারিগুপ্ত তাঁহার নিয়ত পার্ষদ। তাঁহার কড়চা গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপুর যে চৈতন্যচরিত মহাকাব্য লিখেন, সেই কাব্য হইতে, সেই সময়ে নিমাইয়ের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা কিছু বর্ণনা করিতেছি। যথা, চৈতন্যচরিত কাব্যের পঞ্চম শ্লোকের অনুবাদ :—

"প্রাতঃকালে মহাপ্রভু (নিমাই) উচ্চৈঃস্বরে বিনয়ের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্তদিন কাটিল এবং ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এ কি দিন হইল, ইহাই বলিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ১০।"

"আবার সন্ধ্যাকালে বিমুক্ত-কণ্ঠ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন; করিতে করিতে বলিলেন, 'একি প্রভাত হইল, কারণ আলো দেখিতেছি।' এইরূপে গৌরহরির সময়ের জ্ঞান রহিত হইল। ১১।"

"মহাপ্রভুর কর্ণকুহরে যখন একটী বার (শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীহরি) নাম প্রবিষ্ট হয়, তখন তিনি ভূমিতে পড়িয়া বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করেন, তাঁহার কম্প হয় ও অতিবেগে দীর্ঘনিঃশ্বাস ও বহুতর নেত্রজল পড়িতে থাকে। ১২।"

নিমাইয়ের নয়ন-ধারার আর বিরাম নাই। তবে বহিরঙ্গ লোক দেখিলে কষ্টে স্বষ্টে উহা নিবারণ করেন মাত্র। মনুষ্যের নয়ন হইতে যে এত জল পড়িতে পারে ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। বাড়ীর মধ্যে পিঁড়ায় বসিয়া নিমাই বাম হস্তে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি রোদন করিতেছেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই। যদি কখন একটু চেতনা লাভ করেন, তখন সম্মুখে যাঁহাকে দেখেন, তাঁহাকে অতি ব্যাকুল হইয়া

জিজ্ঞাসা করেন, "কৃষ্ণ কোথায় গেলেন ?" নিমাই প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিলেন, প্রেমানন্দে ধারা পড়িতে লাগিল। নিমাই বদন প্রক্ষালন করিতেছেন, আর নয়নে ধারা পড়িতেছে। নিমাই আহার করিতে বসিয়াছেন, প্রেমে আহার করিতে পারিতেছেন না, আর শচী সাধ্যসাধনা করিয়া আহার করাইতেছেন। দিবাভাগে শয়ন করিতে গেলেন, নয়ন-ধারায় শয্যা ভিজিয়া গেল।

একদিন গদাধর নিমাইয়ের নিমিত্ত হস্তে তাম্বুল করিয়া তাঁহার কাছে আসিলে, নিমাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গদাধর! কৃষ্ণ কোথায় গেলেন ?" তখন গদাধর উত্তর করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ আর কোথায় যাইবেন, তোমার হৃদয়-মাঝে আছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র নিমাই ভাবিলেন, তবে আর কি, কৃষ্ণকে এতদিন পরে নিকটে পাইয়াছেন, এখন ধরিবেন ; ইহাই ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বটে ? হৃদয় মাঝে ?" যেমন এই কথা বলিলেন, অমনি দুই হস্তের নখ দিয়া হৃদয় চিরিতে গেলেন। তখন আস্তে ব্যস্তে গদাধর তাঁহার দুখানি হাত ধরিলেন। শচীও হাত ধরিলেন, এবং সকলে নিমাইকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তখন শচী বলিতেছেন, "গদাধর! তুমি বড় সুবোধ ছেলে, তুমি না থাকিলে আজ আমার নিমাই প্রাণে মরিত। শচীর এ কথা বলিবার কারণ এই যে, তখন নিজ নখাঘাতে নিমাইয়ের হৃদয় বিদারিয়া শোণিত পড়িতেছিল।

সন্ধ্যা হইলে ভক্তগণ একে একে আসিয়া নিমাইয়ের বাড়ীতে মিলিত হইতে লাগিলেন, শ্রীবাসের বাড়ী আর যাওয়া হইল না, নিমাইয়ের গৃহেই প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করিল। যদিও সকলে সংকীর্ত্তন করিতে বসিলেন, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে তখনও সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয় নাই। ভক্তগণ কেবল নিমাইকে লইয়া আনন্দে নিশি জাগরণ করেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিমাইয়ের এই নব অনুরাগের কাল। সাধন-ভজন করিলে জীবের যেরূপ অবস্থা হয়, নিমাইয়ের পর পর সেই সমুদায় অবস্থা হইতে লাগিল। তবে এই সমুদায় লক্ষণ অন্যে কিয়ৎ পরিমাণে, আর নিমাইয়ের সম্পূর্ণ পরিমাণে, দেখা দিতেছে। নবানুরাগের অবস্থা কি তাহা চণ্ডীদাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "নবানুরাগিণী বালা মনের ব্যথা যে কি. তাহা ভাল করিয়া বলিতে পারেন না। তাঁহার ব্যাধি 'অকথন', অর্থাৎ তাঁহার যে কি ব্যাধি, তাহা তিনি আপনি বলিতে পারেন না। তবে তিনি তাঁহার বন্ধুর নাম শুনিবামাত্র আনন্দে পুলকিত কি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। আর কি হয়, না তাঁহার নয়ন দিয়া অহেতুক আনন্দধারা পড়িতে থাকে।" নিমাইয়ের সেই অবস্থা গয়াধামে প্রথম হয়। কানাই নাটশালাতে এই অনুরাগ প্রথমে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তখন তিনি শয়নে স্বপনে, জলে আকাশে, সমস্ত সংসারে, কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। এই যে চতুর্দ্দিকে তিনি কৃষ্ণময় দেখিতেছেন, ইহার মধ্যে কখন কৃষ্ণের সঙ্গে আহ্লাদে কথা বলিতেছেন, কখন তাঁহার রূপ দেখিয়া নয়নজল ফেলিতেছেন, কখন বা কৃষ্ণকে না দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন। বাহিরের লোকের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। তখন, তিনি আর তাঁহার কৃষ্ণ, এই দুইজন ব্যতীত ত্রিজগতে আর কেহ যে আছে, কি কাহারও থাকিবার প্রয়োজন আছে, এ বোধ তাঁহার নাই। তাঁহার ভাব দেখিয়া বাহিরের লোক তাঁহাকে বুঝিতে পারিত না; এমন কি, কেহ কেহ তাঁহাকে পাগল ভাবিত। তিনিও বাহিরের লোকের কথা শুনিতে পাইতেন না; শুনিতে পাইলেও বুঝিতে পারিতেন না। যখন নিমাইয়ের চেতনা হইত, তখন হয় তাঁহার এই সমুদায় কথা কিছুই মনে থাকিত না, কি স্বপ্নের মত কিছু মনে থাকিত। যদি কিছু মনে থাকিত তবে চেতন অবস্থায় সঙ্গিগণকে বলিতেন, "ভাই",—কি জননীকে সম্বোধন

করিয়া বলিতেন, "মা"—"আমি যদি কিছু প্রলাপ বলিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা করা। আমি আমাব স্ববশে নাই।" সকলেই বলিতেন, "কৈ তুমি ত কিছু প্রলাপ বল নাই।"

এই অবস্থায় শ্রীবাস, মুবারি, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ নিমাইকে লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে বসেন। কিন্তু নিমাই তখন ভাবে জর জর, সম্পূর্ণ ভাবের বশীভূত; ভাব তখন তাঁহার বশীভূত হয় নাই, সুতরাং তিনি তখন স্ববশে নাই। সংকীর্ত্তন করিতে বসিলেই তাঁহার দেহে নানাবিধ ভাব প্রকাশ পায়।

সে ভাবগুলি কি, তাহা এখন শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া বিবরিয়া বলিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ,—হাস্য, রোদন প্রভৃতি কেবল "অষ্ট সাত্ত্বিক" ভাবের কথা আছে; কিন্তু নিমাইয়ের অঙ্গে বহুতর ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কখন নিমাই মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতেছেন ও ক্রন্দন করিতেছেন,—এইরূপ এক প্রহরেও ক্রন্দন থামিতেছে না। কখন ক্রন্দন থামিয়া, ঠিক তাহার বিপরীত ভাবের উদয় হইতেছে, অর্থাৎ হাস্য করিতেছেন; যত ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তত হাস্য করিতেছেন। কখন অঙ্গ দিয়া এত ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে যে, "মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইল শরীরে।" আবার কখনও কখনও অঙ্গ অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইতেছে, জল দিলেই শুষিয়া লইতেছে, চন্দন দিবামাত্র শুকাইয়া যাইতেছে। কখনও এমন কম্প হইতেছে, আর দন্তে-দন্তে এরূপ জোরে আঘাছ হইতেছে যে, বোধ হইতেছে যেন সমুদায় দন্ত ভাঙ্গিয়া গেল। কখন সম্পুর্ণ মূর্চ্ছা, উত্তান নয়ন, জীবনের চিহ্নমাত্র নাই, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ, মুখ বাহিয়া ফেন পড়িতেছে। মূর্চ্ছিত অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়, আবার কখন সেই অবস্থায় এরূপ বেগে শ্বাস বহিতে থাকে—যেন ঝড় বহিতেছে, তখন উহার সম্মুখে থাকে কার সাধ্য! কখন অঙ্গ এরূপ ভারী হয় যে, কেহ উহা উঠাইতে

পারে না। আবার কখন কখন সেই অঙ্গ এরূপ লঘু হয় যে, ভক্তগণ, জনে জনে, অনায়াসে তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া আঙ্গিনায় নৃত্য করেন। শুধু তাহা নয়, কখন আপনি শূন্য-ভরে ক্ষণিক নৃত্য করিয়া যান। কখন বা পদ মস্তকে সংলগ্ন হয়, হইয়া সমস্ত দেহটী চক্রের আকার ধারণ করে,—এইরূপে আঙ্গিনায় চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকেন। কখন ঘোরতর হিক্কা হয়, আর সেই নিমিত্ত স্থির হইয়া বসিতে পারেন না। কখন অঙ্গের গৌরবর্ণ যাইয়া শ্বেত কি অন্য কোন বর্ণ হয়। কখন চক্ষের বর্ণ পরিবর্ত্তন হয়, কখন বা দুই চক্ষের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ হয়। কখন অঙ্গে ব্রণের ন্যায় পুলক হয়, আর কখন উহা হইতে শোণিত নির্গত হইতে থাকে। কখন অঙ্গ এরূপ শক্ত হয় যে, কাহারও উহা নোয়াইতে সাধ্য হয় না। কখন-বা এমন কোমল হয় যে, বোধ হয় যেন অঙ্গে অস্থিমাত্র নাই। ইহা ব্যতীত, ভাবে কখন উদ্দণ্ড, কখন-বা মধুর নৃত্য করেন।

"ক্ষণে হয়, বাল্যভাব পরম চঞ্চল। মুখ বাদ্য করে যেন ছাওয়াল সকল॥
চরণ নাচয়ে ক্ষণে খল খল হাসে। জানু গতি চলে ক্ষণে বালক আবেশে॥"

নিমাই ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। মুকুন্দ সুকণ্ঠে শ্যামগুণ গান আরম্ভ করিলেন আর অমনি নিমাইয়ের অঙ্গে নানাবিধ অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল, ভক্তগণ তখন নিমাইকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন,—কখন তাঁহার কথা বা রোদন শুনিতেছেন, কখন বা তাঁহার অদ্ভুত ভাব দর্শন করিতেছেন। এইরূপ করিতে করিতে নিশি পোহাইয়া গেল। নিশি যে কিরূপে এত শীঘ্র শেষ হইল কেহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না, যেহেতু নিমাইয়ের সঙ্গগুণে সকলে আনন্দে বিভোর।

ক্রমে নিমাইয়ের দেহ অন্য ভাব ধারণ করিল। প্রথম দেহ ভাবের অধীন ছিল, এখন কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভাব দেহের অধীন হইতে লাগিল।

এক দিবস শ্যামগুণ গান আরম্ভ হইলে, নিমাই আনন্দে নাচিতে লাগিলেন, কিন্তু সে নৃত্য মধুর নয়, উদ্দণ্ড ; সে নৃত্যভরে পৃথিবী যেন কাঁপিতে লাগিল। নিমাই একটু নৃত্য করিয়াই অচেতন হইয়া আছাড় খাইয়া, ভূমিতলে পড়িলেন। আর শচী হাহাকার করিয়া রোদন করিতে করিতে নিমাইকে ধরিতে গেলেন। "বাছার আমার হাড়-গোড় ভাঙ্গিয়া গেল, তোমরা কীর্ত্তনে ক্ষান্ত দাও," ইহাই ভক্তগণের নিকট শচী নিবেদন করিলেন। নিমাই আবার উঠিয়া বসিলেন, আর তাঁহার অস্থি ভাঙ্গে নাই দেখিয়া, জননী শান্ত হইলেন। তখন শচী ভক্তগণকে অতি কাতরভাবে কহিতেছেন "তোমরা নিমাইকে ঘিরিয়া থাকিও, আর যখন ঢলিয়া পড়ে তখন সকলে তাহাকে ধরিও,—মাটিতে যেন তাহার কোমল অঙ্গ না পড়ে।" যথা:—

"থেকো রে বাপ নরহরি, চাঁদ-গৌরের কাছে।
রাধা-ভাবে গড়া তনু ধূলায় পড়ে পাছে ॥"

ক্রমে নিমাইয়ের ভাব দেহের আরও অধীন হইল এবং তাঁহার নৃত্য অতি মধুর হইতে লাগিল।

নিমাই নৃত্য করিতেন কেন? সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, যিনি পৃথিবীকে সরা জ্ঞান করিতেন, যিনি চিরদিন অন্যকে বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি নৃত্যরূপ চঞ্চলতা করিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না কেন? ইহার উত্তর আমরা কি দিব? নিমাইয়ের সহজ জ্ঞান ছিল না। নিমাই ভক্তভাবে আনন্দে নাচিতেছেন, শরীরে এত আনন্দ হইয়াছে যে, উহা শরীরে ধরিতেছে না, তাই উঠিয়া আহ্লাদে নাচিতেছেন। আপনারা কি শুনেন নাই যে, মনুষ্য অতি আহ্লাদে নাচিয়া থাকে? অতি আনন্দের একটি প্রধান লক্ষণ নৃত্য করা। নিমাইয়ের অতি আনন্দ হইয়াছে, তাই নৃত্য করিতেছেন।

নিমাইয়ের অতিশয় আনন্দ কেন হইয়াছে? শ্রীভগবানের নাম কি

গুণ-কীর্ত্তন শুনিয়া এই আনন্দ হইয়াছে। নিমাইয়ের আনন্দের পরিমাণ কি ? সে আনন্দের পরিমাণ এই যে, যে ব্যক্তি বিদ্বজ্জন-সমাজে সর্ব্বপ্রধান ও অতিশয় অভিমানী, সেই পণ্ডিত, সর্ব্বসমক্ষে; লজ্জা পরিহার করিয়া, বালকের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। নিমাইয়ের এ আনন্দে শ্রীভগবানের কি পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে শ্রবণ করুন। এটি চণ্ডীদাসের গান—

"কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
* * * *
নামের প্রতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ॥"

নিমাইয়ের নৃত্যে শ্রীভগবানের এই পরিচয় পাইতেছি যে, ভগবানের নাম শ্রবণে ভক্তগণকে আনন্দে পাগল করে, অতএব তিনি স্বয়ং কত না মধুর !

এখন পদকর্ত্তা বাসুঘোষের পদের অর্থ পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন। নিমাইয়ের গুণ বর্ণনা করিয়া বাসুদেব বলিতেছেন—

"আমার পরশমণির কি দিব তুলনা।
কলুষিত জীবগণে পরশমণির গুণে
নাচিয়া গাইয়া হৈল সোনা ॥"

পরশমণি কাহাকে বলি, না যাহার পরশে লৌহ সোনা হয়। এই নিমাই আমার পরশমণি. যেহেতু নিমাইয়ের পরশ দ্বারা, লৌহ সদৃশ কঠিন ও মলিন জীব সোণার ন্যায় সুন্দর ও উজ্জল হইতেছে। সাধুগণ চিরকালই এইরূপ লৌহরূপ জীবকে সোনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা লৌহকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সোনা করেন,আর তারপর পোড়াইয়া নির্ম্মল করেন। কিন্তু বাসুদেব ঘোষ বলিতেছেন যে, "পরশমণির স্বরূপ যে আমার নিমাইচাঁদ,

তিনি জীবকে দুঃখ না দিয়া, অর্থাৎ উপবাস, কঠোর সাধনা, তপস্যা প্রভৃতি না করাইয়া, নাচাইয়া ও গাওয়াইয়া, অর্থাৎ আনন্দে নিমগ্ন করিয়া, সোনা করিতেছেন।”

শ্রীভগবান্ আনন্দময়, সুতরাং নৃত্যকারী; তিনি যেমন আনন্দময়, তাঁহার সেবাও তেমনি সুখময়; ইহা জীবগণ নিমায়ের কাছে শিখিল। বাসুঘোষ ইহাই বলিতেছেন, আর কিছু নয়।

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই শুষ্ক মহাজ্ঞানী পুরুষ, হঠাৎ নিমাইয়ের নিকট কৃপা পাইয়া, তাঁহাকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যেমন স্পর্শমণি যে পর্য্যন্ত লৌহকে সুবর্ণ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারে না; সেইরূপ যখন গৌরচন্দ্র তাঁহার লৌহের ন্যায় কঠিন অন্তর গলাইয়া তাঁহাকে সোনা করিলেন, তখন সার্ব্বভৌম বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীনিমাই তাঁহার ভগবান্ ও হৃদয়স্পর্শমণি।

সেই যে নিমাই উদ্দণ্ড ও মধুর নৃত্য করিয়াছেন, তাঁহার নিকট শিখিয়া বৈষ্ণবগণ ও অন্য লোকে কখনও কখনও সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিয়া থাকেন। তবে নিমাই আনন্দে নৃত্য করিতেন, এখন অনেকে নৃত্য করিয়া আনন্দ ভোগ করেন। অর্থাৎ নিমাইয়ের অগ্রে আনন্দ পরে নৃত্য, এখনকার অনেকের অগ্রে নৃত্য পাব আনন্দ। নিমাই যখন মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

এখন যেরূপ সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে, তখন সেরূপ ছিল না। এখন বৈষ্ণবগণ নিমাইয়ের কিংবা নিতায়ের লীলা-গান করিয়া নৃত্য করেন, যথা—

“হরি ব’লে আমার গৌর নাচে।”

কিম্বা—“সুরধুনী তীরে হরি বলে কে। বুঝি প্রেম-দাতা নিতাই এসেছে॥”

অবশ্য তখন এ সব কিছুই ছিল না। তখনকার সংকীর্ত্তন কেবল নাম-গান, যথা “হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।”

এইরূপ গীত হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে খোলবাদ্য এবং করতাল ও মন্দিরায় তাল দেওয়া হইতেছে। অমনি নিমাই আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, আর ভক্তগণও আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিমাই দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর মুখে কেবল "হরিবোল" "হরিবোল", কি শুধু "বোল" "বোল" বলিতেছেন। ক্রমে গান থামিয়া গেল, আর সকলে বাদ্যের সহিত "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলের পায়েই নুপুর—ইহাতে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হইতেছে। কেহ আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, কেহ কাহার পায়ে ধরিতেছেন, কেহ-বা ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন।

নানাবিধ উপকরণের সহিত উত্তম সঙ্গীত ও বাদ্যাদি করিয়াও লোকে এখন নৃত্য করিবার মত আনন্দ পান না। আর তখন তাঁহারা,—নিমাই ও তাঁহার পার্ষদগণ,—কিরূপে শুধু 'নামে' আনন্দ পাইতেন? তাহার উত্তর—নিমাইয়ের কৃপা। নিমাইয়ের সঙ্গিগণ নিমাইয়ের প্রদত্ত আনন্দ উপভোগ করিতেন।

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শত শত লোকে নৃত্য করিতেছেন, আর মৃদঙ্গ করতাল বাজাইতেছেন। কেহ-বা "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতেছেন, কেহ-বা রোদন করিতেছেন, কেহ-বা গড়াগড়ি দিতেছেন, আবার কেহ-বা মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। কে কার উদ্দেশ লয়?—সকলেই বিভোর। এদিকে ঘরের ভিতর রমণীগণ হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতেছেন, আবার কখন-বা উন্মত্ত হইয়া "হরি হরি" বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। বাহিরে ভক্তগণের যেরূপ ভাব হইতেছে, ঘরের ভিতর রমণীদিগেরও সেইরূপ ভাব হইতেছে। প্রভাত হইলে, সুখের নিশি পোহাইল বলিয়া সকলে মহা দুঃখিত হইয়া সংকীর্ত্তন ভঙ্গ করিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। এইরূপে প্রত্যহ নিশি-যাপন হইতে লাগিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

গৌর না হ'ত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা, প্রেম-রস-সীমা, জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা, বিপিন মাধুরী, প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী, রসের আরতি, শকতি হইত কার॥
গাও গাও পুন, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল করিয়া মন॥
এ ভব সাগরে, এমন দয়াল, না দেখি একজন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেল গলিয়া, কেমনে সেধেছে সিধি।
বাসুদেব হিয়া, পাষাণে মিশিয়া, গড়েছে কোন্-বা বিধি॥

ভক্তগণ তখন একটী অপরূপ জ্ঞান লাভ করিলেন। সেটী এই যে, "কৃষ্ণ-প্রেম" একটী কল্পিত দ্রব্য নয়, ইহা মন্ত্রের ন্যায় অতি তেজস্কর সামগ্রী। আর নিমাই ইচ্ছা করিলেই ইহা জড়-দ্রব্যের ন্যায় অন্যকে বিলাইতে পারেন। তখন ভক্তগণ নিমাইয়ের নিকট প্রেম-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন কি, এক দিবস শচী নিমাইকে বলিতেছেন, "বাপু! তুমি যেখানে যাহা পাও আমাকে আনিয়া দাও। আমি শুনিলাম, তুমি গয়া হইতে কৃষ্ণপ্রেম আনিয়াছ, কই তা তো মাকে একটু দিলে না?" নিমাই বলিলেন, "মা, তুমি বৈষ্ণব-কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম পাইবে।"

গদাধর নিমাইয়ের দিবানিশির সাথী। তিনি দিবানিশি নিমাইয়ের সেবা করেন। নিমাইয়ের বিছানা করেন, পান সাজিয়া দেন, বায়ু ব্যজন করেন, পদতলে শয়ন করিয়া থাকেন! সুতরাং গদাধর, কাজের গতিকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পরম শত্রু। গদাধর কেবল আজ্ঞাপালন করেন, নিমাইয়ের

দিকে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস পান না। গদাধরের মনে বড় একটা সাধ রহিয়াছে, তিনি নিমাইয়ের নিকট কৃষ্ণপ্রেম চাহিয়া লইবেন। কিন্তু বলিতে সাহস হয় না।

একদিন কীর্ত্তনান্তে শেষ রাত্রে উভয়ে শয়ন করিলেন ; তখন গদাধর সাহস করিয়া নিমাইয়ের পা ধরিয়া কান্দিয়া পড়িলেন। "গদাধর কান্দ কেন ?" বলিয়াই, নিমাই উঠিয়া বসিলেন। গদাধর ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "ত্রিজগৎ উদ্ধার হইয়া গেল, আমি কি একাই কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত থাকিব ?" তাহাতে নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমিও পাইবে। কল্য প্রত্যুষে তুমি যেই গঙ্গাস্নান করিবে, অমনি কৃষ্ণপ্রেম পাইবে।" গদাধরের আনন্দে আর নিদ্রা হইল না। ভোরে গঙ্গাস্নান করিলেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—"অতি হৃষ্ট মনে স্নান করি গঙ্গাজলে।

"প্রেমায় অবশ তনু টল মল করে॥"

প্রভুর পিঁড়ায় বসিয়া ভক্তগণ দেখিতেছেন, গদাধর টলিতে টলিতে আসিতেছেন। নয়ন কান্দিয়া কান্দিয়া অরুণ বর্ণ হইয়াছে, অথচ প্রেমধারা মুখ বাহিয়া পড়িয়া বুক ভাসিয়া যাইতেছে। গদাধর আসিয়া গলায় বসন দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে শির লোটাইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিতেছেন, "গদাধর, পাইয়াছ ত ?" গদাধর নয়ন-জলে প্রভুর চরণ ধৌত করিয়া তাহার উত্তর করিলেন,—মুখে কিছু বলিলেন না। এইরূপে গদাধর প্রেম পাইলেন। যখন নিমাই নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন, তখন গদাধরের হস্ত ধরিয়া যান। গদাধর অমনি আনন্দে এলাইয়া পড়েন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী গঙ্গাতীরে ও নিমাইয়ের বাড়ীর নিকট। নিমাই বাল্যকাল অবধি সেই স্থানে যাতায়াত করিতেন, তখনও করেন। শুক্লাম্বর মহাতপস্বী, নিমাইকে পুত্রের ন্যায় সেবা করেন। নিমাইয়ের নয়ন মুছাইয়া দেন, নাসিকার ধারা আপন হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া

দেন, অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া দেন, ইত্যাদি। ক্রমে শুক্লাম্বর বুঝিলেন, এ যাবৎ তাঁহার কাল বিফল চেষ্টায় গিয়াছে ; প্রেমই পরম-পদার্থ, আর নিমাই উহা দিতে পারেন। তখন একদিবস কাতর হইয়া শুক্লাম্বর শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রেম-ভিক্ষা চাহিলেন। বলিতেছেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি আমি।
অনেক যন্ত্রণা দুঃখ কিছুই না জানি॥
মধুপুরী দ্বারাবতী কৈলু পর্য্যটন।
দুঃখিত হইনু মুঞি, দেহ প্রেমধন॥

শুক্লাম্বর বড় তপস্বী ও অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন বলিয়া, প্রেম পাইবার উপযুক্ত, এইরূপ দম্ভের সহিত প্রেম-ভিক্ষা করায়, প্রভু উত্তর করিতেছেন, "দ্বারাবতী ও মধুপুরে কি কুক্কুর শৃগাল নাই ?" যথা চৈতন্যচরিত কাব্য, ৬ষ্ঠ সর্গ—

"কিং তত্র সন্তি ন শৃগালচয়াস্ততঃ কিম্
তেষাং ভবেৎ কিমথ তে ন পুনঃ শৃগালাঃ।
ইত্যুক্ত বত্যথ বিভৌ দ্বিজপঙ্গুবোঽয়-
মুচ্চৈঃ পপাত ভুবি দণ্ডবদুৎসুকাত্মা ॥৮॥"

এই কথা শুনিয়া শুক্লাম্বর তাঁহার দোষ বুঝিয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া নিমাই কি করিলেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"অনুগত আর্ত্তি প্রভু সহিবারে নারে।
করুণ অরুণ ভেল গৌর কলেবরে॥
'প্রেম দিনু' 'প্রেম দিনু' ডাকে আত্মনাদে।
শুক্লাম্বর দ্বিজ পাইল প্রেম পরসাদে॥
ততক্ষণ হৈল প্রেম কম্প-কলেবর।
পুলকিত অঙ্গে বহে নয়নের ধার॥"

এই সময় শুক্লাম্বরের স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, তিনি ভিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ; ঝুলিতে ধান মিশ্রিত খুদ ও তণ্ডুল। শুক্লাম্বর প্রেম পাইয়া আনন্দে সেই ঝুলি স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া নিমাই এবং অপর সকলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। নিমাই তাঁহার ঝুলি হইতে সেই ধান-মিশ্রিত তণ্ডুল লইয়া খাইতে লাগিলেন। তখন শুক্লাম্বর "মনু মনু, ইহাতে ধান," বলিয়া নিমাইয়ের হাত ধরিলেন।

এইরূপে জনে জনে নিমাইয়ের ইচ্ছামাত্র প্রেমধন পাইতে লাগিলেন, আর কীর্ত্তনের দল ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

এদিকে শ্রীনবদ্বীপে মহা-গণ্ডগোল উপস্থিত। শ্রীবাস-ভবনে গীতবাদ্য প্রভৃতি কলরব শুনিয়া, সকল লোক দেখিতে শুনিতে আসিতেছেন। কিন্তু প্রাচীরের দ্বার বন্ধ, আর সেখানে একজন ভক্ত (গঙ্গাদাস) রক্ষা করিতেছেন। সংকীর্ত্তন আরম্ভের পূর্ব্বেই দৃঢ় করিয়া দ্বার বন্ধ করা হইয়াছে। যাঁহারা অগ্রে আসিয়াছেন, তাঁহারাই প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা পরে আসিয়াছেন, ভক্ত বা নিমাইয়ের নিতান্ত নিজ জন হইলেও তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারাই অগ্রে আসিতেন, আর যদি কার্য্যগতিকে কেহ সময়ে আসিতে না পারিতেন, তবে তিনি মোটেই আসিতেন না।

কীর্ত্তনের কলরব শুনিয়া বাহিরের লোক দেখিতে আসিয়াছে, এবং দ্বার বন্ধ দেখিয়া, "দুয়ার খোল" বলিয়া সজোরে আঘাত করিতেছে। কিন্তু কেহ তাহাদের উদ্দেশ্যও লইতেছেন না। তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরের মহা-কলরব শুনিতেছে। এই কাণ্ড প্রত্যহই হইতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, এই সমুদায় বাহিরের লোকে অবশ্য ক্রুদ্ধ হইতেছে ও "এ ব্যাপার কি ?" বলিয়াই নানাবিধ চর্চ্চা করিতেছে। ক্রমে অনেকে নানাবিধ কুৎসাও রটাইতে লাগিল। যাঁহারা জানিতে

পারিলেন যে, বাড়ীর মধ্যে সংকীর্ত্তন হইতেছে, তাঁহারা বলিলেন যে, এ আবার কিরূপ ভজন? নাচিয়া গাহিয়া ভজন করা কখন ত শুনি নাই। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীভগবান্ হৃদয়ে আছেন, লোক দেখাইয়া না ডাকিয়া মনে মনে তাঁহাকে ডাকিলেই ত হয়? কেহ কেহ বলিলেন, ভগবান্ নিদ্রিত অবস্থায় হৃদয়ে আছেন, তাঁহাকে অমন করিয়া জাগাইলে তিনি ক্রোধ করিবেন, এবং ভগবানেব ক্রোধ হইলে আর ধান্য হইবে না, কাজেই লোক সব না খাইয়া মরিয়া যাইবে। আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল, নিমাইপণ্ডিত আগে ভাল ছিল, এখন আবার নূতন মত চালাইতে লাগিল নাকি? কতকগুলি লোক বলিতে লাগিল যে, নদীয়া নগরে অন্য মত আর চালাইতে হয় না; বিশেষতঃ মুসলমান রাজা, তাহারা এ কথা শুনিলে গ্রাম লুট করিবে। তাহাতে কেহ কেহ বলিল, এত গণ্ডগোলের প্রয়োজন কি? সকলে মিলিয়া এই মাতালগুলির ঘরদ্বার ভাঙ্গিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। আর একজন বলিল, চল কল্যই কাজির কাছে যাইয়া বেটাদের জব্দ করা যাউক। একজন পরমপণ্ডিত ও পরমজ্ঞানী বলিলেন,—যেখানেই গোপন, সেখানেই জানিবে অপরাধ। যখন ইহারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোপনে এই সকল কাজ করিতেছে, তখন ইহারা নিশ্চয়ই কুকাণ্ড করিতেছে। যদি ইহাদের সদভিপ্রায় থাকিবে, তবে গোপন করিবে কেন? কেহ বলিল, ইহারা মদ্যপায়ী তান্ত্রিক, মদ্য মাংস ও স্ত্রীলোক লইয়া নানাবিধ কুকর্ম্ম করে, আর জাতি যাইবার ভয়ে এই সমস্ত কাণ্ড গুপ্তভাবে করিয়া থাকে।

তাহার পর কেহ কেহ অঙ্গের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া কাজির কাছে গিয়া নালিশ করিল। তাহাদের নালিশের মর্ম্ম এই যে, নিমাই পণ্ডিত কতকগুলি সঙ্গী লইয়া হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে। ইহারা প্রথমতঃ উচ্চৈঃস্বরে "হরি" বলিয়া ডাকে। ইহাতে যে শ্রীভগবান্ হৃদয়ে নিদ্রিত

আছেন, তিনি জাগরিত হইবেন, আর জাগিলেই তাঁহার রাগ হইবে, এবং তাঁহার রাগ হইলেই দেশের সর্ব্বনাশ, লোকে "হা অন্ন, হা অন্ন" করিয়া মারা যাইবে। কাজি উত্তর করিলেন যে, তিনি কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিবেন।

মাঘ মাসে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, ফাল্গুন মাসে প্রকৃত প্রস্তাবে কীর্ত্তন হইতেছিল। চৈত্র মাসের শেষে এই কীর্ত্তন লইয়া সমস্ত গৌড়দেশবাসী চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। ক্রমেই নিমাইয়ের দল প্রবল হইতে লাগিল। ক্রমেই বড় বড় লোক সেই দলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন এই কীর্ত্তন লইয়া এত গোলযোগ হইয়াছে যে, কুলোকে জনরব তুলিল যে গৌড়ের বাদসা হোসেন সা, নিমাই পণ্ডিত ও তাঁহার পার্ষদগণকে ধরিবার জন্য সসৈন্যে নৌকাপথে একজন সেনাপতি পাঠাইতেছেন। আর এই কথা অনেকে বিশ্বাসও করিল। ক্রমে জনরব পরিস্ফুটিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল। লোকে বলিতে লাগিল যে, যবন-সৈন্য গঙ্গা বাহিয়া, নিমাই পণ্ডিত ও তাঁহার অনুচরগণকে ধরিতে আসিতেছে। এই কথা লইয়া সমস্ত নবদ্বীপে আন্দোলন হইতে লাগিল। নিমাইয়ের সঙ্গিগণ এই কথা শুনিলেন, কেহ কেহ ভয়ও পাইলেন ও বলিতে লাগিলেন, "সংকীর্ত্তন ঘরে বসিয়া আপনা আপনিই করা ভাল। শত শত জন জুটিয়া লোকের বিরক্তিভাজন হইয়া সংকীর্ত্তন করার প্রয়োজন কি ?"

এই জনরব নিমাইও শুনিলেন। কিরূপে শুনিলেন বলিতেছি। নিমাই তখন একটু স্থির হইয়াছেন, বাহিরে আসিয়া তখন সহচরগণ সঙ্গে বৈকালে নগর ভ্রমণ কি গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া থাকেন। নিমাইয়ের বয়স তখন তেইশ বৎসর, রূপ আরও প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি পট্টবস্ত্র অথবা অতি সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিয়া বেড়াইতেছেন। সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে লিপ্ত, মুখে তাম্বুল। নির্ম্মল আনন্দময় মুখ প্রেমে টলটল করিতেছে। ভাল লোকের সহিত দেখা হইলে দু একটি কথা

বলেন, মন্দ লোক দেখিলে দূরে দূরে থাকেন। তবু কেহ কেহ তাঁহাকে কখন কখন বিরক্তও করে। একদিন একজন অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত! তুমি যে স্বচ্ছন্দচিত্তে বেড়াইতেছ? তুমি কি শুন নাই? যাহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছে, তাহারাই বলিতেছে যে, যবনসৈন্য আগতপ্রায়। আর তাহারা অগ্রে তোমাকেই ধরিবে। তুমি বুদ্ধিমান, তোমার কর্ত্তব্য এই গ্রাম ছাড়িয়া দূরদেশে পরিবার লইয়া পলায়ন করা।" যে অধ্যাপক নিমাইকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য নিমাইয়ের উপকার করা নয়, তাঁহাকে একটু ভয় দেখান মাত্র। নিমাই যে এত ভয়ের কথা শুনিয়াও নির্ভয়ে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা দেখিয়া কোন কোন দুষ্ট লোকে ঈর্ষান্বিত হইয়া যাহাতে নিমাই ভয় পান, সেইরূপ কথা বলিত।

নিমাই সেই অধ্যাপককে সম্বোধন করিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ মহাশয়! আমাকে ধরিতে আসিতেছে, একথা আমিও শুনিয়াছি। কিন্তু পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব? সমস্ত দেশই ত রাজার। আর পলাইব বা কেন? দেখুন মহাশয়! অতি অল্প বয়সে আমি পাঠ সমাপ্ত করিয়াছি। এই নবদ্বীপে আমাকে কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। যদি রাজা আমাকে লইয়া যান তাহা হইলে আমার নাম জগৎময় প্রচার হইবে, আর তাহা হইলে আমি কি পড়িলাম শুনিলাম তাঁহার কাছে পরিচয় দিব। রাজা সম্মান করিলে, আপনারাও তখন আমাকে সম্মান করিবেন।"

অধ্যাপক বলিলেন, "তুমি বল কি? রাজা যবন, সে তোমার শাস্ত্রের কি ধার ধারে? সেখানে চালাকি খাটিবে না, ধরিয়া লইয়া যাইবে, এবং একটা অনর্থ করিবে। আমি তোমাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছি, তুমি এখনি পালাও।"

নিমাই বলিলেন, "রাজা গৌড় হইতে সৈন্য পাঠাইয়া আমাকে লইয়া

যাইবেন, আমি এ ভাগ্য কেন ছাড়িব?" অধ্যপক নিমাইকে ভয় দেখাইতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া ইহাই বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন, "দেখা যাবে, আগে সৈন্যগুলো আসুক, তখন কত অহঙ্কার বুঝা যাইবে।" যখন ভাল-লোকে এই ভয়ের কথা উল্লেখ করেন, তখন নিমাই অল্প অল্প হাস্য করেন, কিছুর উত্তর করেন না। নিমাইয়ের এমনি তেজ যে তাঁহার নিকটে যাইয়া কথা কাটাকাটি করে, ভক্ত কি অভক্ত, কাহারও এরূপ সাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীবাস প্রভৃতি নিমাইয়ের নিজ জনেরাও মনে মনে ভয় পাইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কলিঘোর তিমির গরাসিল ত্রিজগত
ধরম করম গেল দূর
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলায়ল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।—বাসুদেব ঘোষ।

বৈশাখের শেষে কি জৈষ্ঠের প্রথমে, এক দিবস বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে, শ্রীবাস তাঁহার ঠাকুরঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া, তাঁহার ভজনীয় বস্তু শ্রীনৃসিংহদেবের ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে কে আসিয়া ঠাকুর ঘরের পিঁড়ায় উঠিয়া, তাঁহার দ্বারে আঘাত করিয়া বলিল, "শ্রীবাস! শীঘ্র দ্বার খোল।" শ্রীবাস একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" তাহাতে বাহিরের লোক উত্তর করিলেন, "তুমি যাহাকে ধ্যান করিতেছ।" এই কথা শুনিয়া শ্রীবাস কতক বিরক্ত, কতক কৌতূহলী হইয়া দ্বার উদঘাটন করিয়া দেখেন যে—নিমাই পণ্ডিত। তখন নিমাই পণ্ডিত, ঠাকুর

ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বিষ্ণুখট্টায় যে শালগ্রাম ছিলেন, তাহা একপার্শ্বে সরাইয়া আপনি উহার উপর বসিলেন। নিমাইপণ্ডিতকে দেখিয়া, শ্রীবাস একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কারণ তিনি দেখিতেছেন যে, নিমাই-পণ্ডিত যদিও সর্ব্ব অবয়বে ঠিক নিমাইপণ্ডিতই আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এত তেজ বাহির হইতেছে যে, উহা সূর্য্যের তেজকে খর্ব্ব করিতেছে। শ্রীবাস স্তম্ভিত! কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তখন নিমাইপণ্ডিত বলিলেন, "শ্রীবাস! আমি আসিয়াছি। তুমি আমাকে অভিষেক কর।"

নিমাইকে দেখিয়া, এই "আমি" যে শ্রীভগবান্ শ্রীবাস তাহাই বুঝিলেন। শ্রীবাসের অবস্থা এখন স্থিরচিত্তে বিবেচনা করুন। শ্রীবাস দেখিতেছেন যে, তাঁহার সম্মুখে শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ যাঁহার সম্মুখে তাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে এবং সমুদায় বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। সমুদায় বাসনা পূর্ণ হইলে, সে হতভাগ্যের মরণ বাঁচন সমান হইয়া যায়। এইজন্য জীবের মঙ্গল কামনা করিয়া, শ্রীভগবান্ জীবের নিকট দুর্ল্লভ হইয়া আছেন। আর যদি কখন দর্শন দেন, তবে জীবগণ যাহাতে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, তাহার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

এ বিষয় আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। বড় লোকের কথা শুনিলে প্রথমে লোকে উহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মরণ সম্ভব, এবং অধিক পরিমাণে পারিলে, সে তখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। শুনিবামাত্র লোকে উহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না, তাহার অনেক কারণও আছে। প্রথমতঃ শুনিবামাত্র অনেক পরিমাণে সংজ্ঞা লোপ পায়। দ্বিতীয়তঃ শুনিবামাত্র অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না।

যেমন, লোকে যদি শ্রবণ করে যে তাহার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে, তবে

সে অনেক সময় ভাবে ইহা মিথ্যা কথা। অধিক আনন্দের উদয় হইলেও (আর শ্রীভগবদ্দর্শন অপেক্ষা জীবের অধিকতর আনন্দ হইতেই পারে না) ঠিক ঐরূপ অবস্থাই হয়। ইহাতে কাহার মৃত্যু, না হয় মূর্চ্ছা, না হয় কিয়ৎ পরিমাণে সংজ্ঞা লোপ হয়। শ্রীবাস যখন মনে বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান্ সম্মুখে, তখন আনন্দে তাঁহার অনেকটা সংজ্ঞা লুপ্ত হইল। আবার বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানা তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। ভাবিতেছেন, "শ্রীভগবান্? একি সম্ভব? কখনই না। এ আমি স্বপ্ন দেখিতেছি।" আবার ভাবিতেছেন, "এই যে সম্মুখে, ইনি কে? আর আমিই বা কে? আমি কি শ্রীবাস? ইনি কি সেই ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর ধন? এই যে সন্দেহ ইহা জীবমাত্রের মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। ইহা পরম-উপকারী ধন, ইহাতেই জীব শ্রীভগবান্‌কে আস্বাদ করিবার অবকাশ পায়। নীল-কাঁচে যেরূপ সূর্য্যদর্শন আয়ত্তাধীন হয়. সেইরূপ অবিশ্বাসে শ্রীভগবানের তেজ লঘু করিয়া তাঁহাকে জীবের দর্শন সম্ভব করে। অতএব যাঁহার অবিশ্বাস আছে, তিনি অভাগ্যবান নহেন। জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে অবিশ্বাস দিয়াছেন। যেমন নরম মাটিতে খুঁটি প্রোথিত করা ও উত্তোলন করা সহজ, তেমনি যাহাদের শীঘ্র বিশ্বাস হয়, তাহাদের সেইরূপ শীঘ্র বিশ্বাস যায়। এ সমুদায় রহস্যের তাৎপর্য্য পাঠক ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীবাস এইরূপে ভাব-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অধিকক্ষণ এ অবস্থায় থাকিতে হইল না। যেহেতু তাঁহার প্রতি অভিষেকের আজ্ঞা হইয়াছে, আর শীঘ্র সেই আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত তখনি চীৎকার করিয়া নিজ সহোদরগণকে, বাড়ীর মহিলাগণকে ও দাস-দাসীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহারা আসিলে শ্রীবাস বলিলেন, "শ্রীভগবান্

আসিয়াছেন, তাঁহাকে অভিষেক করিতে হইবে। তোমরা শীঘ্র নূতন কলসী ক্রয় করিয়া, একশত ঘট গঙ্গাজল লইয়া আইস।” ইহা শুনিয়া বাড়ীর সকলে পাগলের মত হইয়া গঙ্গায় জল আনিতে ছুটিলেন। নিমাই বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট আছেন, আর শ্রীবাস করযোড়ে তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে গদাধর প্রভৃতি দু একটি ভক্ত সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া আসিলেন। আর গঙ্গাজলপুর্ণ একশত ঘট শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ক্রমে সারি সারি রাখা হইল। শ্রীবাসের বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ কিরূপে জল বহিয়া আনিতেছেন, তাহা প্রেমদাসের অনুবাদিত চন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

“গৌরাঙ্গের কথা পথে চলে কয়ে কয়ে।
কহিতে আনন্দ ধারা বহে নেত্র দিয়ে॥
খসিয়ে পড়য়ে বেণী তাহা না সম্বরে।
কপোল রোমাঞ্চ গাত্র কম্প ভাব ভরে॥”।

শ্রীবাসের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এই অভিনব অবস্থাটী হঠাৎ আসিয়াছিল এরূপ নহে। এরূপ একটা কিছু হইবে তাহা তাঁহারা পূর্ব্বাবধি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দিবানিশি তাঁহারা শ্রীনিমাইয়ের সঙ্গগুণে প্রেম-হিল্লোলে ভাসিতেছিলেন। শ্রীভগবান্ যে অতি প্রিয়জন এবং তিনি যে অতি নিকটে, এমনকি আগতপ্রায়, এরূপ ভাবে তখন সকলে অভিভূত। শ্রীনিমাই সেই ভগবান্ কিনা, সকলে ইহা মনে মনে তর্ক করিতেছিলেন। এইরূপ অবস্থায় সকলে শুনিলেন যে শ্রীভগবান্ আসিয়াছেন, এবং তিনি আর কেহ নহেন—শ্রীনিমাই; সকলে মনে মনে যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন সম্পূর্ণভাবে তাহাই হইল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম, দুই প্রহর বেলা, আঙ্গিনার মধ্যস্থলে শ্রীপ্রভু

প্রশস্ত পিঁড়ির উপরে বসিলেন ও তাঁহার মস্তকে শত শত কলস জল ঢালা হইল। যাঁহারা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই পাগলের মত হইয়াছেন। কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই। যিনি পারিতেছেন, তিনিই জলের কলসী লইয়া মহাপ্রভুর মস্তকে ঢালিতেছেন। নিমাইয়ের অঙ্গ ধুইয়া যে জল বাহিয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাঁহার অঙ্গের তেজ মিশিয়া গিয়াছে। সেই জল আঙ্গিনাময় হইয়া সোণার জলের ন্যায় ঝলমল করিতেছে। অতি সূক্ষ্ম ও শুভ্র বস্ত্র দ্বারা তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জিত হইল। তাহাতে ঐ বস্ত্রে কিরণকণা লাগিয়া উহা কিঙ্খাপের ন্যায় ঝলমল করিতে লাগিল। তাহার পর তাঁহাকে সূক্ষ্ম ও শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া আবার ঠাকুর-ঘরে আনা হইল।

ঠাকুর-ঘরে আসিয়া তিনি পুনরায় বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন। ঠাকুর-ঘর বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল। তিনি দ্বার বন্ধ করাইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন, আর ভক্তগণ কেহ পিঁড়ায়, কেহ বা আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলেই দেখিতে লাগিলেন যে, সেই ঘর তেজোময় হইয়া গিয়াছে এবং সেই ঘরের বেড়ার সমস্ত ছিদ্র দিয়া তেজ বাহির হইতেছে। যথা,—কবিকর্ণপুর লিখিত চৈতন্যচরিত মহাকাব্য, ৫ম সর্গে—

> "অপ্রাপ্যাবসরমমুষ্য বেশ্ম মধ্যে।
> তেজোভির্বহিরপি সন্ধিভির্ব্যভেদি ॥৫০॥"

সেই তেজের কত শক্তি তাহা ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, জ্যৈষ্ঠ মাসের দুই প্রহরের রৌদ্রের তেজকেও উহা খর্ব্ব করিয়াছিল। একটু পরে যাঁহারা বাহিরে ছিলেন, তাঁহারা ঐ গৃহের মধ্য হইতে মুহুর্মুহু মুরলী-ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন এবং বাহির হইতে এই সুধা পান করিতে করিতে সুখে একেবারে জড়বৎ হইলেন। এমন সময় গৃহাভ্যন্তর হইতে শ্রীনিমাই "শ্রীবাস" বলিয়া ডাকিলেন। নিমাই ইহার পূর্ব্বে শ্রীবাসকে কখনও এরূপ স্বরে নাম ধরিয়া ডাকেন নাই।

শ্রীবাস ঘরে প্রবেশ করিলে নিমাই বলিতেছেন, "শ্রীবাস! তোমার গৃহে আমার স্থান কর আমি তোমার গৃহে যাইব।" এই আজ্ঞা শুনিয়া সকলে মহাব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস শ্রীগদাধরকে বলিলেন, "তুমি বিষ্ণুখট্টা আমার ঘরে লইয়া আইস।" নিমাই খট্টা হইতে নামিয়া অন্য আসনে বসিলেন, আর সেই খট্টা শ্রীবাসের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

শ্রীবাসের ভ্রাতাগণ সেই গৃহের ভিতর চাঁদোয়া খাটাইলেন, ও সেই খট্টার উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতিলেন। আর ঘরে সূর্যতেজ না যাইতে পারে এইজন্য দ্বারে পর্দ্দা দিলেন।

তখন শ্রীনিমাই দেবগৃহ হইতে শ্রীবাসের শয়নগৃহে গমন করিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন, প্রভু শত কোটি সৌদামিনী বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। এমন কি, সেই তেজে জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্ন-সূর্য্যতেজও লঘু হইয়া গেল। যথা, —চৈতন্যচরিত মহাকাব্য, ৫ম সর্গে—

"গৌরাঙ্গস্তদথ গৃহং ব্রজন্ বিরেজে
তেজোভির্দ্যু তিরয়ন্ বিবস্বদোজঃ।
শম্পানাং শত শতকোটিকোটিবৎ স
প্রোন্মীল্য ক্ষিতিমিব সংশ্রিতশ্চকান্তি ॥৫৭॥

প্রভু শ্রীবাসের শয়নঘরে খট্টায় বসিলে, পরম তেজে গৃহ আলোকিত হইল। বোধ হইতে লাগল, নিমাইয়ের অঙ্গ রক্তমাংস গঠিত নয়, স্বুবর্ণ বর্ণের তেজে গঠিত। সে তেজ যদিও সূর্য্যের তেজ হইতে উজ্জ্বল, তবু উহা শীতল. আর উহা নয়নানন্দ। উহার পানে চাহিলে, চক্ষু না ঝলসিয়া বরং শীতল-আনন্দ-বারিতে ডুবিয়া যায়।

তখন গদাধর শ্রীনিমাইয়ের সর্ব্বাঙ্গ ফুলে সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। ফুলের অঙ্গুরীয় গাঁথিয়া আঙ্গুলে, বালা তাড় ও বাজু গাঁথিয়া বাহুদ্বয়ে এবং মালা গাঁথিয়া গলদেশে দিলেন। আর মাথায় চূড়া বান্ধিয়া উহাতে ফুলের

মালা বেড়িয়া দিলেন। তারপর সর্ব্বাঙ্গে চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও কেশর লেপিয়া দিলেন। কেহ চামর ব্যজন, কেহ করযোড়ে স্তব, কেহ আনন্দে গড়াগড়ি, কেহ বা নিমাইয়ের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্‌কে প্রিয়-বস্তু বলিয়া ভজন করা, আর সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বদান্য পুরুষ বলিয়াও অনুভব করা যাইতে পারে। গীতায় লিখিত আছে, শ্রীভগবান্‌কে যিনি যেরূপ ভজন করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সেইরূপ ভজন করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাকে শক্তিসম্পন্ন দাতা বলিয়া ভজন কর, তিনি শঙ্খ চক্র প্রভৃতি হস্তে করিয়া বর দিতে আসিবেন; নিজ-জন বলিয়া ভজন কর, তিনি সমস্ত বিভূতি ফেলিয়া, তোমারই মত হইয়া আসিবেন; ঢাল কি তরবারী লইয়া স্ত্রী পুত্রের নিকট কেহ যায় না। আবার যে নিজ-জন সেও স্বার্থের নিমিত্ত ভজন করে না।

মনে ভাবুন, চিরবিরহিণী সতী রমণীর নিকট তাঁহার অশরণ ও হারাণ স্বামী আসিয়াছেন। তখন কি তিনি তাঁহার স্বামীকে একথা বলেন, "হে নাথ! টাকা কই, বসন কই, ভূষণ কই?" তবে তিনি কি করেন—না, গ্রীষ্মকাল হইলে বায়ু ব্যজন করেন, এবং যত্ন করিয়া তাঁহাকে ভোজন করান ও শয়ন করাইয়া পদসেবা করেন। গদাধর প্রভৃতি শ্রীভগবান্‌কে সেইরূপ সেবা করিতে লাগিলেন।

কেহ হয়ত বলিবেন, শ্রীভগবান্‌কে এরূপ তুচ্ছ সেবা কেন? হস্তে তাম্বুল দেওয়া, গলায় মালা পরান, শ্রীভগবানের সঙ্গে এরূপ বালকের খেলা কেন? কিন্তু বিবেচনা করুন, তিনি যদিও ভগবান্, কিন্তু যাহারা সেবা করে, তাহারা ত জীব? মনুষ্যের যাহা সাধ্য মনুষ্য সেই সেবা করিতে পারে বই নয়। যদি শ্রীভগবান্ কোন পক্ষীকে দর্শন দেন, আর তাঁহাকে সেবা করিতে সেই পক্ষীর ইচ্ছা হয়, তবে সে ঠোঁটে করিয়া কীড়া আনিয়া তাঁহার শ্রীবদনে অর্পণ করিবে। মনুষ্যে তাম্বল ও ফুলের মালা ব্যতীত

আর কি দিবে ? যদি বল শ্রীভগবানের সেবা কর কেন, তাঁহার অভাব কি ? স্বামীর দাস দাসী থাকিলে স্ত্রী কি তাঁহার সেবা করেন না ? প্রিয় জনকে সেবা করায় মহা আনন্দ আছে, আর তাই শ্রীভগবান্, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন হইলেও, ভক্তের সেবা লইয়া থাকেন, আর ভক্তগণও তাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন।

গদাধর প্রভৃতি সকলে এইরূপে শ্রীভগবান্‌কে সেবা করিতেছেন। তখন নিমাই বলিলেন, "আমি কে, তাহার পরিচয় পাইয়াছ ? আমি সেই, যিনি তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন। আমি জীবের দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি এবার দণ্ড না করিয়া, শুধু প্রেম ও ভক্তি দান করিয়া, সকলের দুঃখ দূর করিব,—তোমরা কোন ভয় করিও না। যবন-রাজা তোমাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

তখন শ্রীবাস, যদিও জড়বৎ হইয়াছেন. তবুও কষ্টে সৃষ্টে বলিলেন, "তুমি আমার বাড়ীতে, আমার আবার ভয় কি ? তুমি দয়াময় বলিয়া সাধু মুখে শুনিয়াছিলাম. কিন্তু তোমার যে এত দয়া পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না।" শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "যদি আমি যবন রাজার কাছে যাই, তবে তাহাকে দণ্ড করিব না, তাহার হৃদয় দ্রব্য করাইয়াতাহাকে শোধন করাইব; —কিরূপে তাহা দেখাইতেছি।" এই কথা বলিয়া শ্রীনিমাই, "নারায়ণী" বলিয়া ডাক দিলেন। নারায়ণী, শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা, বয়ঃক্রম মোটে চারি বৎসর। নারায়ণী ঘরে আসিল। সে আসিলে প্রভু তাহাকে বলিলেন, "নারায়ণী, আমার বরে তোমার কৃষ্ণপ্রেম হউক।" এই কথা বলিবামাত্র, সেই চারি বৎসরের কন্যা, "হা কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমে মৃত্তিকায় ঢলিয়া পড়িয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল. তখন শ্রীনিমাই ঈষৎ হাসিয়া বলিতেছেন, "আমি রাজার নিকট গমন করিলে তাহারও এই দশা হইবে। কিন্তু তাহার এ ভাগ্য হইতে এখনও অনেক দেরী আছে।"

যে অলৌকিক ব্যাপার হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে সেখানে যাঁহারা ছিলেন, সকলেই একেবারে দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কে কোথায় কি করিতেছেন, ঠিক করিতে পারিতেছেন না। কখন স্বপ্ন ভাবিতেছেন, কখন সত্য ভাবিতেছেন। নিমাইয়ের এই দিনকার প্রকাশ অল্পক্ষণ ছিল। এ প্রকাশের উদ্দেশ্য কেবল শ্রীবাস প্রভৃতি কয়েক জন অতি মর্ম্মী-ভক্তকে অভয় প্রদান করা, আর কিছুই নহে। সে দিবস অধিক কথাও হয় নাই।

নিমাই যখন শ্রীবাসের সহিত কথা কহিতেছেন, গদাধর তখন মুহুর্মুহু শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত যে বলিয়াছিলেন, "নিমাই কেমন বালক অল্পদিনে জানিতে পারিবে,"—সে কথা গদাধরের তখন মনে পড়িল। কিন্তু তিনি কোন কথা না বলিয়া নিমাইকে সেবা করিতেছেন। এমন সময় শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী ও তাঁহার তিন ভ্রাতার তিন স্ত্রী, এই চারিজনে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত ঘর আলো করিয়া নিমাই গৃহাভ্যন্তরে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া আছেন। দ্বারে পর্দ্দা, পিঁড়ায় ঐ চারিজন রমণী দাঁড়াইয়া, তাহার মধ্যে তিনজন নিতান্ত কুলবধূ, নিমাইয়ের সম্মুখে কখন আসিতেন না।

তাঁহারা স্ত্রীলোক বলিয়া ভয়ে ঘরের মধ্যে যাইতে পারিতেছেন না, অথচ ঘরের মধ্যে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বসিয়া! তাঁহারা উপায়হীন হইয়া তখন শ্রীবাসের সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীকান্তকে 'অতি কাতর' হইয়া বলিতেছেন, "তুমি একবার আমাদের হইয়া ঠাকুরের কাছে নিবেদন কর। আমরা স্ত্রীলোক বলিয়া কি তাঁহার চরণ দর্শন পাব না?" শ্রীকান্ত ইহার কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় পিঁড়া হইতে কাতরধ্বনি লক্ষ্য করিয়া নিমাই বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া বলিতেছেন, "যাঁহারা আমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পিঁড়ায় দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে

আসিতে পারেন,—আসিয়া দর্শন করুন।" এই আজ্ঞা পাইয়া সেই কুলবতীগণ ব্যগ্র হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হর্ষ, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি নানাবিধ ভাবে জড়ীভূত ও অভিভূত হইয়া, তাঁহারা মস্তক উঠাইলেন এবং অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন হইতে শ্রীনিমাইয়ের চন্দ্রবদন দর্শন করিতে লাগিলেন। একটু দর্শন করিয়া ভক্তিতে গদগদ হইলেন ও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া শ্রীচরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। তখন শ্রীনিমাই কৃপার্দ্র হইয়া তাঁহাদের বেণী ও সুবর্ণালঙ্কারভূষিত মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক।" যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্য, ৫ম সর্গে—

আবিশ্য প্রকটিত সৎ প্রকাশ রম্যং
তং দৃষ্ট্বা মুদমতুলামভূত পূর্ব্বাং।
সংপ্রাপুর্ভুবি চ নিপেতুরাত্ততোষা
স্তৎপাদাম্বুজমপি নির্ভবং প্রপন্নাঃ ॥৭২ ॥
মচ্চিত্তা ভবতঃ সদেত্যভীক্ষ্ণ যুক্তা
সর্ব্বাসাং শিরসি পদারবিন্দ যুগ্মং।
কারুণ্যামৃত রস সেচনাতি সার্দ্রঃ
শ্রীগৌরঃ পরমগুণাম্বুধির্ব্যধত্ত ॥৭৩॥

ইহার অর্থ এই—

অনন্তর তাঁহারা প্রবেশপূর্ব্বক প্রকটিত সৎ প্রকাশ দ্বারা রম্যমূর্ত্তি গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া অতুল ও অভূতপূর্ব্ব হর্ষ লাভ করিলেন এবং পরিতোষ প্রাপ্তি হেতু তদীয় চরণারবিন্দে প্রপন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ৭২ ॥

অনন্তর "তোমরা সকলে মৎ পরায়ণা হও" এই বলিয়া মহাগুণনিধি

শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ সকল স্ত্রীগণের প্রতি কারুণ্যামৃতরস সেচন করতঃ আর্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাদের মস্তকে পাদপদ্ম সমর্পণ করিলেন। ৭৩ ॥

নিমাইচাঁদ পরমসুন্দর নবীন-পুরুষ। তিনি কুলবতীগণকে বলিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক।" ইহা বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। কুলবতীগণও ইহা শুনিয়া কুণ্ঠিত হইলেন না, তাঁহাদের স্বামিগণও শুনিয়া ক্রোধ করিলেন না। কারণ, যাহার সহিতই যেরূপ সম্বন্ধ হউক না কেন, শ্রী ভগবানের সহিত যত নিকট সম্বন্ধ, অত আর কাহারও সহিত নয়।

একটু পরে শ্রীনিমাইচাদ বিষ্ণুখট্টা হইতে "আমি এখন যাই, উপযুক্ত সময়ে আবার আসিব" বলিয়া উঠিলেন ও হুঙ্কার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন হাহাকার করিয়া সকলে তাঁহাকে ধরিলেন। তাঁহারা দেখেন যে, জীবনের চিহ্নমাত্র নাই। অনেক চেষ্টায় নিমাই চেতন পাইলেন। তখন তিনি ঠিক নিমাই পণ্ডিত, অন্য মনুষ্যের মত, সে তেজ আর নাই। সম্পূর্ণ চেতন পাইয়া নিমাই শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! আমি এখানে কিরূপে আসিলাম? আমি কি নিদ্রা গিয়াছিলাম? আমি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম? পণ্ডিত কৃপা করিয়া বল, আমি ত কোন চাঞ্চল্য করি নাই?" শ্রীবাস, শ্রীরাম ও গদাধর মুখ চাওয়া-চাওরি করিতে লাগিলেন; আর সকলে বলিলেন, "না. কিছু চাঞ্চল্য কর নাই।" নিমাই তখন ধীরে ধীরে গৃহে গমন করিলেন।

পূর্ব্বে উপবীত সময়ে একবার নিমাই তাঁহার জননীকে বলিয়াছিলেন, "আমি এখন যাই, পরে আসিব।" আজ আবার শ্রীবাসকে বলিলেন, "আমি যাই, পরে আবার আসিব।" এই যে, "আমি যাই" বলিলেন ইনি কে? একথা পরে বিচার করা যাইবে!

শ্রীবাসের বাড়ী আনন্দময় হইল। পরদিন প্রাতে নিমাইকে আবার সকলে দেখিলেন, কিন্তু তখন নিমাই একজন মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই

নয়.—তবে অতি মিষ্ট ও পরমভক্ত। যে নিমাই পূর্ব্বদিন যুবতী স্ত্রীলোকের মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদের চিত্ত, আমাতে হউক" পরদিন তিনি দন্তে তৃণ করিয়া "হে কৃষ্ণ করুণাময়, আমাকে বিষয় বাসনা হইতে উদ্ধার কর" বলিয়া রোদন করিতেছেন। কিন্তু নিমাইয়ের এ ভাব দেখিয়া শ্রীবাস ও তাঁহার সঙ্গীগণ কেহ ভুলিলেন না; তাঁহারা, শ্রীভগবান্ আসিয়াছেন জানিয়া, সমস্ত জগৎ সুখময় দেখিতে লাগিলেন।

মুরারির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নিমাই চিরকাল ইহার সহিত নানামত বিতণ্ডা করিয়া আসিয়াছেন। মুরারি নিতান্ত স্নিগ্ধ, জীবের হিতকারী, সর্ব্বজনপ্রিয় ও পরম পণ্ডিত। তিনি এখন নিমাইয়ের নিতান্ত অনুগত হইয়াছেন। মুরারি হইতেই আমরা নিমাইয়ের আদিলীলা জানিতে পারিয়াছি। নিম্নে যে কথাগুলি বলিতেছি ইহা সমুদায় মুরারির নিজের কথা, তিনি নিজে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছেন তাহাই লিখিতেছি।

মুরারিও শুনিয়াছেন মুসলমান সৈন্য আসিতেছে। সুতরাং শ্রীভগবান মুরারিকে আশ্বাস দেওয়া কর্ত্তব্য ভাবিলেন। নিমাইয়ের দেহ তখন কাঁচের স্বরূপ হইয়াছে। কাঁচ-পাত্রে যে দ্রব্য রাখ, উহা সেই দ্রব্যের বর্ণ ধারণ করে। সেইরূপ নিমাইয়ের দেহ মুহুর্মুহু নানা আকার ধারণ করিতেছে। ঐ গৌরবর্ণ দেহ শ্রীভগবানের। যে দেহে শ্রীভগবান্ বিরাজ করেন, তাহাতে ত্রিলোকের সকলেই প্রকাশ হইতে পারেন। পূর্ণের দেহে অংশের প্রকাশ পাইতে কোন বাধা হইতে পারে না। যখন ব্রহ্মার স্তব শুনিলেন, তখন নিমাইয়ের ব্রহ্মার ভাব হইল এবং ব্রহ্মা হইয়া তিনি ভূতলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। শিবের কথা শুনিয়া তাঁহার শিবের ভাব হইল, মুখ-বাদ্য প্রভৃতি শিবের যত ভাব সমস্তই তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিবস শ্রীবাসের বাটিতে বরাহ অবতারের একটি শ্লোক শুনিয়া নিমাই হুঙ্কার করিয়া দ্রুতবেগে মুরারির বাড়ীতে গমন

করিলেন। মুরারি বাড়ীতে ছিলেন, কিন্তু নিমাই তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন। মুরারি পশ্চাতে চলিলেন ও দেবগৃহের দ্বার হইতে নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। শ্রীনিমাই ঘর হইতে বলিতে লাগিলেন, "একি! এ যে প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার শূকর; ইনি যে বড় বলবান দেখিতেছি; ইনি যে দন্তাগ্রে পৃথিবী ধরিয়াছেন; ইনি যে বিশাল দন্ত দ্বারা আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া ব্যথা দিতেছেন।" ইহাই বলিয়া নিমাই যেন সেই প্রকাণ্ড বরাহের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত পশ্চাতে হটিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই একপদ পশ্চাৎ যাইতেই বরাহ যেন তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, আর তখন নিমাই অচেতন হইয়া ভূমিতে হস্ত ও পদে বরাহের ন্যায় হাঁটিতে লাগিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে সম্মুখে একটি বৃহৎ পিতলের জলপাত্র ছিল তাহা দন্তের দ্বারা ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

মুরারী নিমাইকে দেখিতেছেন, যেন কতক বরাহ-আকার, কতক মনুষ্য-আকার। তিনি জড়বৎ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। সেই বরাহ-আকার তখন ভীষণ হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই নর-বরাহ মুরারিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আমি জীবকে ভক্তি ও ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছি। তুমি ভয় করিও না। তুমি আমার স্বাভাবিক রূপ বর্ণনা কর।"

মুরারি কথা কহিতে পারিলেন না, তখনি পূর্ব্বকার কথা মনে পড়িল। সেই পঞ্চমবর্ষের নিমাই তাঁহাকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন এবং সেই অবধি এপর্য্যন্ত তাঁহার সমুদায় লীলা একেবারে তাঁহার মনে উদিত হইল। তখন তিনি বুঝিলেন যে, যিনি তাঁহার সম্মুখে তিনি আর নিমাই নাই, তিনি শ্রীভগবান্। কিন্তু মুরারি তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়াও বিশাল হুঙ্কার শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, কোন কথাও কহিতে

পারিলেন না। কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, গলায় বসন দিয়া কেবল বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন।

মুরারীর অবস্থা দেখিয়া, তাঁহাকে সচেতন ও নিশ্চিন্ত করিবার নিমিত্ত নর-বরাহ বলিতেছেন, "মুরারি, তুমি নিশ্চিন্ত হও, তুমি আমার অতি প্রিয়। তুমি বড় বেদ মান। কিন্তু বেদ অন্ধ, বেদ আমার তত্ত্ব কি জানে?" আবার একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বেদের আচার্য্য। সে বেদ পড়াইয়া কুশিক্ষা দ্বারা আমার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিতেছে। মুরারি! তুমি সে সমুদায় চর্চ্চা পরিত্যাগ কর।"

মুরারির তখন কথা ফুটিল। তিনি বলিলেন, "প্রভু, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড তোমার লোমকূপে। তোমাকে বেদে কিরূপে জানিবে? তুমিই কেবল জান, তুমি কি পদার্থ। আমরা কি জানি? আমরা যাহা জানি তাহা এই করিতেছি।" ইহা বলিয়া মুরারি তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তখন নর-বরাহ বলিতেছেন, "আমি যাই"। ইহাই বলিয়া নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুরারি অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে চেতন করাইলেন। তখন নিমাই নিদ্রোত্থিতের ন্যায় বলিতেছেন, "মুরারি, আমি বুঝি অচেতন হইয়াছিলাম? নতুবা এখানে কিরূপে আসিলাম? আমি শ্রীবাসের বাড়ীতে অবতারের স্তব শুনিতেছিলাম। আমি ত কিছু চাপল্য করি নাই?" মুরারি কোন উত্তর না দিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

এইরূপে নিমাইয়ের নিজজন তাঁহাকে নানারূপে দেখিতে লাগিলেন। কেহ চতুর্ভুজ, কেহ কৃষ্ণের ন্যায়, কেহ বা মহাদেবের ন্যায় দেখিয়া ভক্তগণ কেবল যে মুসলমান ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন তাহা নয়, আনন্দে দিবারাত্রির ভেদ ভুলিয়া গেলেন। ঘর পরিবার ফেলিয়া সকলে দিবানিশি

নিমাইয়ের নিকটেই রহিলেন। তাঁহারা বিনা কারণে হাস্য করেন, বিনা কারণে রোদন করেন, বিনা কারণে নৃত্য করেন। এইরূপে আনন্দে সকলে পাগলের মত হইলেন। একথা আর গোপন রহিল না; ক্রমে প্রকাশ হইতে লাগিল যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনবদ্বীপে শচীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

নিমাইয়ের দুই ভাব হইত, ভক্ত-ভাব ও ভগবান-ভাব। গয়া হইতে যখন আসিলেন তখন ভক্ত-ভাব হইয়াছিল। শ্রীবাসের বাড়ীর ঘটনা হইতে শ্রীভগবান্-ভাব হইতে লাগিল। সেই অবধি অনেক সময় শ্রীভগবান-ভাবে থাকিতেন। পূর্ব্বে রাজনীতে কীর্ত্তন হইত, এখন দিবসেও কীর্ত্তন হইতে লাগিল। দিবানিশি নিমাই ও তাঁহার গণ প্রেমে মজিয়া রহিলেন। নিমাইয়ের যখন চেতনাবস্থা, অর্থাৎ ভক্ত-ভাব, তখন তাঁহাকে কেহ ভগবান্ বলিতে সাহস পাইতেন না। এমন কি, নিমাই ভগবানাবস্থায় যাহা করিতেন কি বলিতেন, ভক্তগণ তাহা তাঁহাকে কিছু বলিতেও সাহস পাইতেন না। চেতনাবস্থায় নিমাই দাস্যভাবে আপনাকে দীনের দীন ও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম ভাবিয়া প্রত্যেকের কাছে অতি করুণ স্বরে কান্দিয়া কান্দিয়া কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা মাগিতেন, আর বলিতেন, "তোমরা কৃষ্ণের দাস, আমার কিসে শ্রীকৃষ্ণে মতি হয় বলিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।" তবে নিমাই তখন তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণের আর পায়ে ধরিতেন না। তিনি পায়ে ধরিলে তাঁহার গণ বড় ব্যথা পান দেখিয়া তিনি শুধু করজোড়ে তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিতেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

"নানা বর্ণ বস্ত্রে পাগ   রুদ্রাক্ষ তুলসী গলে
নাকে নথ কর্ণেতে কুণ্ডল।
হাসিয়া চলেছে পথে   পায়েতে নূপুর বাজে
কেগো তুমি যেন মাতোয়াল ?"
"আমারে চেন না ভাই   বাড়ী এবে নদীয়ায়
সদা নাচি তাহে নূপুর পায়।
শুনেছ নদে অবতার   শ্রীগৌরাঙ্গ নাম যার
আমি নিতাই তার বড় ভাই।"—শ্রীবলরাম দাস।

এই জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিলেন। বর্দ্ধমান একচাকা গ্রামে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ অতি অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করেন। একজন সন্ন্যাসী তাঁহাব বাড়ীতে অতিথি হয়েন। শ্রীনিত্যানন্দকে তাঁহার পিতামাতার নিকট ভিক্ষা করিয়া লইয়া যান। পুত্রকে ভিক্ষা চাহিলে পিতামাতা যে তাহাকে দান করিতে পারেন, এ কালের জীবেব নিকট ইহা অনমুভবনীয়। একটি প্রবাদ আছে, যে সন্ন্যাসী তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া লইয়া যান, তিনি আর কেহ নহেন,—শ্রীবিশ্বরূপ, শ্রীনিমাইয়ের দাদা। কিন্তু এ প্রবাদের কোন প্রামাণিক মূল পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ এইরূপে বিংশতি বৎসর বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। সেখানে শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখনকার বৃন্দাবন জঙ্গলময়, আর সেই জঙ্গলময় স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরী তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি কাহাকে খুঁজিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ এখানে নাই, তিনি

শ্রীনবদ্বীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার নাম নিমাই পণ্ডিত। তুমি যদি তাঁহাকে চাও ত সেখানে যাও।" নিতাই এ কথা শুনিয়া তীরের মত নবদ্বীপ মুখো ছুটিলেন। নবদ্বীপে যাইয়া নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী খুঁজিতে খুঁজিতে চলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের নাম কুবের। তাহার আনন্দ নিত্য বলিয়া গুরুর নিকট নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হয়েন। এই অবতারে 'তিনি বলরাম। পথে আসিতে আসিতে সেই বলরামভাবে বিভোর হইয়া নিতাই ভাবিতেছেন যে তাঁহার অতি স্নেহের কনিষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণকে বহুকাল দেখেন নাই, তবে অতি শীঘ্র দেখিবেন। ইহা ভাবিতেছেন, আর আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছে, এবং পথে নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন। কখন বা জোড়ে লম্ফ দিতেছেন, কখন বা আনন্দে মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতেছেন। পথের লোক ভাবিতেছে, এটী পাগল সন্ন্যাসী। কিন্তু নিত্যানন্দের লোকাপেক্ষা কোন কালে নাই, আর তখন ত না থাকিবারই কথা। নিতাই নবদ্বীপে আসিয়া নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী খুঁজিতেছেন। যথা চৈতন্যমঙ্গল গীতে—

"নিমাই পণ্ডিতের কোন্ বাড়ী তোরা বল। ধুয়া
ক্ষণে যুগ পদ করি (নিতাই) লাফে লাফে যায়।
এক কয় আর বলে, (কথা) বুঝা নাহি যায়।
উর্দ্ধ-বাহু হয়ে নিতাই প্রেম-ভরে ধায়।"

যে কারণেই হউক, নিতাই, নিমাইয়ের বাড়ীতে না যাইয়া শ্রীনন্দন আচার্য্যের বাড়ী যাইয়া অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। নন্দন আচার্য্য একটী অতি তেজস্কর সন্ন্যাসী দেখিয়া, তাঁহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ আসিলেন। এদিকে নবদ্বীপের কথা শ্রবণ করুন। নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আসিবার তিন চারি দিন পূর্ব্বে নিমাই ভক্তগণকে

বলিয়াছিলেন যে, এক মহাপুরুষ নদীয়ায় আসিতেছেন। যে দিন নিত্যানন্দ নবদ্বীপে উপনীত হইলেন, সেই দিন প্রাতে নিমাই পার্ষদগণকে বলিতেছেন, "আমি গত রাত্রি স্বপ্নে দেখিতেছি, এই নগরে সেই মহাপুরুষ আসিয়াছেন। তাঁহাকে তোমরা তল্লাস করিয়া লইয়া আইস। তাঁহাকে শ্রীবলরাম বলিয়া বোধ হয়।" ইহাই বলিবামাত্র নিমাইয়ের বলরাম আবেশ হইল। তখন তিনি হুঙ্কার করিয়া "মদ আনো" "মদ আনো" বলিয়া আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, আর বলরামের মত কথা কহিতে লাগিলেন। "মদ আনো" এ আজ্ঞা কিরূপে পালন করিবেন, ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া ভক্তগণ ব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! মদ ত তোমার কাছে আছে, তুমি যে মদ চাহিতেছ তাহা আমরা কোথায় পাইব?" এই কথা বলিতে বলিতে নিমাইয়ের আবার স্বাভাবিক অবস্থা হইল। তখন তিনি বলিতেছেন, "তোমরা যাও, তাঁহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আইস। আমি তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া মুরারি, শ্রীবাস, মুকুন্দ ও নারায়ণ, চারিজন তাঁহাকে তল্লাস করিতে চারিদিকে ছুটিলেন। অপরাহ্নে সকলে আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিয়া কোন মহাপুরুষকে খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন নিমাই বলিলেন, "চল সকলে যাই, তাঁহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আসি।" একথা শুনিয়া সকলে চলিলেন। মধ্যস্থানে নিমাই, চতুষ্পার্শে ভক্তগণ। নিমাই একেবারে শ্রীনন্দন আচার্য্যের বাটী যাইয়া উঠিলেন। সকলে দেখেন যে বাহির বাটীতে একটি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাঁহার শরীর প্রকাণ্ড, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পদ্ম চক্ষু, বয়ঃক্রম ৩০ কি ৩২, মস্তকে নীলবস্ত্র, পরিধানেও নীলবস্ত্র। তিনি বসিয়া আপনি আপনি হাস্য করিতেছেন। ইনিই নিত্যানন্দ।

বিশ্বম্ভর অর্থাৎ নিমাই গণসহ প্রণাম করিয়া তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন। বিশ্বম্ভরকে তখন কিরূপ দেখাইতেছে, চৈতন্যভাগবত তাহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধ-মালা বাস পরিধান॥
কি হয় কনক-দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন।
আর কি কমলে আছে হেন হয় জ্ঞান॥
সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে যজ্ঞসূত্র অতি সূক্ষ্ম ক্ষীণ॥"

নিমাইয়ের অতি সুন্দর নাগর বেশ। নিত্যানন্দ নিমাইয়ের বদন নিরীক্ষণ করিবামাত্র পলক হারাইলেন, যেন চক্ষু দিয়া নিমাইয়ের রূপসুধা পান করিতেছেন; আনন্দে জড়বৎ স্তব্ধ হইলেন। ক্রমে নিতাইয়ের চক্ষু দিয়া আনন্দ বারি পড়িতে লাগিল। তাঁহার মনের ভাব—যেন উঠিয়া নিমাইকে হৃদয়ে পুরিয়া ফেলেন. কিন্তু অবশ হওয়ায় উঠিতে পারিতেছেন না।

নিমাইয়ের নাগর বেশ, ভক্তি উদ্রেকের বেশ নয়, পরিধান ডোর-কৌপীন নহে, হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু নাই; আর নিতাই স্বয়ং সন্ন্যাসী। তবে নিমাইকে দেখিয়া তাঁহার এরূপ ভাব হইল কেন? তাহার কারণ, নিমাইকে দেখিয়া নিতাইয়ের ভক্তির উদয় হইল না, প্রেমের উদয় হইল। ভক্তি ও প্রেম এক বস্তু নয়, ভক্তি ছোট ও প্রেম বড়। বৈষ্ণব ধর্ম্মে ও অন্যান্য ধর্ম্মে, এই একটী অতি বড় প্রভেদ। বৈষ্ণবগণের ঠাকুরের হস্তে অস্ত্র নাই, মোহন মুরলী আছে—ভয়ের কিছুই নাই, সমুদায় সুন্দর। সে ঠাকুরের স্থান, পত্র-পুষ্প-ময়ূর-কোকিল পরিশোভিত বৃন্দাবনের যমুনা

পুলিনে আর সে ঠাকুরকে পূর্ণিমার রজনীতে নাচিয়া গাইয়া ভজন করিতে এবং কেবল ভালবাসিয়া বাধ্য করিতে হয়।

চুপ করিয়া এইরূপে খানিক চাওয়া চাওয়ির পর, নিতাইয়ের হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করাইবার নিমিত্ত, নিমাই শ্রীবাসকে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়া একটী শ্লোক পড়িতে বলিলেন। শ্রীবাস সেই শ্লোকটী পড়িলেন, যেটী রত্নগর্ভ শ্রীনিমাইকে শুনান, আর তিনি শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

যেমন পরিপূর্ণ জলাশয়ের বাঁধে অল্প একটু নালা কাটিয়া দিলে, ক্রমে অতি বেগে জল বাহির হইতে থাকে, আর সমুদায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়; এই শ্লোক শুনিয়া নিতাইয়ের সেইরূপ হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। নিতাইয়ের প্রেমের তরঙ্গ ও বেগ দেখিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। ভক্তগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন ক্রমে নিতাইকে স্থির করিতে পারিলেন না। তখন নিমাই তাঁহাকে যেমন স্পর্শ করিলেন, অমনি নিতাই স্পন্দহীন হইলেন, আর নিমাই তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিলেন।

নিমাইয়ের কোলে নিতাই স্পন্দহীন হইয়া বসিয়া, উভয়ে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। একটু পরে উভয়ে শান্ত হইয়া বসিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন "আমি এতদিনে বুঝিলাম যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উদ্ধার করিবেন, নতুবা তোমার ন্যায় ভক্ত আমাকে কেন মিলাইয়া দিলেন। আজি আমার শুভদিন, যে তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিলাম। তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, তুমি ইচ্ছামাত্র চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র করিতে পার। তোমার আশ্রয় অমূল্য। তোমার যে আশ্রয় লয় তাহার আর কোন কালে বিপদ নাই। আমি যে তোমার কৃপাপ্রার্থী, আমাকে কৃপা করিতে তুমি যে দয়াময় তাহার পরিচয় দাও।"

স্তুতি শুনিলেই ভক্তগণ লজ্জিত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ নিমাইয়ের

মুখে এইরূপ স্তুতি শুনিয়া নিতাই লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলেন। পরে ধীরে ধীরে অতি নম্র হইয়া বলিতেছেন, “আমি সমুদায় কৃষ্ণের স্থান দর্শন করিয়াছি, দেখিলাম সিংহাসন শূন্য আছে, কৃষ্ণ নাই। তখন ভাল লোকের মুখে শুনিলাম শ্রীকৃষ্ণ এখন শ্রীনবদ্বীপে আছেন। তাই শুনিয়া এখানে বড় আশা করিয়া আসিয়াছি। আর শুনিলাম যে নবদ্বীপে বড় হরিসংকীর্ত্তনের ঘটা হইতেছে। কেহ বা ইহাও বলেন যে, স্বয়ং শ্রীভগবান্ সেই সংকীর্ত্তনে মিশিয়া ভুবনমোহন নৃত্য করিয়া থাকেন। আরও শুনিলাম যে নবদ্বীপের মত এমন পাতকী উদ্ধারের স্থান আর নাই। আমি তাহাতে আশাতুর হইয়া এখানে আসিয়াছি, এখন আমার অদৃষ্টের পরীক্ষা করিব।

তাহার পরে “ঠারে ঠোরে” দুইজনে কিছু কথা হইল, তাহা চৈতন্য-মঙ্গল গীতে এইরূপ বর্ণিত আছে। শ্রীনিমাইচাঁদ দাঁড়াইয়া, নিমাই ও নিতাইয়ের চারি চক্ষে মিলন হইয়াছে। বহু দিন পরে চির-সুহৃদের মিলন হইলে যেমন হয়, উভয়েরই এই দর্শনে সেইরূপ হইল। উভয়েই উভয়ের মুখপানে চহিয়া ঝুরিতে লাগিলেন।

চারি চক্ষে মিলন হইলে নিতাই পলক হারাইয়া নিমাইয়ের মুখ ঠাহুরিয়া দেখিতেছেন। ভক্তগণ উভয়ের এই অপরূপ ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মনে হইল, যেন তাঁহারা গোপনে আলাপ করিবেন, কিন্তু সকলে উপস্থিত থাকায় পারিতেছেন না। ইহাতে সকলে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু সমুদায় কথা শুনিতে লাগিলেন। নিতাই দেখেন যে, নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ তাঁহার কানাইয়ের মত কাল নহে, তাঁহার মাথায় চূড়া নাই, বদনে মুরলী নাই, তবে নয়ন দুটি কেবল সেইরূপ। ইহাতে বলিতেছেন, (নিতাই একটু তোতলা)—

কা-কা-কানায়ে না কি তুই রে! ধ্রু।
কই তোর চূড়া বাঁশরী?

ইহাতে নিমাই উত্তর করিতেছেন—

কি পুছসি ভাই আমার। ধ্রু।
ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি।
এবার নদের খেলা (ধূলায়) গড়াগড়ি॥
ব্রজের খেলা বাঁশীর তান।
নদের খেলা হরি গান॥
ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া।
নদের বেশ কৌপীন পরা?

এইরূপ ঠারে ঠোরে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া উভয়ে ভাব সম্বরণ করিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমাদের বড় ভাগ্য যে নবদ্বীপের প্রতি আপনার করুণা হইয়াছে। এখন গাত্রোত্থান করুন।" নিতাই এই অবধি নিমাইয়ের পশ্চাৎ চলিলেন। প্রকৃত কথা, তখন নিতাইয়ের তাঁহার দেহ ব্যতীত আর কিছু রহিল না। তিনি তখন নিমাইকে আপনার মন প্রাণ একেবারে দিয়াছেন।

নিমাই নিত্যানন্দকে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! কল্য পূর্ণিমা, ব্যাসপূজার দিন; আপনার ব্যাসপূজা কোথা হইবে?" নিত্যানন্দ নিমাইয়ের এই ইঙ্গিত পাইয়া শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আমার ব্যাসপূজা, এই বামনার ঘরে হইবে।" ইহাতে নিমাই শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! ব্যাসপূজা তোমার বাড়ীতে হইলে তোমার ঘাড়ে বড় বোঝা পড়িবে।" তাহাতে শ্রীবাস বলিতেছেন, "তোমার কৃপায় আমার তাহাতে কষ্ট হইবে না, ঘরে ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি সমুদায়ই আছে, তবে পূজার পদ্ধতি-পুস্তক নাই, তাহা মাগিয়া আনিব।" এইরূপ কথা বলিতে বলিতে সকলে শ্রীবাসের বাড়ীতে গমন করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিবামাত্র দ্বারে কপাট পড়িল, আর সকলে

আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল, আর নিতাই ও নিমাই কর ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের বলরাম-ভাব হইল, এবং তিনি নৃত্য ছাড়িয়া বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়া বিষ্ণুখট্টায় গিয়া বসিলেন। বসিয়া, "মদ আনো" "মদ আনো" বলিয়া আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। কিরূপে নিমাইয়ের এই আজ্ঞা পালন করিবেন ইহা লইয়া সকলে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিলেন। পরে শ্রীবাস একটি উপায় স্থির করিয়া এক পাত্র গঙ্গাজল নিমাইয়ের হস্তে দিলেন ? নিমাই তাহাই মদ্য বলিয়া পান করিলেন। তদ্দণ্ডে নিমাইয়ের আবার শ্রীভগবানের আবেশ হইল, তখন বলিতেছেন, "অদ্য আমার আনন্দ পরিপূর্ণ হইল, অদ্য আমার নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, কিন্তু নাড়া কোথায় ? নাড়া আমাকে কেন ফেলিয়া গেল ? নাড়া হুঙ্কার করিয়া আমাকে আনিল, এখন যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল, এ ত নাড়ার উচিত নয়।" সকলে আপনা আপনি নাড়া ব্যক্তি কে বিচার করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস শেষে সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"প্রভু! আপনি 'নাড়া' কাহাকে বলিতেছেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না।" তাহাতে নিমাই বলিলেন, "আমার অদ্বৈতকে আমি 'নাড়া' বলিয়া থাকি। তাহার নিমিত্তই আমার এ অবতার। আমি এবার ব্রহ্মার দুর্ল্লভ যে শ্রীভগবদ্ভক্তি তাহা অতি অধম জীবকেও বিলাইব।" একটু পরে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্যজ্ঞান পাইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! আমি কি প্রলাপ বকিতেছিলাম ?" শ্রীবাস বলিলেন, "কই কিছুই না, তুমি ত যেমন তেমনই আছ।" তখন নিমাই আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "আমি অবোধ বালক, যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, তোমরা কৃপা করিয়া আমার অপরাধ লইও না।"

নিতাই প্রথমে নিমাইয়ের দর্শনে প্রায় সমুদায় জ্ঞান হারাইয়াছিলেন।

যাহা একটু ছিল, তাহাও সংকীর্ত্তন ও প্রভুর শ্রীভগবান্‌-আবেশ দর্শনে গেল। নিশিযোগে কি মনে ভাবিয়া তিনি আপনার দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি ঘর ছাড়িয়া, বিংশতি বৎসর দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে বহু দিন তল্লাস করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। কমণ্ডলু ও দণ্ড শুষ্ক সন্ন্যাস-ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র। এখন নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহার অভিলষিত বস্তু লাভ করিলেন। এখন আর দণ্ডকমণ্ডলুর প্রয়োজন কি? কাজেই সেগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিলেন।

প্রাতে শ্রীবাস দেখেন, নিতাইয়ের কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নাই। তখন ব্যস্ত ভাবে শ্রীনিমাইকে এই কথা জানাইলেন। প্রভু এই দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গার কথা শুনিয়া দ্রুত আসিলেন; আসিয়া দেখেন, নিত্যানন্দ আপনা-আপনি কথা বলিতেছেন, আর হাসিতেছেন। বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। নিমাই আসিলে নিতাই তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া বিড়-বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। তখন নিতাইকে লইয়া সকলে গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন, আর নিমাই নিজ হস্তে নিতাইয়ের দণ্ডকমণ্ডলু জলে ভাসাইয়া দিলেন।

স্নানের পর শ্রীবাসের বাড়ীতে ব্যাসপূজা আরম্ভ হইল। শ্রীবাস স্বয়ং পূজা করিতেছেন, আর ভক্তগণ মধুর নৃত্য করিতেছেন ও গীত গাহিতেছেন। পূজা সমাপ্ত হইলে, ফুলের মালা লইয়া নিত্যানন্দের হাতে দিয়া শ্রীবাস বলিলেন, "এই মালা ধর, ও মন্ত্র পড়িয়া ব্যাসদেবকে ইহা অর্পণ কর।" কিন্তু নিতাই মালা গ্রহণ করিলেন না। তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, শাস্ত্রের বিধান স্বহস্তে মালা দিতে হয়, তাহা হইলে ব্যাস তুষ্ট হয়েন, ও শ্রীকৃষ্ণ প্রেমধন দেন। আমি দিলে হইবে না। অতএব মালা ধর।" নিতাই অবশেষে মালা ধরিলেন। তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, "বল, নমো

ব্যাসায়।” নিতাই বলিলেন, “হুঁ”। শ্রীবাস বলিতেছেন, “হুঁ কি? বল নমো ব্যাসায়” তবু নিতাই বলিলেন “হু”, আর মালা হাতে করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

তাহার কারণ, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন আঙ্গিনার অন্যদিকে নৃত্য করিতেছেন। নিমাইকে নিতাই দেখিতে পাইতেছেন না, তাই নিমাইকে হারাইয়া, চারিদিকে চাহিতেছেন। শ্রীবাস বলিতেছেন, “শ্রীপাদ! এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন কেন? মনোযোগ দিউন, মন্ত্র পড়ুন।” তবু নিতাই এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন, এবং চাহিতে চাহিতে আবার বলিলেন, “হু”। বড় পীড়াপীড়ি করিলে, নিতাই বিড়বিড় করিয়া কি বলিলেন, তাহা তিনিই জানেন, আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না। তখন শ্রীবাস নিরুপায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনিমাইকে বলিতে লাগিলেন, “প্রভু! এক বার এদিকে আসিতে আজ্ঞা হয়;” তখন ভক্তগণ নিমাইকে প্রভু বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। “প্রভু! একবার এদিকে আসিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীপাদ ব্যাসপূজা করিতেছেন না, শুনিতেছেন না, আর কি বলিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পরিতেছি না।” নিমাই এই কথা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন, আসিয়া নিতাইকে বলিলেন, “শ্রীপাদ! ব্যাসপূজা করুন।” তখন ব্যাসপূজা হইতেছে, কি, কি হইতেছে, তাহা নিতাইয়ের জ্ঞান নাই! সম্মুখে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের লইয়া নিতাইয়ের কি হইবে? নিতাই কেবল নিমাইকে ভাবিতেছেন, মনে আর কোন ভাব নাই। নিতাই দেখিলেন, যাঁহাকে ক্ষণকালের জন্য চক্ষে হারাইয়া সমস্ত আঙ্গিনায় চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া খুঁজিতেছিলেন, সেই নিমাই সম্মুখে। তখন নিতাইয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না, হাতে যে বাসপূজার নিমিত্ত মালা ছিল, তাড়াতাড়ি তাহা নিমাইয়ের গলে দিলেন। তদ্দণ্ডে একটি অদ্ভুত ঘটনা হইল। নিমাই তদ্দণ্ডে ষড়ভুজ হইলেন।

নিমাইয়ের এই ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম পরে দর্শন্ করিয়াছিলেন; এবং দর্শন করিয়া সেই মূর্ত্তি তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি অদ্যাপিও সেখানে আছেন।

নিতাই নিমাইয়ের পানে চাহিয়াছিলেন, ষড়ভুজ দেখিয়া পুলক হারাইলেন, কাঁপিতে লাগিলেন, ও পরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন নিমাই তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন, বসিয়া তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইতে লাগিলেন। শ্রীহস্ত স্পর্শে নিতাই একটু চেতনা পাইলেন, কিন্তু তবু পড়িয়া রহিলেন। নিমাই নিতাইয়ের অঙ্গে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "শ্রীনিত্যানন্দ উঠ, সংকীর্ত্তন কর, জীবকে প্রেমদান করিয়া উদ্ধার কর। তুমি যাহাকে ইচ্ছা প্রেম বিলাও। তোমার ত সমুদায় বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর কি চাও?" পাঠক! নিতাইয়ের সমুদায় বাসনা কি বুঝিয়া লউন। তাঁহার "সমুদয় বাসনা" এই যে জীবগণ উদ্ধার হউক। পরে কীর্ত্তন করিয়া ও মহানন্দে প্রসাদ পাইয়া সে দিনের লীলা শেষ হইল।

পরদিন নিমাই নিতাইকে নিজবাড়ি লইয়া গেলেন; এবং মা মা বলিয়া ডাকিলেন, শচী আসিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, "মা, তোমার আর একটি পুত্র, আমার বড় ভাইকে আনিয়াছি। ইনি তোমার বিশ্বরূপ জানিবা।" শচী নিতাইয়ের মুখপানে চাহিলেন, দেখিলেন ঠিক যেন বিশ্বরূপ! প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বরূপই নিতাইয়ের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শচী নিতাইকে দেখিয়া ভাবিতেছেন, এ কি বিশ্বরূপ? আমার সেই হারান ধন? তখন শচী ছলছল আঁখিতে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, নিমাই বলিতেছে তুমি আমার পুত্র। এ কি সত্য?" নিতাই বলিলেন, "হাঁ, মা, আমি তোমার বিশ্বরূপ। তখন নিতাই তাঁহার বিশ্বরূপ এই ধ্রুব জ্ঞান হওয়ায় শচী "বাপ" "বাপ" বলিয়া তাঁহাকে কোলে লইলেন।

নিতাইকে কোলে করিয়া তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আর কান্দিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, 'হলো ভাল, আমার ক্ষেপা নিমাই এতদিন সহায়হীন ছিল, এখন তুমি ভাইটিকে যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিও। আজ আমার নিমাইয়ের জন্য দুর্ভাবনা দূর হইল।" চৈতন্য-মঙ্গলের এই কয়েকটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাই শচীরাণী।
নয়নে গলয়ে নীর গদগদ বাণী ॥
এই মত স্নেহ-রসে সব গরগর।
দুই পুত্র দেখি শচী জুড়ায় অন্তর ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

সত্য কি সজনি যমুনা পুলিনে
দেখিনু নীরদ কানু ?
সত্য কি আমারে চাহিয়া চাহিয়া
বাজায়েছিল সে বেণু ?
পাঠাইনু তারে প্রেমের পত্রিকা
পেয়েছিল সে কি করে ?
সত্য কি সজনি আমি কোন দিন
আনন্দে মিলিব তারে ?
স্বপন দেখেছি দিবস রজনী
ভাবিয়া ভাবিয়া মরি।
সত্য কি বলাই মরণের কালে
পাইবে চরণ-তরি ?

শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রকাশ অবধি, নিমাইয়ের মুহুর্মুহু শ্রীভগবান্-ভাব হইতে লাগিল। উপরি উক্ত ঘটনার দুই এক দিন পরে, নিমাই ভগবান্-আবেশে শ্রীবাসের কনিষ্ঠ শ্রীরামকে শান্তিপুরে যাইতে আজ্ঞা করিলেন; বলিলেন, "শ্রীরাম! তুমি শান্তিপুরে যাও, যাইয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে বলিবে—যাহার লাগিয়া তিনি কঠোর উপবাস তপস্যা ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে এই ধরাধামে আনিবার নিমিত্ত ভক্তিভাবে তিনি পূজা করিয়াছিলেন. সেই তিনিই আমি, তাঁহার আকর্ষণে আসিয়াছি। অদ্বৈত এখন সস্ত্রীক আসুন, আসিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করুন।"

রামাই এই আজ্ঞা পাইয়া শান্তিপুরে দৌড়িলেন। শ্রীভগবানের আজ্ঞা পাইয়া যাইতেছেন, কাজেই শ্রীরামের আনন্দে বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতের কাছে যাইয়া তিনি আহ্লাদে কথা কহিতে পারিতেছেন না; অদ্বৈতের পানে চাহিতেছেন, একটু হাসিতেছেন, কিন্তু কথা বাহির হইতেছে না শ্রীভগবান্ আসিয়াছেন, এই আহ্লাদে শ্রীনিমাইয়ের সঙ্গীগণ দিবানিশি গলিয়া আছেন। নবদ্বীপে যে প্রকাণ্ড কাণ্ড হইতেছে, তাহা অদ্বৈত শুনিয়াছেন। শ্রীবাস শ্রীরাম প্রভৃতি যে নিমাইকে লইয়া একেবারে মজিয়া গিয়াছেন, তাহাও তিনি জানেন। এখন শ্রীরামের আগমনে ও ভাবে বুঝিলেন যে, তিনি তাঁকে লইতে আসিয়াছেন। তখন অদ্বৈত বলিতেছেন, "আমাকে বুঝি লইতে আসিয়াছ? আমি কেন যাব? আমি কি বস্তু তোর দাদা শ্রীবাস জানে। তোরা একটা বালককে লইয়া মত্ত হইয়াছিস, আমি ত তোদের মত নির্ব্বোধ না, যে আমিও মাতিব। তোদের আবার অবতার! কোন্ শাস্ত্রে তোদের আবার অবতার রে?"

শ্রীরামের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিতেছে, কাজেই অদ্বৈতের এই

দুর্ব্বাক্য সেখানে আদপে স্থান পাইল না, বরং এই কথা শুনিয়া তিনি খলখল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন,"শাস্ত্র তুমি জান, আমি কি জানি? তবে শ্রীভগবান্ কি বলিয়া দিয়াছেন তাহা শুন। তুমি যাঁহার নিমিত্ত এত ক্লেশ পাইয়াছ, তিনি তোমার আকর্ষণে গোলক ছাড়িয়া জীবের মলিন দশা দেখিয়া, কৃপার্ত্ত হইয়া জীব উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।" ইহা বলিতে বলিতে রামাইয়ের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। রামাইয়ের দুটি আঁখি ঝুরিতেছে, আর তিনি বলিতেছেন, "এখন তোমার স্ত্রীর সহিত চল, তোমাকে তিনি ডাকিয়াছেন।"

বোধ হয় এই কথাগুলির মধ্যে শক্তি দিয়া নিমাই রামাইকে পাঠাইয়াছিলেন। কারণ উহা শুনিবামাত্র শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয় দ্রব হইল, আর তিনি কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, "তিনি এসেছেন? তিনি এসেছেন? সত্য তিনি এসেছেন? আমাদের মধ্যে এসেছেন? এ কি সত্য?" তাহার পরে, "এনেছি, এনেছি," বলিয়া আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত-ঘরণী সীতাও এ কথা শুনিলেন, তিনিও কান্দিতে লাগিলেন। তখনি নদীয়ায় যাওয়ার উদ্যোগ হইল। শ্রীভগবানের পূজার প্রকাণ্ড সজ্জা করা হইল, আর শ্রীঅদ্বৈত, সীতা ও রামাই তিন জনে শ্রীনবদ্বীপে চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে শ্রীঅদ্বৈতের মনে একটু খট্‌কা হইল। রামাইকে বলিতেছেন, "আমি নন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে লুকাইয়া থাকিব। শ্রীরাম, তুমি তাঁহাকে ইহা বলিও না। তুমি যাইয়া বল যে অদ্বৈত আচার্য্য আসিলেন না। দেখি, তিনি কি করেন। আমার মাথায় পা তুলিয়া দিতে যদি নিমাই পণ্ডিতের সাহস হয়, তবেই বুঝিব তিনি আমার ঠাকুর।" শ্রীরাম বলিতেছেন, "তাহাই ভাল, ভাবিতেছ প্রভু জানিতে পারিবেন না? একবার কাছে চল, তখন বুঝিতে পারিবে।"

এদিকে, অদ্বৈত আসিতেছেন, শ্রীনিমাই অন্তরে জানিয়া শ্রীবাসের বাড়ী গমন করিলেন, করিয়া বিষ্ণুখট্টায় ভগবান্‌-আবেশে বসিলেন। তখন শ্রীভগবানের প্রকাশ দেখিয়া, ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া সেবায় নিযুক্ত হইলেন। নিত্যানন্দ মস্তকে ছত্র ধরিলেন, গদাধর তাম্বুল যোগাইতে লাগিলেন, নরহরি চামর ঢুলাইতে লাগিলেন, শ্রীবাস, মুরারি ও মুকুন্দ করজোড়ে সম্মুখে রহিলেন। সকলে নীরব, ভয়ে কাহারও কথাটি কহিবার শক্তি নাই। তখন প্রভু বলিতেছেন, "অদ্বৈত আচার্য্য আসিয়া আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে লুকাইয়া আছেন, তাঁহাকে শীঘ্র লইয়া আইস।"

রামাই বাড়ীতে না পঁহুছিতেই শ্রীঅদ্বৈতের নিকট আজ্ঞা আসিল। অদ্বৈত বুঝিলেন যে, নন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে তিনি লুকাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা নিমাইয়ের গোচর হইয়াছে। তখন আবার শ্রীনিমাইয়ের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস একটু সজীব হইল। তখন পূজাব সজ্জা লইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে সস্ত্রীক চলিলেন, কিন্তু গৃহত্যাগ করিয়াই বিহ্বল হইলেন। সত্য কি ভগবান্‌ আমাকে ডাকিতেছেন? যতই এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতের বুক দুরদুর করিতে লাগিল। যতই অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল ও ক্রমেই অচেতন হইতে লাগিলেন। অদ্য তাঁহার জীবন সার্থক হইবে, অদ্য তাঁহার ব্রত সিদ্ধ হইবে, যেহেতু শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে চলিয়াছেন। দর্শন লালসায় ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন, আবার আনন্দে নিজ ঘরণী শ্রীসীতাদেবীর অঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছেন। যাইয়া কি করিবেন, কি বলিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে তাঁহারা শ্রীবাসের বাড়ী প্রবেশ করিলেন, কষ্টে স্বষ্টে পিঁড়ায় উঠিলেন, ঘরে আর প্রবেশ করিতে পারেন না। সকলে অদ্বৈতকে ধরিয়া পিঁড়া হইতে ঘরে লইয়া

চলিলেন। তখন তাঁহারা যুগল হইয়া প্রণাম করিতে করিতে প্রভুর সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। অভ্যন্তরে যাইয়া নয়ন মেলিলেন। নয়ন মেলিয়া দেখেন যে, শ্রীবাসের সে ঘর নাই, নিমাইও সেখানে নাই। তবে কি দেখিলেন, তাহা শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতের কথায় বলি। শ্রীনিমাই বিষ্ণুখট্টার উপর—

জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনকসুন্দর কলেবর॥
প্রসন্নবদন কোটি-চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥

—আর দেখিতেছেন, সর্ব্বাঙ্গ মণিমাণিক্য ভূষিত। আর কি দেখিতেছেন—

কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর॥

অর্থাৎ শুদ্ধ যে সমুদায় ঘর জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে তাহা নয়, ঘরে যাঁহারা আছেন, কি যে যে দ্রব্য আছে, সমুদায় জ্যোতির্ম্ময়!

অদ্বৈত পরে দেখিতেছেন যে, চারিদিকে অনন্ত কোটি পরম সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ শ্রীনিমাইকে স্তুতি করিতেছেন; আর ঋষিগণ করযোড়ে বেদ পড়িতেছেন। যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করেন সেইদিকেই দেখেন, ঋষিগণ ও দেবদেবিগণ শ্রীনিমাইরূপ ভগবানকে সেবা করিতেছেন।

ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়িয়াছে মহাঋষিগণ পাশে॥

অদ্বৈত সম্মুখের ব্যাপার দেখিয়া সস্ত্রীক জড়বৎ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। প্রথমে প্রণাম করিতেছিলেন, তখন প্রণামে ক্ষান্ত দিলেন। দেখিলেন, শ্রীভগবান অতি প্রকাণ্ড বস্তু। ভাবিলেন, তাঁহার প্রণাম,

শ্রীভগবানের গোচর হইবে কেন? কত কোটি দেবগণ শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিতেছেন; তিনি ক্ষুদ্র কীট, তিনি প্রণাম করিলে আর অধিক কি হইবে? শ্রীভগবান্‌কে তিনি প্রণাম করিলেই বা কি, আর না করিলেই বা কি? শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখিলে জীবগণ তাহা হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। শ্রীঅদ্বৈত এই ঐশ্বর্য্য দেখিলেন, কারণ তিনি উহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে নিতান্ত সন্দেহ, বালক মিনাই—যাহাকে কল্য উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন, কিরূপে শ্রীভগবান হইতে পারেন? আর তাঁহার মনে তর্ক হইতেছিল যে, যদি নিমাই শ্রীভগবান্ হয়েন, তবে নিশ্চয় তাঁহার অসীম ক্ষমতা আছে, এবং নিমাইয়ের সেই অসীম ক্ষমতা দেখিলেই তিনি তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিবেন। তাই শ্রীঅদ্বৈত ঐশ্বর্য্য দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া এই ঐশ্বর্য্য দেখিলেন, দেখিয়া শ্রীভগবান্‌কে দুর্ল্লভ, অর্থাৎ পাওয়া অসম্ভব, ভাবিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন, এবং নিরাশ হইয়া দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

কিন্তু অদ্বৈতের প্রতি শ্রীভগবানের করুণা প্রচুর। তখন শ্রীভগবান শ্রীঅদ্বৈতের ভাব দেখিয়া সমুদায় ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিলেন, করিয়া শুধু জ্যোতির্ম্ময় পরমসুন্দর নবীন পুরুষরূপে তাঁহাকে দেখা দিলেন, এবং অতি মধুর হাস্য করিয়া নিকটে ডাকিলেন। এই আশ্বাস বাক্য শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত নিকটে আসিলেন। তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন, "ওহে অদ্বৈত আচার্য্য! তুমি জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া জীব উদ্ধারের নিমিত্ত আমাকে আনিতে কঠোর আরাধনা করিয়াছ। তোমার আকর্ষণে আমি আসিয়াছি। এখন তুমি অকাতরে জীবকে ভক্তি ও প্রেমধন বিতরণ কর।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত আশ্বাসিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং করযোড়ে কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, প্রভু, আমি তোমাকে

আনিয়াছি এ কথা বলিলে কে শুনিবে বা প্রত্যয় করিবে? তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছা না হইলে তোমাকে কি কেহ আনিতে পারে? জীব সমুদয় তোমার সন্তান, তাহাদের দুঃখে তুমি যত দুঃখিত, অন্যের তাহা সম্ভবে না। তুমি তাহাদের দুঃখ দেখিয়া, দয়ার্দ্র হইয়া আপনি আসিয়াছ। আমি কীটানুকীট, আমি তোমাকে কিরূপে আনিব? তবে জীব উদ্ধার করিতে তোমার আগমন হওয়ায়, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জনের যাহা কখন সম্ভবপর ছিল না, তাহা হইল,—তোমার দর্শনলাভ হইল। এখন যদি অনুমতি কর, তোমার চরণ-পূজা করি, করিয়া জনম সফল করি।" ইহাই বলিয়া সস্ত্রীক শ্রীচরণাগ্রে বসিলেন। প্রথমে গঙ্গাজলে শ্রীচরণ ধৌত করিলেন, শেষে গন্ধ ও পুষ্পে চরণ পূজা করিলেন। চরণ পূজা করিয়া "নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়" শ্লোক পড়িয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর সস্ত্রীক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া আরত্রিক করিলেন, পরে বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি ষোড়শোপচারে পূজা সাঙ্গ করিলেন। তাহার পর স্ত্রীকে বামে করিয়া শ্রীচরণাগ্রে বসিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন, স্তুতি করিয়া স্ত্রীপুরুষ যুগল হইয়া শ্রীভগবানকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীভগবান্ তখন তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষের মস্তকে শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে যাহা বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল।

তখন শ্রীভগবান্ রহস্য করিয়া বলিতেছেন, "নাড়া, একবার নৃত্য কর, আমি দর্শন করি।" এ আজ্ঞা পালন করা তখন অদ্বৈতের পক্ষে কঠিন ছিল না, কারণ তখন তিনি আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। অদ্বৈত নাচিতে লাগিলেন, আর অন্যান্য সকলে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই অদ্বৈত, যিনি মহাজ্ঞানী, ঘোর তাপস, যাজক ও ধ্যানপরায়ণ ভক্ত, তাঁহাকে নিমাইরূপ "পরশমণি" এইরূপে "নাচাইয়া গাওয়াইয়া" "সোনা" করিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত তপস্যা দূরে ফেলিয়া নৃত্যগীতরূপ ভজন অবলম্বন করিলেন।

তখন শ্রীভগবান্ অদ্বৈতকে বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা বর চাও।" শ্রীঅদ্বৈত বড় বিপদে পড়িলেন। শ্রীভগবান্ সন্মুখে আসিয়া যদি বলেন "তোমার যাহা ইচ্ছা বর চাও," তবে মহাবিপদ। শ্রীভগবানের কাছে যে কি বর চাওয়া কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করা জীবের পক্ষে বড় কঠিন। কারণ যত প্রকার বর চাহিতে ইচ্ছা করা যায়, প্রায় সমুদায়েই কিছু না কিছু দোষ আছে; বিশুদ্ধ মঙ্গল কি, তাহা ঠিক করা জীবের পক্ষে কঠিন। যে ব্যক্তি উপযুক্ত বর চাহিতে পারে, তাহার নিকট শ্রীভগবান্ কি বস্তু ও জীবের জীবনের কি উদ্দেশ্য, তাহা তদ্দণ্ডে স্ফুর্ত্তি হয়। শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "তুমি সন্মুখে, আর কি বর চাহিব?" শ্রীভগবান্ বলিলেন, "আমার ইচ্ছা ব্যর্থ হইবে না, তুমি অবশ্য বর চাহিবে।" তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু! এই বর দাও যে, তুমি যে প্রেমভক্তি বিলাবে, তাহা নীচ বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া সকলকেই বিতরণ করিবে।" এই অপরূপ বর প্রার্থনা শুনিয়া সকলে জয় জয় করিয়া উঠিলেন। শ্রীভগবানও তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি যেরূপ ভক্ত তাহাতে অন্যরূপ অফল ও তোমার অনুপযুক্ত বর কেন চাহিবে?"

ষোড়শ অধ্যায়

গৌর জানা নাহি ছিল তখন আছিনু ভাল
কাল কাটাইতাম আমি সুখে।
গৌরনাম কর্ণে গেল কেবা কাণে মন্ত্র দিল
হুতাশে পিয়াসে মরি দুঃখে॥
যারা গুণের সঙ্গী ছিল তারা ফেলে পালাইল
কাহারে কহিব মন ব্যথা।
কেবা দুঃখ ভাগ নিবে সঙ্গে সঙ্গে কে কান্দিবে
কে শুনাবে মনমত কথা॥

হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল এবে কোথা লুকাইল
আগে মোর চিত্ত করি চুরি।
আপনি মোরে ডাকিল মন আমার ভুলে গেল
এবে করে মো সনে চাতুরি॥
আমি পাছে পাছে যাই মোরে দেখিয়া পলায়
এরে আমার শক্তি নাই অঙ্গে।
রোগে শোকে অভিভূত ক্রমেতে আত্মবিস্মৃত
ক্লান্ত চিত্ত বিশ্রাম সে মাগে॥
আর ত চলিতে নারি লহ মোরে হাত ধরি
যদি কেহ থাক নিজ জন।
এই ছিল মোর ভাগ্যে ধরণী বিদার মাগে
বলরাম দাস অকিঞ্চন॥

শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে ফিরিয়া গেলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীঅদ্বৈতের চরিত্র বুদ্ধির অগম্য। শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার মনে নিমাইয়ের প্রতি আবার একটু অবিশ্বাস হইল। তখন আবার একটি সঙ্কল্প করিয়া নবদ্বীপে চলিলেন। ভাবিলেন, এবার যাইয়া মনের সন্দেহ নিশ্চয় দূর করিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি প্রাতে শান্তিপুর ছাড়িয়া প্রহরেক বেলার সময়ে নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়ী আসিলেন। দেখেন, প্রভু ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণকথা-রসে আছেন। শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিয়া সকলে মহা আনন্দিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। স্বয়ং প্রভুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলেন, প্রভুও অদ্বৈতকে প্রণাম করিলেন। পরে সকলে উপবেশন করিলেন।

সকলে বসিলে প্রভু বলিলেন, "এখন সীতাপতি আসিলেন, আর আমাদের শমনভয় থাকিবে না।" শ্রীঅদ্বৈতের ঘরণীর নাম সীতা, সেই উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীরামচন্দ্র সাব্যস্ত করিয়া এই কথা

বলিলেন। শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "কই, এখানে রঘুনাথ কোথা? এখানে বরং যদুনাথ আছেন।" প্রভু এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিতেছেন, "আপনি আমাকে ফেলিয়া শান্তিপুরে থাকেন ইহাতে আমি বড় দুঃখ পাই।" শ্রীঅদ্বৈত উত্তর করিবার পূর্ব্বে শ্রীবাস বলিলেন, "শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে থাকেন বটে, কিন্তু এখন তোমার আবির্ভাবে নবদ্বীপে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আর তোমার আবির্ভাবে এই নবদ্বীপে এখন নিত্যানন্দের অবস্থিতি হইতেছে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বৈত প্রভু প্রথমে শান্তরসে মুগ্ধ ছিলেন, এখন দ্বীপ স্বরূপ যে, নববিধ-ভক্তি সেই নবদ্বীপেই আকৃষ্ট হইয়াছেন, আর সেই নিমিত্ত নিত্যই আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "সেই নিমিত্ত শ্রীবাস এখানে আছেন, তাহাতেই লোকে যাহা ইচ্ছা করে তাই পায়।" শ্রী শব্দে লক্ষ্মী, সুতরাং অদ্বৈত বলিতেছেন, যেথানে লক্ষ্মী বাস করেন, সেখানে লোকের অভাব নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম ঘরণীর নাম "লক্ষ্মী" তাহা পাঠক জানেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, "লক্ষ্মী এখানে আর এখন কোথায়? লক্ষ্মী ত' অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন।"

ইহাতে গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "শ্রী শব্দে ভক্তি। তোমরা সকলে যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে শ্রী অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন ইহা হইতেই পারে না।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "অবশ্য শ্রী নবদ্বীপে আছেন, আর তিনি এখন বিষ্ণুপ্রিয়া হইয়াছেন।" ইহার এক অর্থ এই যে, ভক্তিদেবী বিষ্ণুর প্রিয়া হইয়াছেন। আর এক অর্থ যে, প্রভুর ঘরণী যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, তিনিই ভক্তিমূর্ত্তি দেবী।

শ্রীগৌরাঙ্গ দ্বিতীয় অর্থ যেন না শুনিয়া, প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন, "তাহা বটে, ভক্তি প্রকৃতই বিষ্ণুপ্রিয়া। অর্থাৎ ভক্তিকে শ্রীভগবান্ ভালবাসেন।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "সেই নিমিত্ত সেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে তুমি আপন করিয়া লইয়াছ।"

এইরূপ শ্লেষাত্মক রহস্য হইতেছে, এমন সময় একজন লোক আসিয়া বলিলেন, "শচীদেবী আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অদ্য শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ঠাকুরকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি ভাগ্যবশতঃ আচার্য্য ঠাকুর আসিয়াছেন, তবে অদ্য তাঁহার শচীদেবীর ওখানে বিশ্রাম করিতে হইবে।"

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "জগজ্জননী আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইহা আমার বড় ভাগ্যের কথা। আমি শ্রীভগবানের সহিত অদ্য সুখে ভোজন করিব।"

শ্রীবাস বলিতেছেন, "আমি কি এ সুখবিলাস দেখিতে পাইব না? ভগবান অবশ্য অদ্য আমার নিমিত্ত মাপিবেন। আর যদি নিতান্ত না মাপেন, তবে জগজ্জনীর নিকট মাগিয়া লইব।"

এদিকে শ্রীঅদ্বৈতের সহিত প্রভুর গোষ্ঠীর আহার ব্যবহার ছিল না। সেই নিমিত্ত অদ্বৈতের মন জানিবার নিমিত্ত প্রভু শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "তুমি দুটো অন্ন খাবে তাহাতে বড় দুঃখ নাই, কিন্তু তাহা হইলে দুইজনের নিমিত্ত রন্ধন করিতে আচার্য্যের অধিক পরিশ্রম হইবে!"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "জগজ্জননীর বাড়ী যাইয়া আমায় রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে, ইহা আমার দুরদৃষ্ট বই নয়। জননী যদি পরিশ্রমের ভয়ে দুটো অন্ন রাধিয়া না দেন তবে আর কি করিব?"

এই ইঙ্গিত পাইয়া লোক যাইয়া শচীদেবীকে রন্ধন করিতে বলিল। এদিকে সকলে হাস্যকৌতুকে আছেন, এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসের কাণে কাণে কি বলিলেন। প্রভু হাসিয়া বলিতেছেন, "তোমরা কাণে কাণে কি পরামর্শ করিতেছ, আমি কি শুনিতে পাব না?"

শ্রীবাস বলিলেন, "আচার্য্য বলিতেছেন যে, তুমি শ্রীনিত্যানন্দকে যে রূপ দেখাইয়াছিলে, সেই রূপ দেখিতে না পাইয়া তিনি দুঃখিত হওয়ায় তুমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলে ও বলিয়াছিলে যে, তাঁহাকেও সে রূপ দেখাইবে। ইহা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে দেখাও নাই, তাহাতেই শ্রীঅদ্বৈত দুঃখিত আছেন, আর সেই কথা আমার কাণে কাণে বলিতেছেন।"

ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন, "এই যে আমাকে দেখিতেছেন, এই আমার প্রকৃত রূপ। আর শ্রীঅদ্বৈতের ইহাই প্রিয় রূপ।"

শ্রীঅদ্বৈত ইহাতে কিছু বিপদে পড়িলেন। যদি স্বীকার করেন যে, গৌর-রূপই তাঁহার প্রিয়, তবে আর অন্য রূপ দেখা হয় না। আবার ভাবিতেছেন, ঐ কথার উপরে যদি আবার অন্য রূপ দেখিতে চান, তবে গৌর-রূপের প্রতি অনাদর করা হয়। এইরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া শ্রীঅদ্বৈত কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীবাস বলিলেন "প্রভু, তুমি যা বলিয়াছ ঠিক, গৌর-রূপের মত প্রিয় আমাদের আর কোন রূপই নয়। তবে তুমি নিজ মুখে স্বীকার করিয়া এখন দেখাও না, এইজন্য শ্রীঅদ্বৈত দুঃখিত হইতেছেন।"

ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে বলিলেন, "পণ্ডিত! কবে কি অবস্থায় আমি আচার্য্যকে কি বলিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ হয় না। আবার পণ্ডিত তুমি ভাবিয়া দেখ, উন্মাদ অবস্থায় কে না প্রলাপ করে, সে কথা লইয়া সহজ অবস্থায় তাহাকে পেষণ করা কর্ত্তব্য হয় না।"

শ্রীবাস বলিতেছেন, "লোকে উন্মাদগ্রস্ত হয়, সে একরূপ ব্যাধি। তাহা দেখিলেই লোকের ভয়, ঘৃণা এবং পীড়া হয়। তোমার উন্মাদ দশা দেখিলে লোকের আনন্দ হয় এবং সমস্ত ভয় ও রোগ দূর হয়। অতএব তুমি যাহা উন্মাদ প্রলাপ বল, সেই তোমার হৃদয়ের কথা; আর তুমি যাহা এখনকার মত সহজ জ্ঞানে বল, সে তোমার সমুদায় বাহ্য।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "পণ্ডিত, তোমাকে আমি স্বরূপ কথা বলিতেছি। কোন রূপ, কি কোন বৈভব, দর্শন করান আমার ইচ্ছাধীন নহে। কিরূপে কি হয় আমি জানি না। অতএব আমি শ্যামসুন্দর রূপ কিরূপে দেখাইব? যদি আচার্য্যের ঐ রূপ দেখিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে নয়ন মুদিয়া ধ্যানে বসুন, হয়ত শ্রীকৃষ্ণ নিজ রূপ তাঁহাকে দেখাইবেন।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত, কতক কৌতুকে, কতক মনোগত ভাবে, নয়ন মুদিয়া ধ্যানে বসিলেন, আর ভক্তগণও ঐরূপ মনের ভাবে নীরব হইয়া কি হয় দেখিতে লাগিলেন। যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ যেন রহস্য করিয়া এই কথা বলিলেন, তবু ভক্তগণ ভাবিলেন যে, অবশ্যই কিছু গূঢ়রহস্য প্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই। এই জন্য সকলে শ্রীঅদ্বৈতের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

দেখেন কি, শ্রীঅদ্বৈত বসিতে বসিতে অচেতন হইলেন; এমন কি, তাঁহার শ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইল, জীবন্ত মনুষ্যের কোন লক্ষণই রহিল না। ভক্তগণ ইহাতে ভয় পাইলেন; কিন্তু দেখিতেছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলী দেখা যাইতেছে। ইহাতে দেহে প্রাণ আছে বুঝিলেন। তখন শ্রীবাস একটু ব্যস্ত হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভু! আচার্য্যের একি দশা হইল?"

প্রভু বলিতেছেন, "আর কিছু নয়, বোধ হয় হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন, আর সেই আনন্দে স্পন্দনহীন হইয়াছেন।"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! আমরা অভাগা, আমাদিগকে তোমার শ্যামসুন্দর রূপ দেখাইবে না বলিয়া গোপনে আচার্য্যকে দেখাইলে। তাহা না দেখাইলে, তাহাতে আমার কিছু দুঃখ নাই, গৌর রূপই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তবে তুমি এখন আচার্য্যকে চেতন করিয়া দাও।"

প্রভু বলিলেন, "আমি কিরূপে চেতন করাইয়া দিব? দেখ, আচার্য্যের

আপনিই চৈতন্য হইবে।" ইহা বলিতে বলিতে আচার্য্য চেতন পাইলেন। চেতন পাইয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় অর্দ্ধবাহ্য দৃষ্টে এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন। যেন কি দেখিতেছিলেন, আর দেখিতে পাইতেছেন না। পরে আপনিই বলিতেছেন, "এই যে শ্যামবর্ণ অতি সুন্দর উজ্জল মূর্ত্তি দেখিতেছিলাম, তিনি কোথায় গেলেন? তাঁহার আপাদমস্তক ও গলে বনমালা; সেই আমার নয়নানন্দ কোথা?" এইরূপে বিভোর হইয়া শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ গদগদ হইয়া বর্ণনা করিতেছেন, তখন যেন সুধা বর্ষণ করিতেছেন। অদ্বৈতের যেন তখন শত মুখ হইল, আর শতমুখ দিয়া সুধা ক্ষরিতে লাগিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা শুনিতেছেন. এমন সময় শ্রীবাস বলিলেন, "তুমি কি দেখিলে, কারে দেখিলে, স্পষ্ট করিয়া বল।"

এই কথায় শ্রীঅদ্বৈত বাহ্যজ্ঞান পাইলেন; পাইয়া বলিতেছেন, "কারে আর দেখিব? এই সম্মুখে যিনি বসিয়া আছেন ইঁহারই সমুদায় কার্য্য। আমি যে মাত্র নয়ন মুদিলাম, অমনি এই বস্তু (শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখাইয়া) আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তখন শ্যামরূপ ধরিয়া আমার নয়নে আনন্দ দিতেছিলেন। পরে আবার নিজ রূপ লইয়া বাহিরে আসিলেন, আর আমার বাহ্যজ্ঞান হইল।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "তুমি বসিয়া নিদ্রা গেলে আর স্বপ্ন দেখিলে, এখন আমি দোষের ভাগী হইলাম?"

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "আমি স্বপ্ন দেখিলাম? আমি স্পষ্ট দেখিলাম তুমি হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, আবার বাহিরে আসিলে। এখন আমাকে ভুলাইতেছ? প্রভু আমাকে আর কত দিন ভাঁড়াইবে? আমি যাহাকে ভজনা করি সে—তুমি!"

এই যে শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার প্রাণনাথকে চিনিলেন, সে চেনা চিরদিন সমান রহিল না। অল্পকাল পরে আবার তাঁহার মনে খট্‌কা উপস্থিত হইল। সেটি জীবের সৃষ্টি হইতে আবহমানকালের পুরাতন "অবিশ্বাস", —অর্থাৎ নিমাই কি সত্যই তাঁহার প্রাণেশ্বর, সেই শ্রীকৃষ্ণ? লোকে ইচ্ছা করিলেও মনে এই বিশ্বাস আনিতে পারে না। চাক্ষুষ দেখিলেও অনেক সময় বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস আনয়ন করিতে হইলে মনের একটি অবস্থা বিশেষের প্রয়োজন। কাহারও এই অবস্থা শীঘ্র, কাহারও বা বিলম্বে হয়। ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস হয় নাই, ইন্দ্রেরও হয় নাই, সুতরাং অদ্বৈতের যে নিমাইয়ের প্রতি সন্দেহ হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? আবার এমন হইতে পারে যে, এ অবিশ্বাস এই লীলার একটি অঙ্গ।

সপ্তদশ অধ্যায়

রাগিনী—কুকুভ।

উদয় হও হে, হও হে, নদিয়া-চন্দ্রমা।
ভুবন আঁধার বিনা তোমা॥
জীবনে মরণে গতি, তুমি আমার প্রাণপতি,
এ সম্পর্ক তোমা আমা।
অনাথ হইয়া, বেড়াই ঘুরিয়া,
হাসখালি গ্রামে পানু তোমা।
কোথা তুমি, কোথা আমি,
আমার প্রাণের প্রাণ তুমি,
ডাকে বলরামা॥

একদিবস শ্রীনিমাই শ্রীভগবদ্ভাবে "পুণ্ডরীক" "পুণ্ডরীক" বলিয়া ব্যাকুল হইলেন। ক্রমে প্রভু উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। যেমন স্ত্রীলোক বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে, সেইরূপ—"পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাপ, আমি আর তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না, তুমি নিদয় হইয়া আমাকে ফেলিয়া রহিয়াছ। কবে তোমাকে দর্শন করিয়া আমি নয়ন ও হৃদয় শীতল করিব।" ইত্যাদি নানারূপ কাতরোক্তি করিয়া প্রভু অতি করুণস্বরে কান্দিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ পুণ্ডরীকের নিমিত্ত এই যে স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন, ইহাতে একটি রহস্য আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে অবশ্য শ্রীমতী রাধা প্রকাশ পাইতেন; আর পুণ্ডরীকের দেহে শ্রীমতীর পিতা বৃষভানুর আবির্ভাব হইত। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে, কাজেই স্ত্রীলোকের মত, "পুণ্ডরীক বাপ" বলিয়া রোদন করিলেন। যখন "পুণ্ডরীক বাপ" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল যেন একটি স্ত্রীলোক তাঁহার পিতার শোকে বিকল হইয়া রোদন করিতেছেন। এ সমস্ত ভাবের নিগূঢ় তাৎপর্য্য সাধক ক্রমে জানিতে পারিবেন।

নিমাইয়ের করুণ রোদন শুনিবামাত্র, পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হৃদয় ফাটিয়া যাইত; সুতরাং ভক্তগণ এই রোদন শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুণ্ডরীক কে? শ্রীকৃষ্ণের এক নাম পুণ্ডরীক, কিন্তু প্রভু আবার "বিদ্যানিধি" বলিতেছেন। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া একজনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! আপনি যাঁহার নিমিত্ত রোদন করিতেছেন, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে?" তখন নিমাই একটু চেতন পাইয়া বলিতেছেন, "তোমরা সেই ভাগ্যবান ব্যক্তির কথা জানিতে চাহিতেছ? তাঁহার বাড়ী চট্টগ্রামে, এখানেও বাড়ী আছে। ধনবান লোক, চালচলন ও বাস ধনবান লোকেরই মত, সুতরাং সাধারণ লোকে

তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মহত্ত্ব জানিতে পারে না। কিন্তু এমন ভক্ত ত্রিজগতে দুর্লভ। তাঁহাকে না দেখিয়া আমি স্বস্তি পাইতেছি না। তোমরা সকলে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।" ইহাই বলিতে বলিতে নিমাই আবার বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া "বাপ পুণ্ডরীক" বলিয়া অতি কাতরস্বরে কান্দিতে লাগিলেন।

তাহার কিছুদিন পরে পুণ্ডরীক চট্টগ্রাম হইতে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে বহুতর ব্রাহ্মণ-শিষ্য, আরও অনেক লোক। বিদ্যানিধি মস্ত ভোগী, ঠিক বড় বিষয়ী লোকের মত। মুকুন্দ দত্তের বাড়ীও চট্টগ্রামে, বিদ্যানিধির এক গ্রামে। সুতরাং তাঁহার আগমন মুকুন্দ জানিলেন। পুণ্ডরীকের সহিত তাঁহার কাজেই পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। যে দিবস প্রভু "পুণ্ডরীক" বলিয়া রোদন করেন, সে দিবস মুকুন্দ সেখানে ছিলেন না। বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিলে মুকুন্দের বড় ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে প্রভুর নিকট লইয়া আসিয়া পরিচয় করিয়া দেন। ইহাই ভাবিয়া তিনি পুণ্ডরীকের সহিত দেখা করিতে চলিলেন। গদাধরের সহিত তাঁহার অত্যন্ত প্রণয়, সুতরাং তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই, আমাদের গ্রামের একজন বড় ভক্ত আসিয়াছেন, দেখা করিতে যাবে?" গদাধর বলিলেন, "এ বড় ভাগ্যের কথা, চল যাই।"

এইরূপে দুইজনে গমন করিলেন। যাইয়া দেখেন, পুণ্ডরীক অতি বড় লোক। খট্টায় দুগ্ধফেননিভ শয্যা, চারিপার্শ্বে বালিশ ও তাহার মধ্যস্থানে তিনি বসিয়া। দেখিতে পরম সুন্দর, আবার ভক্তির চর্চ্চা করিয়া সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠমাস, অতিশয় গ্রীষ্ম। দুই পার্শ্বে দুইজন ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে। মুকুন্দ ও গদাধর গমন করিলে, বিদ্যানিধি অতি আদর করিয়া তাঁহাদিগকে বসাইলেন। বিদ্যানিধি গদাধরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে মুকুন্দ বলিলেন,

"ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র, ন্যায় পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু সে ইঁহার গৌরব নহে। শিশুকাল হইতে ইনি পরম ভক্ত, আর চির-কুমার থাকিবেন ইহাই ইচ্ছা করিয়াছেন।"

গদাধরের বয়ঃক্রম তখন দ্বাবিংশতি বৎসর; রূপ প্রায় নিমাইয়ের মত; বদন সরল ও স্নিগ্ধ, দেখিলেই মন আকর্ষণ করে। তাহাতে আবার নবপ্রেম স্পর্শ করায় গদাধরের সর্ব্বাঙ্গে অমানুষিক জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। বিদ্যানিধি অনিমেষলোচনে গদাধরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর যতই দেখিতেছেন ততই তাঁহাতে আকৃষ্ট হইতেছেন।

গদাধরও বক্র-নয়নে এক এক বার বিদ্যানিধিকে দেখিতেছেন; কিন্তু যতই দেখিতেছেন ততই ব্যাজার হইতেছেন। গদাধর চিরদিন বিষয়-সুখে বিরক্ত, দেখেন বিদ্যানিধি চুলে সুগন্ধি আমলকী মাখিয়া উত্তম করিয়া ইহা বিন্যাস করিয়াছেন। প্রকাণ্ড বাটায় পান রহিয়াছে, তাহা মুহুর্মুহু চর্ব্বণ করিতেছেন। গদাধর ভাবিতেছেন, "ভাল ভক্ত দেখিতে আসিয়াছি। এখন এখান হইতে পালাইতে পারিলে বাঁচি।" গদাধরের ভাব বুঝিয়া মুকুন্দ মনে মনে হাসিতেছেন। পরে বিদ্যানিধির গৌরব দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ একটি শ্লোক সুস্বরে উচ্চারণ করিলেন। শ্লোকটি এই:—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥
পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপি সদগতিম্॥

অন্বয়ার্থঃ—"দুষ্টা পূতনা রাক্ষসী যে কৃষ্ণকে জিঘাংসাবশতঃ কালকূট মিশ্রিত স্তনপান করাইয়াও ধাত্রীযোগ্য সদ্গতি লাভ করিয়াছে, সেই দয়াময় হরি ভিন্ন অপর কাহার আশ্রয় লইব ?"

এই শ্লোক শুনিবামাত্র বিদ্যানিধি মূর্চ্ছিত হইয়া খট্টা হইতে ধূলায় পড়িয়া গেলেন ! তখন আস্তে আস্তে মুকুন্দ গদাধর প্রভৃতি সকলে বিদ্যানিধিকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি চেতন পাইয়া দাস্য-ভাবে অতি করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

"শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর মোর কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষাণ সমান।"

বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ ! হে পিতা ! হে আমার বাপের ঠাকুর ! আমার মত দীনহীন তুমি কবে উদ্ধার করিবে ? হে কাঙ্গালের ঠাকুর ! আমার কঠিন হৃদয়ে ভক্তির লেশমাত্র নাই। আমার চিত্ত তোমাতে গেল না, তাই বলে বাপ, তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না।" এই সমুদয় কথা বলিয়া কান্দিতেছেন, আর গড়াগড়ি দিতেছেন। গদাধর দেখিতেছেন, পরিধান উত্তম বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সেই সুগন্ধিলিপ্ত কেশ ধূলায় মাখামাখি হইল। আর সেই রূপবান্ পুরুষ বিদ্যানিধি, ধূলায় ধূসরিত হইলেন। তখন গদাধর বুঝিলেন যে, কৌপীন পরিলেই ভক্ত হয় না, আর মস্তকে সুগন্ধি তৈল দিলেই পাষণ্ড হয় না। ইহা বুঝিয়া গদাধর মহা ভয় পাইলেন ; ভাবিতেছেন, আমি একি অপরাধ করিলাম ! ভক্তদ্রোহী হইলাম ! আমার এ অপরাধ কিসে যায় ? তখন মুকুন্দকে কোলে করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "তুমি ভক্ত দর্শন করাইয়া আমার নয়ন সার্থক করাইলে, কিন্তু এখন আমার উপায় কি বল ? আমি উঁহার

বাহ্য ভোগ ও বিলাস দেখিয়া উঁহার প্রতি মনে মনে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। মুকুন্দ, আমি এখন মনে একটি বিষয় স্থির করিয়াছি। আমি এই বিদ্যানিধি ঠাকুরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিব। তাহা হইলে, তাঁহাকে যে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা তিনি অবশ্য ক্ষমা করিবেন।” এ কথা শুনিয়া মুকুন্দ বলিলেন, “বড় উত্তম পরামর্শ করিয়াছ।”

বহুক্ষণ পরে বিদ্যানিধি চৈতন্য পাইলেন। দেখেন, গদাধরের বদন দিয়া শত শত প্রেমধারা বহিতেছে। ইহা দেখিয়া নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া গদাধরকে দুই বাহু দিয়া ধরিয়া আপনার কোলে টানিয়া লইলেন ও তাঁহার নয়ন মুছাইতে লাগিলেন। ইহাতে গদাধরের ধারার বেগ আরও বাড়িয়া চলিল। তখন মুকুন্দ আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ব্যাপার বলিলেন। কিরূপে গদাধর পূর্ব্বে তাঁহার ভোগ ও বিলাশ দেখিয়া মনে মনে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, ও পরে সেই অপরাধ স্খালনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবেন স্থির করিয়াছেন। বিদ্যানিধি এ কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। বলিতেছেন, “বটে, ইনি, আমার নিকট দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন? বহু পুণ্যে এরূপ শিষ্য মিলে। এই সম্মুখে শুক্লদ্বাদশী আসিতেছে, সেই দিন অবশ্য ইঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিব।” তখন গদাধর ও মুকুন্দ বিদ্যানিধিকে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, এবং প্রভুকে বিদ্যানিধির কথা বলিলেন।

সেইদিন নিশিযোগে বিদ্যানিধি একাকী মলিন বস্ত্র পরিয়া নিমাইকে দর্শন করিতে চলিলেন। বিদ্যানিধি নবদ্বীপ-অবতারের জনরব মাত্র শুনিয়াছেন, তাঁহাকে কখনো দেখেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে দেখেন নাই, কি তাঁহার সহিত কোন পরিচয় নাই বলিয়া, বিদ্যানিধির মনে এই অবতার সম্বন্ধে একবারও দ্বিধা হয় নাই। নিমাই সেই পূর্ণব্রহ্ম, সেই শ্রীকৃষ্ণ,—ইহাই মনে জানিয়া বিদ্যানিধি তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিয়াছেন; সুতরাং ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেছেন,—মনে তাঁহার অনুতাপানল

জ্বলিতেছে। ভাবিতেছেন,— তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র হইবার কিছুই করেন নাই। এইরূপ ভাবিয়া মনে মনে অতি দীনভাবে, "প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর" বলিতে বলিতে প্রভুর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত। পুণ্ডরীকের অপরূপ মনের অবস্থা এখন ভক্তপাঠক ভাবিয়া দেখুন। তিনি শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিতে যাইতেছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সুখ নাই। তাঁহার মনের ভাব এইরূপ,—শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করা আর বিচিত্রতা কি? দর্শন করিলেই ত হয়? কিন্তু তাঁহাকে দর্শনে সুখ কি? অথবা তাঁহাকে কোন্ মুখে দেখিতে যাইব? যিনি আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহাকে একেবারে ভুলিয়া আছি। আর এখন তিনি নিকটে আসিয়াছেন বলিয়া দেখা করিতে দৌড়িয়াছি। অবশ্য তিনি দয়াময়, আমাকে মধুর বাক্য ব্যতীত কখনই কর্কশ বাক্য বলিবেন না, কিন্তু আমি নির্লজ্জ!"

পুণ্ডরীক মস্তক অবনত করিয়া প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইলেন। মুখ উঠাইয়া প্রভুকে দেখিবার অবকাশ পাইলেন না, কি সাহস হইল না। প্রভুর নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না, অমনি পড়িয়া গেলেন। একটু সম্বিত পাইয়া করজোড়ে বলিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"কৃষ্ণরে পরাণ মোর কৃষ্ণ মোর বাপ!
মুঞি অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ॥
সর্ব্ব জগতেরে বাপ উদ্ধার করিলে।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে॥"

বিদ্যানিধির এইরূপ আর্ত্তনাদ শুনিয়া উপস্থিত ভক্তগণ কান্দিয়া উঠিলেন। কিন্তু এ ব্যক্তি কে, ইহার নাম কি, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। তাঁহার মর্ম্মভেদী আর্ত্তি দেখিয়াই সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

এদিকে ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ, বিদ্যানিধিকে ভূমে পতিত হইতে দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে গাত্রোত্থান করিলেন, আর যদিও তাঁহার সহিত বিদ্যানিধির কখন চাক্ষুষ আলাপ নাই, তবুও যেন তিনি তাঁহার চির-পরিচিত এইরূপে "বাপ এসেছ" "বাপ এসেছ" বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন, এবং বিদ্যানিধিকে হৃদয়ে ধরিয়া, "আজ আমার বাপ পুণ্ডরীকে দেখিলাম, আজ আমার নয়ন জুড়াইল, আজ আমার বাপ আমার হৃদয়ে আসিয়া আমার তাপিত হৃদয় শীতল করিলেন,"—ইহাই বলিতে বলিতে উভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ভক্তগণ দেখিতেছেন যে,—যে ভগবান্ পুণ্ডরীকের হৃদয়-মাঝে ছিলেন, অদ্য তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া, যেন সেই ঋণ শোধ দিবার নিমিত্ত, আপনার হৃদয়ে তাঁহাকে ধরিলেন।

উভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর উভয়ে বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "অদ্য আমার বাঞ্ছা সিদ্ধ হইল, আমার বাপকে স্বচক্ষে দেখিলাম।" পুণ্ডরীকও চেতন পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িয়া স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া শান্ত করিলেন এবং তৎপরে ভক্তগণের সহিত জনে জনে মিলাইয়া দিলেন। গদাধর তখন সর্ব্বসমক্ষে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি কিরূপে মনে মনে বিদ্যানিধির প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিলেন, "প্রভু, তুমি যদি অনুমতি কর, তবে আমি ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করি।" প্রভু সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা অনুমোদন করিলেন। বিদ্যানিধির মহিমা আর কি বলিব। তিনি পুরুষোত্তম আচার্য্যের সখা ও গদাধরের গুরু। এই পুরুষোত্তমের পরিচয় পরে দিব।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কি কহব রে সখি আজুক ভাব। অযতনে মোহে হোয়ল বহুলাভ॥
একলি আছিনু হাম বনাইতে বেশ। মুকুরে নিরখি মুখ বান্ধল কেশ॥
তৈখনে মিলল গোরা নটরাজ। ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতী লাজ॥
দরশনে পুলকে পুরল তনু মোর। বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর॥

শ্রীনিমাইয়ের ভক্তভাবে ও ভগবদ্ভাবে বহুতর বিভিন্নতা। যখন নিমাইয়ের ভক্তভাব, তখন তিনি দীনের দীন, দাস্যভক্তিতে অভিভূত। গঙ্গায় স্নান করিতে যান, অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাকে প্রণাম করেন, প্রত্যহ তুলসী প্রদক্ষিণ করেন, ভক্ত দেখিলেই নমস্কার করেন। আবার যখন তাঁহার ভগবদ্ভাব, তখন ভক্তজন সেই গঙ্গাজল দিয়া তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া তুলসী চন্দন লইয়া পূজা করেন, নিমাই কিছুই বলেন না। যখন ভক্ত-ভাব তখন নিমাই ভক্তগণের জনে জনের গলা ধরিয়া, কি অদ্বৈতের চরণ ধরিয়া, কাতরভাবে নিবেদন করেন, "আমি কিরূপে উদ্ধার পাইব, শ্রীকৃষ্ণে আমার কিরূপে মতি হইবে, তোমরা বলিয়া দাও। ভক্তভাবে নিমাই জানু পাতিয়া ভক্তের নিকট দাস্যভক্তি প্রার্থনা করেন। আবার সেই নিমাই ভগবদ্ভাবে শ্রীমূর্ত্তি সমুদায় একপাশে রাখিয়া দিয়া স্বয়ং বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশন করেন ও তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তগণ চন্দন তুলসী দিয়া ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন, কিন্তু তাহাতে তিনি আপত্তি না করিয়া বরং সন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং আপনি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া, অদ্বৈতের ন্যাড়া মস্তকে শ্রীপাদ তুলিয়া দেন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ভক্তগণ যখন নিমাইকে ভগবান্ বলিয়া জানিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা আবার তাঁহাকে কিরূপে মনুষ্য বলিয়া

ভাবিয়া তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেন? এই প্রকাশের প্রকৃত অবস্থা বিবরিয়া বলিতেছি। যখন নিমাই ভগবান্‌রূপে প্রকাশ পাইতেন, তখন ভক্তগণ তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেন,—তখন তাঁহার দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইত। এই জ্যোতিঃ কখন তেজরূপে প্রকাশ পাইত, কখন-বা অতি মৃদুভাবে দেখা দিত,—এমন কি হঠাৎ উহা লক্ষ্য করা যাইত না। তখন তাঁহার আকার প্রকার ও বদনের ভাব এরূপ ভক্তি-উদ্দীপক হইত যে, তাঁহাকে যে দেখিত তাহারই তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া মনে বিশ্বাস হইত। আবার এমনও হইত যে, নিমাই সামান্য আসনে গদাধর কি নরহরির অঙ্গে হেলান দিয়া ভক্তদের সহিত একত্রে বসিয়া আছেন,—দেহের জ্যোতিঃ অতি মৃদু। ষড়ভুজ কি চতুর্ভুজ কি অন্যান্য বিভব দেখাইতেছেন না, তবুও বাহ্য কি আন্তরিক ভঙ্গী এরূপ হইয়াছে যে, নিকটে যিনি আছেন, তিনিই তাঁহাকে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি বলিয়া দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছেন।

একটু পরে নিমাই তাঁহার ভগবদ্ভাব লুকাইলেন। তখন নিমাই আর ভগবান্ রহিলেন না, একজন পরম ভক্তরূপে প্রকাশ হইলেন ; আর "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া এমন করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন যে, যাঁহারা উহা শুনিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে সে কাতরধ্বনি শুনিলে পাষাণ পর্য্যন্ত গলিয়া যাইত। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তখন তিনি এরূপ কাতর হইতেন যে সদ্য পুত্রশোকার্ত্তও তত কাতর হইতে পারেন না। তখন তাঁহার মূর্চ্ছার উপর মূর্চ্ছা হইতেছে, কথায় কথায় দাঁত লাগিতেছে, কথায় কথায় নিশ্বাস রুদ্ধ হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার নিমিত্ত তিনি যেরূপ করিতেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইত যে, শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে তদ্দণ্ডেই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি তখন ভক্তগণের গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলিতেন. "কৃষ্ণ আনিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও,—আমার প্রাণ যায়! আমাকে বুঝি তোমরা আর প্রাণে বাঁচাইতে পারিলে না!" ভক্তগণও

তখন প্রভুর প্রাণ বাহির হইল বলিয়া মহাব্যস্ত হইতেন। প্রভুর এইরূপ ভাব যদিও তাঁহারা প্রত্যহ দেখিতেন, তবুও প্রত্যহই ভাবিতেন,—'আজ বুঝি প্রভু আর বাঁচিলেন না!' যদি কোন ব্যক্তি নিমাইয়ের অপ্রকাশ অবস্থায় তাঁহাকে ভগবানের ন্যায় কি অতিরিক্ত ভক্তি করিতেন, তবে তিনি এত ক্লেশ পাইতেন যে, তাঁহাকে কোন ব্যক্তি কোনরূপ অসম্ভব শ্রদ্ধা দেখাইতে সাহসী হইতেন না।

অপ্রকাশ অবস্থায় নিমাই এরূপ ভাব দেখাইতেন যে, তিনি প্রকাশ অবস্থায় যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা যেন তাঁহার কিছুই স্মরণ নাই, কি স্বপ্নের মত কিছু কিছু মনে আছে। কারণ, তিনি প্রকাশ অবস্থার পরেই প্রায় ভক্তগণকে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "ভাই! তোমরা আমার চিরসুহৃদ! অচেতন হইয়া আমি ত কোন প্রলাপ বকি নাই? আমি যদি অচেতন অবস্থায় তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি তোমরা কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবে,—আমার এ দেহ তোমাদের। আর যদি আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণে কোন অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন তোমরা আমাকে সতর্ক করিও, যেন আমার কোনরূপ কুমতি না হয়,—কারণ আমি আমার স্ববশে নাই।" ইহাতে বোধ হইত তাঁহার কিছু কিছু মনে থাকিত। "কুমতি না হয়" ইহার অর্থ এই যে, "আমি কৃষ্ণ" এরূপ অভিমান যেন আমার কখন না হয়।

ভক্তগণ সকল কথা গোপন করিয়া বলিতেন যে, তিনি কিছু চাঞ্চল্য করেন নাই। তাঁহারা নিমাইয়ের তখনকার সেই আর্ত্তি দেখিয়া ভাবিতেন যে, যদি তাঁহারা নিমাইকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন, অর্থাৎ তিনি বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া ভগবানের পূজা লইয়াছেন এ কথা জ্ঞাত করেন, তবে অনর্থ ঘটিবে,—হয়ত নিমাই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। এই সব ভাবিয়া নিমাইয়ের অপ্রকাশ অবস্থায় সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি

করিতেন বটে, কিন্তু ভগবান্‌রূপে ভক্তি করিতেন না। কেহ কেহ বা প্রকাশ অবস্থায় তাঁহাকে ভগবান বলিয়া ভাবিতেন, আবার অপ্রকাশ অবস্থায় তাহা ভুলিয়া যাইয়া, তাঁহাকে শুদ্ধ একজন ভক্তমাত্র মনে করিতেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণলীলার একটি কাহিনী মনে উদয় হইতেছে।

শ্রীনন্দের কোলে শ্রীকৃষ্ণ ঘুমাইয়া। নন্দের নিদ্রা হইতেছে না, তিনি তাঁহার পুত্রের শিশুকালাবধি সমুদায় অলৌকিক কার্য্যের কথা ভাবিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি দিব্য বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার শিশুপুত্র তাঁহার পুত্র নহেন, স্বয়ং শ্রীভগবান্। মনে এই ভাব হইবামাত্র তাঁহার ভয় হইল, তখন উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিবেন ইহারই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ সমুদায় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ভুলাইবার নিমিত্ত একটি ছল পাতিলেন। ঠিক সেই সময় একটি বিড়াল ডাকিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেই ডাক লক্ষ্য করিয়া যেন ভয় পাইয়া "বাবা ও কি ডাকে, আমার ভয় করে" বলিয়া নন্দকে জড়াইয়া ধরিলেন। নন্দ অমনি সমুদায় ভুলিয়া গেলেন। তখন কৃষ্ণকে কোলে করিয়া বলিতেছেন, "ভয় কি বাপ ? এই যে আমি আছি।"

এইরূপে ভক্তগণ শ্রীনিমাইয়ের প্রকাশাবস্থায় তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজা করিয়া, তাঁহার অপ্রকাশাবস্থায় পূর্ব্বকার কথা ভুলিয়া যাইতেন। কেহ অল্প ভুলিতেন, কেহ অধিক ভুলিতেন. কেহ বা একেবারে ভুলিতেন। যথা, শচীমা নিমাইকে গর্ভে ধারণ ও পালন করিয়াছিলেন, তিনি নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ক্ষণিক ভুলিতেন মাত্র, আবার তাঁহার নিমাইয়ের উপর বাৎসল্য ভাবের উদয় হইত। যাঁহারা অল্প ভুলিতেন, তাঁহারা মনে মনে তর্ক করিতেন যে, নিমাই কি সত্যই শ্রীভগবান্? না স্বপ্নে দেখিলাম ? যাঁহারা অধিক ভুলিতেন, তাঁহারা মনে সাব্যস্ত করিতেন যে নিমাইয়ের অদ্ভুত শক্তি, যেন স্বয়ং শ্রীভগবান্। শ্রীঅদ্বৈতের মনের ভাব

বহুকাল ধরিয়া এইরূপই ছিল। যখন তিনি নিমাইয়ের সন্মুখে আসিতেন, তখন শ্রীভগবান্ বলিয়া পূজা করিতেন ; কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে দূরে গিয়া মনের মধ্যে নানাবিধ তর্ক দ্বারা সাব্যস্ত করিতেন যে, কল্যকার নিমাই, জগন্নাথের পুত্র, সে কিরূপে শ্রীভগবান হইবে? মুকুন্দও এইরূপ একজন ছিলেন। নিমাই আম্র মহোৎসব করিতেন। একটি আম্রের আঁটি সন্মুখে রাখিয়া জোরে করতালি দিতেন। দেখিতে দেখিতে ঐ আঁটি হইতে বৃক্ষ হইত ও ঐ বৃক্ষে প্রায় দুইশত উত্তম আম্রফল ধরিত, আর ভক্তগণ ঐ ফলগুলি শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতেন। এইরূপ প্রত্যহ আম্র মহোৎসব হইত। একদিন শ্রীনিমাই শ্রীভগভাবে মুচকি হাসিয়া মুকুন্দকে বলিতেছেন, "মুকুন্দ! তুমি নাকি এই আম্র মহোৎসবকে ইন্দ্রজাল বল?" মুকুন্দ লজ্জা পাইয়া "আমৃতা আমৃতা" করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ নিমাইয়ের অপ্রকাশ সময়ে তাঁহাকে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন মাত্র ভাবিতেন। কিন্তু প্রকাশের সময় ঐরূপ ভাবিতে কাহারও সাধ্য হইত না। এমন কি, তখন অনায়াসে গঙ্গাজল লইয়া তাঁহার চরণ ধুইতে কাহারও শঙ্কা হইত না। তাঁহারা যে শ্রীনিমাইয়ের পদে গঙ্গাজল তুলসী দিয়া পূজা করিতেন, ইহাই অব্যর্থ প্রমাণ যে, তখন নিমাইয়ের ভগবত্তায় তাঁহাদের তিলমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

এখন আর এক কথা হইতেছে। নিমাই কি অসরল? তাহা না হইলে—একবার "আমি সেই" বলিয়া, আবার মুহূর্ত্ত পরে ভক্তগণের নিকট দীনভাবে "কৃষ্ণ পাইলাম না" বলিয়া, রোদন করিতেন কেন? নিমাই অসরল নহেন। অসরল হইলে এইরূপ বঞ্চনা বরাবর চলিত না। যখন নিমাই বলিতেন, "আমি সেই," তখন ভক্তগণ বুঝিতেন, নিমাই সরল ভাবেই বলিতেছেন। আবার যখন বলিতেন, "আমাকে কৃষ্ণ দিয়া প্রাণে বাঁচাও," তখনও ভক্তগণ মুখ দেখিয়া বুঝিতেন, নিমাই সরল ভাবেই আর্ত্তি

করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীনিমাই যখন ভগবদ্ভাব লুকাইতেন, তখন ঐশ্বর্য্যভাবও চলিয়া যাইত, এবং নিমাই ভক্তভাবে দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে রোদন করিতেন।

একদিন সকালে স্নানাহ্নিকের পর নিমাই শ্রীবাসের বাড়ীতে বসিয়া আছেন। ভক্তগণ একে একে আসিয়া মিলিলেন। সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন, শ্রীনিমাই ভগবদ্ভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন। তখন সকলে সভয়ে প্রভুর বদন পানে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে প্রভু কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন সকলে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে দিবস একটী অদ্ভুত ঘটনা হইল, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিয়া পুনঃ ভাঙ্গে॥
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে॥
আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া॥
সাত প্রহরিয়া ভাবে ছাড়ি সর্ব্ব মায়া।
বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্যান্য দিন নিমাই পূর্ব্বে অচেতন হইতেন, ও সেই অবস্থায় বিষ্ণুখট্টায় বসিতেন। কিন্তু সে দিবস যেমন বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, অমনি আস্তে আস্তে উঠিয়া সচেতন অবস্থায় খট্টায় বসিলেন।

সেদিন শ্রীভগবান্ সাত প্রহর প্রকাশ ছিলেন। অন্যান্য দিন অল্পক্ষণ প্রকাশ হইয়া লুকাইতেন, কিন্তু সে দিবস প্রভু প্রাতে এক প্রহরের সময় প্রকাশ হইয়া, পর দিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অপ্রকাশ হইলেন। ইহাকে "সাত প্রহরিয়া ভাব" বা "মহাপ্রকাশ" বলে।

তখন প্রভুর বহুতর ভক্ত হইয়াছেন। সকলে সমুদায় কার্য্য ছাড়িয়া তাঁহার নিকট দিবানিশি থাকেন। খট্টায় বসিয়া প্রভু আপনাকে অভিষেক করিতে ভক্তগণকে আজ্ঞা করিলেন। সকলে গঙ্গায় জল আনিতে দৌড়িলেন। শত শত ঘট জল আনিয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনা পূরিয়া গেল। স্ত্রী পুরুষে, দাস দাসীতে জল আনিতেছে। প্রভু উত্তম পিঁড়ির উপরে স্নান-মণ্ডপে বসিয়া আছেন। গদাধর ও মুরারি এবং গর্ব্বিতা নারীগণ তাঁহাকে সুগন্ধি তৈল মাখাইতেছেন। পাছে শ্রীভগবানের মস্তকে রৌদ্র লাগে, এই নিমিত্ত নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীবাসের দাসী, দুঃখী, শীঘ্র শীঘ্র জল বহিয়া আনিতেছে। কলসী রাখিয়া পরিশ্রমে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িতেছে, প্রভুর বদন দেখিতেছে, ও নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছে। প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণকে বলিলেন,—"অদ্যাবধি আমি উহার নাম 'দুঃখী' স্থানে 'সুখী' রাখিলাম"। সকলে আনন্দিত হইয়া দুঃখীর ভাগ্যকে শ্লাঘা করিতে লাগিলেন। সুখী লজ্জা পাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্দিয়া কান্দিয়া আবার জল আনিতে গেল। পরে বাদ্য-কোলাহলের, অভিষেকের গীতের ও নারীগণের হুলুধ্বনির মধ্যে নিমাইয়ের মস্তকে সকলে জল-সেচন করিলেন। বাসুঘোষ সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বর্ণনা শ্রবণ করুন :—

"তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরী।
গোরা অঙ্গে লেপন করে নব নব নারী॥
সুবাসিত জল আনি কলসি পূরিয়া।
সুগন্ধি চন্দন আনি তাহে মিশাইয়া॥
জয় জয় ধ্বনি দিয়া ঢালে গোরা গায়।
শ্রীঅঙ্গ মুছাঞা কেহ বসন পরায়॥
সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়।
মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায়॥"

আর একটী গীত শ্রবণ করুন :—

"শঙ্খ দুন্দুভি বাজয়ে সুস্বরে।
গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি।
নগরের নারীগণ আনে অর্ঘ্যথালি॥
নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত।
ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত॥
গোরাচাঁদের মুখ সবে করে নিরীক্ষণে।
গোরা অভিষেক রস বাসুঘোষ ভণে॥"

এই সময় প্রধান লোকের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের যে বহুতর ভক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম করিতেছি, যথা,—দুই প্রভু (নিতাই ও অদ্বৈত), গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি, গঙ্গাদাস, প্রভুর মাসীপতি চন্দ্রশেখর, প্রভুর চিরদিনের সঙ্গী পুরুষোত্তম আচার্য্য (স্বরূপ দামোদর), বক্রেশ্বর, দামোদর, জগদানন্দ, গোবিন্দ, মাধব, বাসুঘোষ, সারঙ্গ ইত্যাদি। হরিদাসও তখন প্রভুর শরণাগত হইয়াছেন। হরিদাসের কাহিনী এখানে কিছু বলিতেছি :—

হরিদাসের বাড়ী ছিল এখনকার বনগ্রাম মহকুমার অধীন বূঢ়ন গ্রামে। ইনি ব্রাহ্মণের পুত্র,—পিতৃমাতৃহীন বলিয়া মুসলমান কর্ত্তৃক প্রতিপালিত, কাজেই হরিদাস মুসলমান। কিন্তু হরিদাস ক্রমে পরম সাধু হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভজন হইল, উচ্চ করিয়া প্রায় দিবানিশি কেবল হরিনাম জপ করা। হরিনামে তাঁহার ভক্তির কথা কি বলিব। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস, যে কোন ব্যক্তি কোন গতিকে হরিনাম করিলেই তরিয়া যাইবে। নাম-জপ করা ত দূরের কথা, তাঁহার বিশ্বাস, নাম শুনিলেও জীব উদ্ধার হইয়া যাইবে ;—

শুদ্ধ মনুষ্য নয়, জীবমাত্রেই। এইজন্য তিনি উচ্চ করিয়া নাম জপিতেন। তিনি বেনাপোলের জঙ্গলে (বনগ্রামের নিকট, এখন যেখানে রেলওয়ে ষ্টেশন) কুটীর বান্ধিয়া এইরূপে নামগ্রহণ করিতেন। তাঁহার কঠোর ভজন দেখিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য সেখানকার দুষ্ট জমিদারের ইচ্ছা হইল। এই নিমিত্ত সে একজন বেশ্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইল। বেশ্যা আসিয়া হরিদাসকে দেখিবামাত্র তাহার মন নির্ম্মল হইল। তখন সে হরিদাসের চরণে শরণ লইল। হরিদাস তাহাকে এই কুটীরে বাস করাইয়া ও হরিনাম করিবার উপদেশ দিয়া, সেই দুষ্ট জমিদারের অধিকার ছাড়িয়া স্থানান্তরে গেলেন।

এদিকে মুসলমান কাজী মুলুকপতির কর্ণে এ কথা গেল যে, হরিদাস মুসলমান-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়াছেন। কাজী ইহা শুনিয়া ঠাকুর হরিদাসকে ধরিয়া লইয়া গেল। হরিদাস মুলুকপতির মন দ্রব করিলেন। কিন্তু তাহার মন্ত্রী গোরাই কাজীর মন বজ্র-সমান কঠিন রহিল। এই গোরাই কাজী মুলুকপতিকে বলিল, "হরিদাসকে যদি দণ্ড না করেন, তবে মুসলমানদিগের বড় অপমান হইবে।" মুলুকপতি শেষে বাধ্য হইয়া হরিদাসকে দণ্ড দিতে স্বীকার করিলেন। দণ্ডাজ্ঞা হইল প্রাণবধ, কিন্তু যেন তেন প্রকারে প্রাণবধ নয়,—তাঁহাকে বাইশ বাজারে লইয়া প্রত্যেক বাজারে বেত্রাঘাত করিতে হইবে, এবং এইরূপ বেত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণবধ করিতে হইবে। এ দণ্ড এমন কঠোর যে, দুই তিন বাজারে বেত মারিতে মারিতেই অপরাধীর প্রাণ বাহির হইয়া যাইত।

তখন গোরাই কাজী হরিদাসকে বলিল, "যদি তুমি এখনও কলমা পড় আর হরিনাম ছাড়, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব, আর সম্মানের সহিত রাজ-সরকারে রাখিব।" হরিদাস সদর্পে বলিলেন, যথা চৈতন্যভাগবতে—

"খণ্ড খণ্ড হয়ে যদি যায় দেহ প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥"

তখন হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিতে লইয়া চলিল। হরিদাস হরিনাম করিতে লাগিলেন। হরিদাসের অঙ্গে বেত্রাঘাত হইতে লাগিল। কিন্তু পাঠক মহাশয় মনে ক্লেশ পাইবেন না, হরিদাসের পৃষ্ঠে বেত্র পড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি একটুও দুঃখ পাইতেছিলেন না। হরিদাস শ্রীভগবানের বড় প্রিয়। এই অবতারে তাঁহার এক একজন ভক্তদ্বারা এক এক ভজনাঙ্গের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছিলেন। নাম-মাহাত্ম্য হরিদাস দ্বারা দর্শাইয়াছিলেন। সেই হরিনামের নিমিত্ত তিনি বেত্র খাইতেছেন, তাঁহার আনন্দের অবধি নাই। কাজেই বেত্রের আঘাতে তাঁহার অঙ্গে ব্যথা লাগিতেছে না। স্ত্রী-পুত্রকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি অঙ্গে আঘাত লাগে, তাহাতে ব্যথা লাগে না। হরিদাসের নিকট হরিনাম স্ত্রী-পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়। বিশেষতঃ হরিদাসের যে অবস্থা, ইহাতে তিনি বেদনা পাইলে শ্রীহরিকে কে ভজনা করিবে? অনেকে ভগবানের নাম করিয়া প্রাণ দিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে ভগবানের জন্য নহে। শ্রীভগবানের নিমিত্ত প্রাণ দেওয়া যায় না, কারণ প্রাণ দিতে গেলেই তিনি রক্ষা করেন। দেখা যায়, যাঁহারা ভগবানের নামে প্রাণ দিয়াছেন, সে ভগবানের নিমিত্ত নয়, দম্ভ কি অহঙ্কারের জন্য।

হরিদাস ভাবিতেছেন, "এরা কি মহাপাপী! আমি ত ইহাদের কাছে কোন অপরাধ করি নাই, তবে আমাকে এরূপ নির্দ্দয়তাব সহিত প্রহার কেন করিতেছে? ইহাদের উপায় কি হইবে?" তখন "ইহাদের উপায় কি হইবে" ভাবিয়া হরিদাস এরূপ অভিভূত হইয়াছেন যে, তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি সেই বেত্রধারী হত্যাকারিগণের মঙ্গল কামনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরির নিকট এইরূপ নিবেদন করিতে লাগিলেন,—"প্রভু! আমাকে মারিয়া ইহারা কুকর্ম্ম করিতেছে। এই কুকর্ম্মে ইহাদের দুর্গতির একশেষ হইবে। প্রভু, ইহাদের দুর্গতির আমিই

কারণ হইলাম। প্রভু, তোমাকে ভজন করার কি এই ফল? তুমি কৃপা করিয়া তোমার এই নির্ব্বোধ জীবগণকে পরিত্রাণ কর।"

এরূপ অদ্ভুত প্রার্থনা করাতে, যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল এবং যাহারা তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল, সকলেই স্তম্ভিত হইল। শ্রীভগবান্ হরিদাসের প্রতি কৃপার্দ্র হইয়া তাঁহাকে ধ্যানানন্দ দিলেন ও সেই আনন্দে হরিদাস অচেতন হইলেন। মুসলমানগণ তখন তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া চলিয়া গেল। হরিদাস চেতনা পাইয়া তীরে উঠিলেন। তাহার পর শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গ পাইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিলেন। ক্রমে নিমায়ের কথা শুনিয়া নবদ্বীপে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। হরিদাস ভুবনবিখ্যাত ভক্ত, সকলে তাঁহার নাম শুনিয়াছেন। হরিদাস আসিলে ভক্তগণ তাঁহাকে নিমাইয়ের নিকট লইয়া গেলেন। নিমাই তাঁহাকে দেখিয়া অতি আদর করিয়া বসিতে আসন দিলেন। যদিচ তখন হরিদাস সম্পূর্ণরূপে নিমাইকে আত্মসমর্পণ করেন নাই, তবু তিনি আসনে কোন ক্রমে বসিলেন না, বরং সেই আসন মস্তকে ধরিলেন। পরে নিমাই তাঁহাকে উত্তম করিয়া ভোজন করাইলেন, করাইয়া স্বহস্তে তাঁহার অঙ্গে চন্দন ও গলায় ফুলের মালা দিলেন! নিমাই হরিদাসকে সেবা করিলেন বটে, কিন্তু হরিদাসও সেই সময় নিমাইয়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

এইরূপে যেখানে যত ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা যত বড়ই হউন না কেন, সকলে আসিয়া সেই তেইশ বৎসরের ব্রাহ্মণকুমারকে মন প্রাণ দেহ অর্পণ করিলেন। এই হরিদাসের চরিত্র স্মরণে ভুবন পবিত্র হয়। তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়াছিলেন। আবার শ্রীঅদ্বৈত হরিদাসকে লইয়া নবীন ব্রাহ্মণকুমারের শরণ লইলেন। যেমন ক্ষুদ্র নদী বড় নদীতে প্রবেশ করে, আর বড় নদী এইরূপ অনেক ক্ষুদ্র নদীসহ সাগরে প্রবেশ করে,—সেইরূপ তখনকার বৈষ্ণবগণের রাজা, শ্রীঅদ্বৈত, হরিদাস

প্রভৃতি ভক্তগণকে লইয়া, সেই ব্রাহ্মণবালক শচীনন্দনের চরণে আশ্রয় লইলেন। সেই মহাপ্রকাশের দিন অদ্বৈত ও হরিদাস সেখানে উপস্থিত।

প্রভুর স্নান হইলে অতি সূক্ষ্ম ধৌতবস্ত্রে তাঁহার অঙ্গ মুছিয়া দেওয়া হইল। তখন সকলে প্রভুকে উত্তম বস্ত্র পরাইয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে পূর্ব্বেই বিষ্ণুখট্টা রাখা হইয়াছে, আর উহাতে মনোহর দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতা রহিয়াছে। নিমাই সেই খট্টায় বসিলেন। ঘরে পর্দ্দা দেওয়ায় অভ্যন্তরে একটু অন্ধকার হইয়াছে, তবে তাঁহার অঙ্গের আভায় ঘর প্রায় দিবার ন্যায় আলোকিত। অঙ্গের তেজ দিবাকরের ন্যায় প্রখর হইলেও উহা লক্ষ চন্দ্রের কিরণের ন্যায় সুশীতল। যেমন সকলে অভিষেকানন্দে ভু, গদাধর তখন ফুলের মালা ও ভূষণ প্রস্তুত করিতেছেন। নিমাই য় বসিলে, তিনি তাঁহার মুখ তিলকে সুশোভিত করিলেন। পরে তাঁহার মস্তকে ও গলায় ফুলের মালা, আঙ্গুলিতে ফুলের অঙ্গুরী, বাহুযুগলে ফুলের তোড়া দিয়া নিমাইকে সাজাইলেন। নিত্যানন্দ শিরে ছত্র ধরিলেন এবং শ্রীখণ্ডের নরহরি চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

মনে ভাবুন, যদি অতি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন কোন মহারাজা হঠাৎ কোন দরিদ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েন, তবে সেই কাঙ্গাল, শ্রীমহারাজকে কিরূপ সেবা করিবে, ভাবিয়া দিশেহারা হয়। সে ব্যস্ত হইয়া মাদুর পাতিয়া দেয়, আর ভগ্ন পাখা দ্বারা তাঁহাকে বাতাস দিতে থাকে। ঘরে যদি চিপিটক কি মুড়ি থাকে, তবে উহা আনিয়া সম্মুখে ধরে। তখন সেই মহারাজ যদি মহাশয় ব্যক্তি হয়েন, তবে তিনি এ কথা বলেন না যে "ছি! আমি এরূপ মাদুরে কিরূপে বসিব, কিংবা আমি মুড়ি কিরূপে খাইব?" তাহা না করিয়া তিনি সেই মাদুরে উপবিষ্ট হয়েন, হইয়া সেই দরিদ্রকে বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করেন যে, মাদুরে বসিয়া তিনি বড় আরাম পাইতেছেন। সেইরূপ শ্রীভগবান্ অতি বড় মহাশয়। শুনিয়াছি দুর্ব্বল জীবে তাঁহাকে

যে সমস্ত সেবা করে, তাহা দেখিলে তাঁহার হৃদয় দ্রব হয়, ও তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন।

আবার দরিদ্র ব্যক্তি যদি ধনবান লোককে নিমন্ত্রণ করেন, তবে কি তিনি উহা গ্রহণ করেন না? তখন কি তিনি বলেন, "আমার অভাব কি যে তোমার বাড়ী ভোজন করিতে যাইব?" তিনি কি বাড়ীতে উত্তম দ্রব্য ভোজন করেন বলিয়া দরিদ্রের অন্ন গ্রহণ করিয়া মুখ বিকৃত করেন? ধনবান ব্যক্তি যদি মহাশয় হয়েন, তবে তিনি দরিদ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, আর তাহার সেই সামান্য ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কিন্তু যিনি যত বড় মহাশয় হউন শ্রীভগবানের ন্যায় মহাশয় ত্রিজগতে আর কেহ নাই। সুতরাং জীবগণ তাঁহাকে যথাসাধ্য সেবা করিলে, তিনি তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া একথা বলেন না যে, "তোমরা আমায় কি আর দিবে? এ সমুদায় ত আমারই দ্রব্য।" কারণ তিনি ত্রিজগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহাশয়, মধুর-প্রকৃতি ও মধুর-ভাষী।

খট্টার উপরে উত্তম শয্যায় নিমাই বসিয়া চন্দ্রমুখে মধুর হাসিয়া ভক্তগণকে শুধু যে অভয় দিতেছেন এরূপ নয়, একেবারে তাহাদের চিত্তহরণ করিতেছেন। নিমাই যাহার পানে চাহিতেছেন, তাহার চিত্ত কাড়িয়া লইতেছেন। আর সেই ব্যক্তি আপন চিত্তকে তল্লাস করিতে গিয়া দেখিতেছেন যে, খট্টায় যিনি বসিয়া আছেন, তিনি বাহিরেও বসিয়া আছেন, আবার তাঁহার হৃদয়ের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছেন।

ভক্তগণ পরমানন্দে ভাসিতেছেন। শ্রীভগবান্ সম্মুখে বসিয়া। সকলের তাঁহাকে পূজা করিতে ইচ্ছা হইল। তুলসী, চন্দন, ফুল, বস্ত্র, স্বর্ণ, ধাতুপাত্র দিয়া যাহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ পূজা করিতে লাগিলেন।

"পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি পরমানন্দে ডুবিলেন সর্ব্ব দাস॥

সর্ব্বমায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন—পূজয়ে ভক্তবৃন্দ ॥
দিব্য গন্ধ আনি কেহ লেপে শ্রীচরণে।
তুলসী কমলে মেলি পূজে কোন জনে ॥
কেহ রত্ন সুবর্ণ রজত অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার ॥
পট্ট, নেত, শুক্ল, নীল সুপীত বসন্।
পাদপদ্মে দিয়া নমস্কারে সর্ব্বজন ॥"—চৈতন্যভাগবত।

এইরূপে শত শত জনে শ্রীচরণে ফুল ঢালিতেছেন, আর গলায় ফুলের মালা দিতেছেন। শত শত জনে মন্ত্র পড়িতেছেন, কি স্তব করিতেছেন: কিন্তু পরস্পরে হুড়াহুড়ি হইতেছে না। সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত এই যে, পরস্পরে কেহ কাহারও সংবাদ লইতেছে না। সকলেরই অচেতন অবস্থা। পার্শ্বে যে তাঁহার সহচরগণ আছেন,তাহা কাহারওলক্ষ্যনাই। সকলেই ভাবিতেছেন ঘরে কেবল তিনি আর শ্রীভগবান্ শুধু তা নয়, তিনি ভগবানের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর ভগবান্ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। এত লোক যে কলরব করিতেছে, ইহা কেহ শুনিতেও পাইতেছেন না ; শতজনে কথা বলিতেছেন,আর শত জনেরই সহিত যেনশ্রীভগবান্কথাবলিতেছেন।

যাঁহার যেরূপ স্ফর্ত্তি হইতেছে, তিনি সেইরূপ প্রভুকে আহ্বান করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "প্রভু!" কেহ বলিতেছেন "নাথ!" কেহ বলিতেছেন, "ঠাকুর!" কেহ ফুলের মালা হাতে করিয়া বলিতেছেন, "ফুলের মালা ধর, গলায় পর।" তখন প্রভু গলায় তাঁহার যে মালা ছিল তাহা সেই ভক্তকে নিজ হস্তে পরাইতেছেন, আর আপনি মস্তক অবনত করিয়া ভক্তকে মালা পরাইতে দিতেছেন। কেহ দৌড়িয়া বাজার হইতে একখানি উত্তম পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীনিমাইকে উহা দিয়া

সেই ভক্ত বলিতেছেন, "এই বস্ত্র পরিধান কর।" নিমাইয়ের পরিধানও পট্টবস্ত্র। তিনি সেই বস্ত্রখানি পরিধান করিতেছেন, আর পরিধেয় বস্ত্রখানি সেই ভক্তকে দিতেছেন। ভক্ত সেই বস্ত্র-প্রসাদ পাইয়া মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এইরূপে ভক্তগণ যেমন উপহার দিতেছেন, তেমনি উপহার পাইতেছেন। যেমন উপহার উপস্থিত হইতেছে, প্রভু অমনি উহা বিতরণ করিতেছেন। শ্রীভগবান কাহারও নিকট ঋণী থাকিতেছেন না।

অনেকে আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন, নিবেদন করিয়াও দিতেছেন। কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা যে, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের সাক্ষাতে উহা ভোজন করেন! তখন নিমাই হাত পাতিয়া আহার চাহিলেন, আর ভক্তগণ যেন বাঁচিলেন। এ পর্য্যন্ত কিরূপে ভগবানের সেবা করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া সকলে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাকে ভক্তগণ খাওয়াইতে লাগিলেন। প্রভু ভোজন করিবেন শুনিয়া অনেকে নগরে দৌড়িলেন। যিনি যে ভাল দ্রব্য পাইলেন, অমনি তাহা প্রভুর নিমিত্ত ক্রয় করিলেন। জ্যৈষ্ঠমাস, ফলের অভাব নাই; আবার নদীয়া নগরে সন্দেশ, দুগ্ধ, ক্ষীর, দধি, ছানারও অভাব নাই। যদিও নারিকেল তত সুলভ নয়, তবুও জ্যৈষ্ঠমাসের দুই প্রহরের সময় নারিকেলের জলে শর্করা মিশাইয়া প্রভুকে পান করাইতে সকলেরই ইচ্ছা হইতেছে। এই নিমিত্ত শত শত ডাব উপস্থিত। উত্তম সুপক্ক কত শত চাঁপা কলার কাঁদি, ঝুড়ি ঝুড়ি আম ইত্যাদি আনা হইল। বলা বাহুল্য শ্রীবাসের ঘর এইরূপে পুরিয়া গেল। যিনি যাহা আনিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা প্রভুকে উহা সমুদায় খাওয়াইবেন; প্রভু একটুও রাখিতে পারিবেন না;—রাখিলে ভক্ত মাথা কুটিয়া মরিবেন। একজন আম কাটিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন, প্রভু তাহা খাইলেন। একজন একটি ক্ষীরের পাত্র ধরিলেন, প্রভু খাইলেন। একজন পাথরের বাটি করিয়া ডাবের জল দিলেন, প্রভু পান করিলেন।

এখন বিবেচনা করুন, ভগবান্‌-কাচ-কাচন সহজ ব্যাপার নহে। নিমাই তখন ভগবান্‌, কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারেন না।

"দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ।
দশ বার পাঁচ বার দেয় কোন দাস ॥"—চৈতন্যভাগবত।

মনে ভাবুন শ্রীভগবান্‌ বসিয়া ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। একজনের দ্রব্য লইবেন, আর একজনের লইবেন না,—ইহা সম্ভব নয়। তিনি ত জগন্নাথ? সকল জগতের নাথ? কাজেই শ্রীনিমাই কাহাকেও "না" বলিতে পারেন না। আবার একজন সন্দেশ খাওয়াইয়া পরে আম দিতেছেন। মানুষে কি মিষ্ট খাইয়া টক খাইতে পারে? আমরা তোমরা হইলে বলিতাম, "আমাকে ক্ষমা দাও, আমি আর খাইতে পারি না," কি "এই মিষ্ট খাইলাম, আবার কিরূপে আম খাইব? আমাকে কত খাওয়াইবে? আমার উদরে কত ধরিবে?" কিন্তু ভগবান, যিনি বিশ্বম্ভর, তিনি কিরূপে বলিবেন, "আমি আর খাইতে পারি না?" আবার ভক্ত কোন দ্রব্য হাতে দিলে তাহা তিনি কিরূপে ফেলিয়া দিবেন? তাহা হইলে তাঁহার ভক্তবৎসল নামে কলঙ্ক হয়; সুতরাং যিনি যাহা দিতেছেন, নিমাই সমুদায় ভোজন করিতেছেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—

সহস্র সহস্র ভাণ্ডে দধি ক্ষীর দুগ্ধ।
সহস্র সহস্র কান্দি কলা কত মুদ্গ ॥
কতেক বা সন্দেশ কতেক বা ফল মূল।
কতেক সহস্র বাটা কর্পূর তাম্বুল ॥
কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র।
কেমনে খায়েন নাহি জানে ভক্তবৃন্দ ॥"

কোন ভক্ত সেখানে উপস্থিত না থাকিলে শ্রীভগবান্‌ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিতেছেন। কখন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, কিছুই করিতেছেন না, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না,

এবং কাহারও বাক্য শ্রবণ করিতেছেন না। তখন ভক্তগণ যাঁহার যাহা ইচ্ছা করিতেছেন। আনন্দে পরিপূর্ণ বলি কেন? না, যাঁহারা বদন দেখিতেছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই বস্তু, যিনি বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া আছেন, ইঁহার কোন দুঃখ নাই, কেবল আনন্দ। আর সে আনন্দের ক্ষয় নাই, অন্ত নাই। ভক্তগণ দেখিতেছেন, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আইসে, সেইরূপ প্রভুর বদনে আনন্দের উপর আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে, আর সেই আনন্দে, যেন তিনি টলমল করিতেছেন। তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন তিনি কত আদরের ধন; আর তিনি যে আদরের তাহা তিনি জানেন। কখন মুরলীর রব করিতেছেন, আর ভক্তগণের প্রেমানন্দে ধাবা পড়িতেছে। যখন ভগবান্ কোন কথা বলিতেছেন, তখন সকলে নীরব হইয়া কাণ পাতিয়া শ্রবণ করিতেছেন। সে কথা সঙ্গীত হইতেও মধুর।

মহাপ্রকাশের দিনে শ্রীভগবানের যে আনন্দ প্রকাশ হয়, ইহা কবি কর্ণপূর তাঁহার নাটকে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে ভাবিতে পারেন যে, শ্রীভগবান্ বসিয়া বসিয়া কি করেন? তাঁহার নিদ্রাও নাই, আর কোন কার্য্যও নাই, তবে তিনি দিন যাপন কিরূপে করেন? কেহ এ কথাও ভাবিতে পারেন যে, জীবগণ পরকালে যাইয়া কিরূপে সময় যাপন করে? শ্রীভগবানের যে কিরূপে দিন যায় মহাপ্রকাশের দিনে তাহার কতক আভাস ভক্তগণ পাইলেন! তাঁহারা দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্‌রূপে, আনন্দের তরঙ্গে ভাসিতেছেন। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিতেছে, আর যেন সেই তরঙ্গে শ্রীভগবান্‌কে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।

ভক্তগণ যেন চিরদিনের সুহৃদ পাইলেন! শুধু তাহাও নয়, যেন চিরদিনের সুহৃদ হারাইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে আবার পাইয়াছেন। শুধু তাহাও নয়, ভক্তগণ দেখিতেছেন, সম্মুখের বস্তটী বড় চিত্তাকর্ষক, বড়

চক্ষু ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর। বস্তুটী আপাদমস্তক সুগঠিত, সুঠাম ও লাবণ্যে আবৃত। আবার দেখিতেছেন, তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ নিখুঁত ও মনোহর। সেই নিমিত্ত যখন যে অঙ্গে দৃষ্টি পড়িতেছে, চক্ষু সেইখানেই থাকিতেছে, অন্য দিকে যাইতে চাহিতেছে না। সকলে ভাবিতেছেন, কোন্ কারিগর এ অপরূপ ছবিটী আঁকিল? শ্রীঅঙ্গ দিয়া এমন সুগন্ধ বাহির হইতেছে যে, উহাতে নাসিকা মাতিয়া উঠিতেছে।

ভক্তগণ ভাবিতেছেন যে, এতদিনে তাঁহাদের ইন্দ্রিয় সকলের সফলতা হইল। অতিশয় বুদ্ধিমান্ লোকে বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান্ জীবকে যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, তাহার কারণ কি। তাঁহারা বুঝিলেন যে, জীবগণ তাঁহাকে আস্বাদ করিতে পারিবে এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়াছেন। সামান্য দ্রব্য আস্বাদের নিমিত্ত উহা নহে। সামান্য দ্রব্যে ইন্দ্রিয় উদ্রেক করে, তৃপ্ত হয় না।

এমন সময় প্রভু কথা কহিলেন। সে কথার এরূপ মোহিনী শক্তি যে, সকলের চিত্ত বিমোহিত হইল। তাহাতে কি হইতেছে? না, প্রভুর প্রত্যেক অঙ্গের রূপে ও বিধির গুণে নানাদিকে টানিয়া তাহাদিগের হৃদয়কে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতেছে। ভক্তগণ নানাবিধ সেবা করিতেছেন কিন্তু মনের সাধ মিটিতেছে না। তাই কেহ বারম্বার প্রণাম, কেহ বায়ু ব্যজন, কেহ চরণ স্পর্শ করিয়া বিবিধ সুখ অনুভব করিতেছেন। কেহ কেহ ফুলের মালা পরাইয়া, কেহ ফুল ফেলিয়া মারিয়া, হৃদয়ের অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আবার কেহ বা সুস্বরে স্তব করিতেছেন। কেহ ভাবিতেছেন, কিরূপে প্রাণনাথকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া হৃদয় জুড়াইব। কেহ ভাবিতেছেন, কেমনে তাঁহার গলাটি ধরিয়া মুখচুম্বন করিব। কাহারও বা আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে এবং আনন্দ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নানাবিধ ভঙ্গিতে প্রভুকে দেখাইয়া দেখাইয়া নৃত্য করিতেছেন।

প্রভু শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীবাস, তোমার মনে পড়ে দেবানন্দের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলে, আর তোমার প্রেমানন্দ ধারা দেখিয়া দেবানন্দের কঠিন শিষ্যগণ তোমাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছিল ?" এইরূপ সকল কাহিনী যাহা শ্রীবাস ব্যতীত আর কেহ জানিতেন না, তাহা ক্রমে বলিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন, "শ্রীবাস, আমি তোমাকে যখন প্রাণদান করি, তখন নারদ মুনি তোমার শরীরে প্রবেশ করেন। তুমি নারদ, তাহা কি ভুলিয়া গেলে ?" শ্রীবাস এই সকল শুনিতেছেন, আর মহানন্দে স্তব করিতেছেন।

তারপর শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন, "মনে পড়ে, তুমি গীতায় যে শ্লোকের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া উপবাস করিয়াছিলে, তোমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়াছিলাম, তুমি চিন্তিত হইও না, আমি অদ্য তোমার সেই শ্লোকের প্রকৃত পাঠ বলিতেছি। ইহার প্রকৃত পাঠ 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ। সমস্ত শ্লোকটি শ্রবণ কর তাহা হইলে উহা বুঝিতে পারিবে। যথা:—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোক্ষি শিরোমুখঃ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥"

এইরূপে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তখন ভক্তগণ একেবারে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। যদিও বহুতর দীপ জ্বালা হইল, কিন্তু শ্রীভগবানের অঙ্গের জ্যোতিতে সে দীপগুলি টিপ টিপ করিতে লাগিল। যে অঙ্গের শীতল আভা দিবাভাগে সূর্য্যের তেজে মৃদু দেখাইতেছিল, রজনীতে উহা প্রস্ফুটিত হইল। দক্ষিণে নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়াছিলেন; তাঁহার ও অন্যান্য ভক্তগণের অঙ্গে,—কাহার মৃদুরূপে, কাহার মৃদুতররূপে, আবার কাহার বা তেজস্কররূপে—আলোক বিরাজিত হইতেছে। আবার গৃহমধ্যস্থ দ্রব্য সকল হইতেও নানাবিধ আলোক বিকশিত হইতেছে। তখন সকলে আরতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধূপ দীপ জ্বালিয়া আরতি করিবেন,

এমন সময় শ্রীবাসের মনে একটি ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিতেছেন যে, এ আরতি প্রভুর মা শচীদেবী আসিয়া করিলেই ভাল হয়। তখন তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন, "গোসাঞি! শচীঠাকুরাণীর আমাদের প্রতি বড় ক্রোধ। তাঁহার মনে বিশ্বাস, তাঁহার পুত্রটি বড় ভালমানুষ ও নির্ব্বোধ, আমরা সকলে জুটিয়া নাচাইয়া গাওয়াইয়া তাঁহাকে পাগল করিলাম। এখন তাঁহাকে আনিয়া, তাঁহার পুত্র কেমন ভালমানুষ ও নির্ব্বোধ, তাহা দেখান যাউক। তাঁহার পুত্রকে দেখিলে শচীদেবীর তাঁহার উপর আর পুত্রজ্ঞান থাকিবে না, আমাদের উপরও আর তিনি রাগ করিবেন না।" অদ্বৈত বলিলেন, "ভাল পরামর্শ করিয়াছ, শীঘ্র তাঁহাকে লইয়া আইস।" তখন শ্রীবাস শচীকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার পুত্র যে ঘরে আছেন, সেই ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমার পুত্র দেখ।"

শচী দেখিতেছেন, তাঁহার নিমাই বটে, তবে নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন স্বয়ং শ্রীভগবান্! ইহা দেখিয়া শচী সুখী না হইয়া কাতর হইলেন। তাঁহার কাতর হইবার অনেক কারণ ছিল। যখন বুঝিলেন যে, নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন, তখন চারিদিকে শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। চিরদিন পুত্রটিকে লালন পালন করিয়াছেন, তাঁহার আর কেহ নাই, আর পুত্রটি রূপে গুণে অতুল্য। কাজেই তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। এখন দেখেন যে, সেই প্রিয় বস্তুটি তাঁহার নিজস্ব ধন নহে, ত্রিজগতের সকলেই তাঁহার উপর দাবী রাখে। সেটী বহুবল্লভ। তিনি পুত্রের এক মাত্র সম্বল নহেন, পুত্রটির সম্বল ত্রিজগতের তাবল্লোক। একে সেই চিরদিনের হৃদয়ের প্রাণ-পুত্তলিটি চলিয়া যাইতেছে, আবার সেই শ্রীভগবান্‌কে পুত্রভ্রমে নানারূপে শাসন করিয়াছেন,—এইরূপ বিবিধ ভাবে অভিভূত হইয়া, শচীদেবী একেবারে জড়বৎ হইয়া পড়িলেন।

তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, "ভগবান্! এই এ জগজ্জননী, ইনি

তোমাকে দর্শন করিয়া নানাবিধ ভাবে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু তুমি কৃপা করিয়া ইঁহার গর্ভে জন্ম লইয়াছ, অতএব ইঁহাকে ডাকিয়া সম্ভাষণ কর।"

তখন শ্রীনিমাইয়ের মুখে ঈষৎ হাস্যময় বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেল। তিনি মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "ইনি আমার প্রসাদ পাইবার যোগ্য নহেন। কারণ, তোমরা আমাকে পাগল করিতেছ বলিয়া, ইনি দিবানিশি তোমাদের ন্যায় আমার ভক্তগণকে অশ্রদ্ধা করিয়াছেন। যিনি আমার ভক্তগণকে অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহার গর্ভে জন্ম লইলেও আমি তাঁহাকে প্রসাদ করিতে পারি না।"

ইহাতে অদ্বৈত বলিতেছেন, "প্রভু, এ তোমার কি বিচার? জননী তোমার বাৎসল্য প্রেমে অন্ধ হইয়া আমাদের প্রতি বিরক্ত হইতেন, সেও কি তাঁহার অপরাধ হইল?"

তখন শ্রীবাস শচীর কর্ণে বলিতেছেন, "যাও শ্রীভগবানকে প্রণাম করিয়া এই সময় তাঁহার প্রসাদ আহরণ কর।" শচী ভয়ে ইতস্তত: করিতেছেন। তখন শ্রীবাস একটু অধৈর্য্য হইয়া বলিতেছেন, "বিলম্ব কর কেন? ইনি তোমার পুত্র নহেন, দেখিতেছ না? যাও, শীঘ্র প্রণাম কর।" তখন সেই বৃদ্ধা-রমণী শচী, গললগ্নীকৃতবাস হইয়া, যাহাকে তিনি নিজ পুত্র বলিয়া জানিতেন, সেই শ্রীনিমাইয়ের চরণে পতিত হইলেন!

নিমাই তখন তাঁহার কঠিন ভাব পরিত্যাগ করিয়া, প্রসন্ন বদনে শ্রীশচীর মস্তকে শ্রীচরণ দিয়া বলিলেন, "তোমার বৈষ্ণব-অপরাধ ক্ষয় হউক।" যথা চৈতন্যচরিত—

ইত্যুক্তে সতি সহসা মহাশয়োঽস্যা-
মূর্দ্ধ্নি শ্রীযুত পদপঙ্কজং স নাথঃ।
আধায় প্রার্থিত কৃপস্তথৈব তস্তৈ
কারুণ্যং পরিকলয়ন্ বাচ হৃষ্টঃ॥

ভগবানের এই আশ্বাসিত বাক্য শুনিয়া শচী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং দেবকী সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যে শ্লোকটী বলিয়াছিলেন, সেই শ্লোকটী বারম্বার পাঠ করিতে লাগিলেন, যথা—

তথা পরমহংসানং মুনীনামমনাত্মনাম্
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয়ঃ ॥

বলা বাহুল্য শচী লেখাপড়া জানিতেন না। উপরি উক্ত শ্লোক পড়িয়া শচী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীভগবানের ইঙ্গিত পাইয়া ভক্তগণ শ্রীশচীকে অনেক যত্নে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত ও শান্ত করিলেন। যখন যুবতীগণের মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," তখন নিমাই কি অন্য কেহ কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এখন নিমাই যে সাতষট্টি বৎসরের বৃদ্ধা জননী শচীর মস্তকে শ্রীপাদ প্রদান করিলেন, ইহাতেও তিনি কি অন্য কেহ কুণ্ঠিত হইলেন না। কারণ, যখন শ্রীনিমাই যুবতীগণকে বর প্রদান করেন, তখন তিনি একজন সামান্য নবীন পুরুষভাবে উহা করেন নাই। যখন তিনি বর প্রদান করেন, তখন তিনি শ্রীভগবান সর্ব্বজগতের প্রধান। আর সেইরূপে, যখন তিনি শ্রীশচীর মস্তকে পদার্পণ করেন, তখন তিনি উহা শচীনন্দন ভাবে করেন নাই, তখন তিনি সকল জগতের পিতা, শচীরও বটে।

ভক্তগণ শচীদেবীকে তাঁহার পুত্রের আরতি করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন শচী শ্রীচরণস্পর্শে প্রেমধন পাইয়া, নির্ভয় ও আনন্দোন্মত্ত হইয়াছেন। শচী আরতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সঙ্গীগণকে ডাকিলেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী প্রভৃতি মহিলারা আসিলেন। ভক্তগণ কেহ আরত্রিকের গীত গাহিতে লাগিলেন, কেহ মৃদঙ্গ, শঙ্খ, মন্দিরা, করতাল বাজাইতে লাগিলেন। আর স্ত্রীগণ হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই "মহাপ্রকাশ" সাত প্রহর ছিল। ভক্তমাত্রেই ইহা দর্শন করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বাসু, মাধব ও গোবিন্দ তিন ভাই একত্র হইয়া এই মহাপ্রকাশ দর্শন করেন, এবং তাঁহারা চক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার আমুল বৃত্তান্ত "মহাপ্রকাশ" নামক পদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে ॥
পঞ্চদীপ জ্বালী তিঁহ আরত্রি করিল।
নির্ম্মঞ্ছন করি শিরে ধানদুর্ব্বা দিল ॥
ভক্তগণ সবে করে পুষ্প বরিষণ।
অদ্বৈত আচার্য্য দেন তুলসী চন্দন ॥
দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্গে।
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে ॥
গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা ॥

আরত্রিক হইলে নিমাইয়ের ইচ্ছাক্রমে ভক্তগণ শচীকে বাড়ী পাঠাইলেন। তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন, "শ্রীধরকে নিয়া এসো।" ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীধর কে?" প্রভু বলিলেন, যে শ্রীধর তাঁহাকে কলাপাতা ও খোলা যোগাইয়া থাকেন। কয়েকজন ভক্ত অমনি ছুটিয়া গেলেন। সেই চঞ্চল ব্রাহ্মণকুমার, যিনি তাহার সঙ্গে কলার পাতা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন, শ্রীধর আর তাঁহাকে তখন দেখিতে পান না। শুনিয়াছেম, তিনি পরম ভক্ত হইয়াছেন। ইহাও শুনিয়াছেন, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু শ্রীধর অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, সাহস করিয়া দেখিতে আসিতে পারেন না। নিশিযোগে শ্রীধর বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় কয়েক জন ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, শচীর উদরে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম লইয়াছেন। অদ্য প্রকাশ হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন।"

দরিদ্র শ্রীধর খোলা বেচেন, শ্রীনবদ্বীপে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্থানে তিনি নিতান্ত ঘৃণ্য ব্যক্তি। তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ডাকিতেছেন, ইহা ভাবিয়া আনন্দে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন ভক্তগণ বেগতিক দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিলেন। নদীয়ার অন্য লোকে দেখিয়া অবশ্য কৌতুক করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে শ্রীধরের বাহক-ভক্তগণের কি? পরমানন্দে তাঁহাদের তিলমাত্র বাহ্যাপেক্ষা নাই। এরূপে শ্রীধরকে সকলে ধরিয়া নিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

তখন প্রভু বলিতেছেন, "ওহে শ্রীধর উঠ। তোমার প্রতি আমার বড় স্নেহ। তাহা না হইলে তোমার দ্রব্য কেন কাড়িয়া লইব। আমাকে দর্শন কর।" শ্রীধর সেই মধুর বাক্যে চেতন পাইলেন। চেতন পাইয়া দেখেন যে, তাঁহার সেই চঞ্চল ব্রাহ্মণকুমার বটে। দেখিতে দেখিতে সেই নিমাই শ্রীধরের নিকট শ্যামসুন্দরের রসকূপ হইলেন। শ্রীধর দেখিতেছেন যে, কত কোটী দেবদেবী তাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন। শ্রীধরের আবার অচেতন হইবার উপক্রম হইল, এমন সময় প্রভু তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "তুমি চিরদিন দুঃখ পাইয়াছ, এখন আর তোমার দুঃখ থাকিবে না।" শ্রীধর করজোড়ে বলিতেছেন, "প্রভু, তোমার দোষ নাই। আমি মুর্খ, নিজদোষে ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তুমি না আমাকে বার বার নিজ পরিচয় দিয়াছিলে? তুমিই ত আমাকে বলেছিলে, তুই যে গঙ্গাপূজা করিস, আমি তার বাপ? তবু আমি মূঢ়মতি তোমাকে চিনিতে পারি নাই।" তখন নিমাই বলিতেছেন, "তুমি আমাকে না চিনিতে পার, আমি তোমাকে বরাবর চিনি।"

শ্রীধর বলিতেছেন, "আমার খোলা বেচা সার্থক হইল। কুব্জা তুলসী

চন্দন দিয়া তোমার চরণ পাইয়াছিল, আমি কলার খোলা দিয়া তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিলাম।"

শ্রীভগবান ইহাতে হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীধর! তুমি ঠিক কথা বল নাই। তুমি আমাকে খোলা ও পাতা কবে দিয়াছিলে? আমি না কাড়িয়া লইয়াছিলাম? কিন্তু করি কি, তুমি কোন মতে দিবে না। তবে তুমি নিশ্চিত জানিও, আমি ভক্তের দ্রব্য এইরূপে চিরকাল কাড়িয়া লইয়া থাকি। আমার মনে ধ্রুববিশ্বাস যে, ভক্তের দ্রব্যে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এখন শ্রীধর শুন। তুমি চিরদিন দুঃখ পাইয়াছ। অদ্য তোমাকে আমি অষ্টসিদ্ধি দিব, দিয়া তোমার দারিদ্র্য ঘুচাইব।"

শ্রীধর বলিলেন, "আমি অষ্টসিদ্ধি নিয়া কি করিব? আমি মহাজনকে পাইয়াছি, আমি ধন কেন নিব?" তখন প্রভু বলিতেছেন, "তুমি চির-দিনের দরিদ্র, তুমি যদি অষ্টসিদ্ধিরূপ প্রসাদ না লও, আমি তোমাকে একটি সাম্রাজ্যের রাজা করিব। তাহা হইলে তুমি পরম সুখে থাকিবে।"

শ্রীধর বলিতেছেন, "ঠাকুর, আমি রাজ্য চাহি না। আমি অন্যের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহি না। আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি না।"

তখন প্রভু বলিতেছেন, "সে কি? আমার দর্শন ব্যর্থ হইতে পারে না। তোমাকে অবশ্য বর মাগিতে হইবে।"

তখন শ্রীধর বলিতেছেন, "আমি ত খুঁজিয়া পাই না কি বর মাগিব। তবে যদি তোমার আজ্ঞায় বর মাগিতে হয়, তবে এই বর দাও যে যেই চঞ্চল পরমসুন্দর প্রভূতশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার, আমি দুর্ব্বল বলিয়া আমার হাতের খোলা পাতা জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেন আর কোন্দল করিতেন, তিনি চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া, এখন নিশ্চল হইয়া আমার হৃদয়েশ্বর হইয়া থাকুন।"

ভক্তগণ শ্রীধরের প্রার্থনা শুনিয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন।

তখন প্রভু বলিতেছেন, "তুমি দরিদ্র, কাঙ্গাল, সমাজে ঘৃণিত, আমি তোমার সম্মুখে। আমার কথা অব্যর্থ, তুমি জান। আমি অষ্টসিদ্ধি দিলাম, তুমি লইলে না! সম্রাজ্য দিতে চাহিলাম, লইলে না। তুমি ভক্ত এ সমুদায় তুচ্ছ দ্রব্য কেন লইবে? তুমি এ সমুদায় লইবে না, তাহা আমি জানি। আমি ত তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম না, জীবগণকে আমার ভক্তের মাহাত্ম দেখাইবার নিমিত্ত তোমাকে প্রলোভন দেখাইলাম। এখন আমিই তোমাকে বর দিতেছি,—আমাতে তোমার প্রেম হউক।"

এই কথা বলিবামাত্র শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন শ্রীভগবান মুরারিকে ডাকিলেন। মুরারি সভয়ে দূরে ছিলেন, এখন অগ্রবর্ত্তী হইলেন। অগ্রবর্ত্তী হইয়া দীঘল হইয়া চরণে পড়িলেন। মুরারি দীনতার খনি। শুধু তাহা নহে, যেমন ভক্ত, তেমন পরোপকারী। মুরারীর দোষ তাঁহার একটু জ্ঞানের দিকে টান। প্রভু বলিতেছেন, "মুরারি! তুমি অধ্যাত্মচর্চ্চা ছাড়িয়া দাও।" তখন মুরারি মুখ না তুলিয়া বলিতেছেন, "আমি অধ্যাত্মচর্চ্চা কিরূপে করিব? কার কাছে শিখিব?" তখন নিমাই একটু অদ্বৈতকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "কেন, তুমি কমলাক্ষের সঙ্গে চর্চ্চা করিয়া থাক।" কমলাক্ষ শ্রীঅদ্বৈতের নাম। ইহাতে অদ্বৈত তাহার প্রতি একটু কটাক্ষ দেখিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! অধ্যাত্মচর্চ্চা কি ভাল নহে?" শ্রীভগবান বলিলেন, "অধ্যাত্মচর্চ্চা ভাল কি মন্দ তাহা আমি বলিতেছি না, তবে অধ্যাত্মচর্চ্চা করিলে আমাকে পাইবে না, অধ্যাত্মচর্চ্চার ফল আমি নই।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা তেজ প্রভৃতি ধ্যান করেন, তাঁহাদের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে যে মধুময় ভগবান তাহা প্রাপ্তি হয় না। কারণ শ্রীভগবানকে যিনি যেরূপে ভজনা করেন, তিনিও তাঁহাকে সেইরূপে ভজিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত ভয়ে নীরব হইলেন।

তখন শ্রীনিমাই মুরারিকে আবার বলিতেছেন, "তুমি অধ্যাত্মচর্চ্চা কর এ বড় আশ্চর্য্য, যেহেতু তুমি সাক্ষাৎ হনুমান। মুরারি এখন মস্তক উঠাইয়া তুমি আমার প্রতি চাও।" মুরারি মস্তক উঠাইলেন। মুরারির ভজন সীতারাম। মস্তক উঠাইয়া দেখিলেন যে, বিষ্ণুখট্টায় আর নিমাই নাই,—শ্রীরামচন্দ্র বসিয়া, বামে সীতা। লক্ষ্মণ ছত্র ধরিয়াছেন, ভরত শত্রুঘ্ন চামর ব্যজন করিতেছেন। মুরারি ইহা দর্শন করিয়া অচেতন হইলেন। ফল কথা যাঁহার যিনি ইষ্টদেবতা তখন ভক্তগণ নিমাইকে সেইরূপ দেখিতেছেন। শ্রীধর দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া, মুরারি দেখিলেন শ্রীরাম বসিয়া।

তখন "হরিদাস" "হরিদাস" বলিয়া প্রভু ডাকিলেন। হরিদাস পিঁড়ায় উপুর হইয়া পড়িয়া আছেন। হরিদাসের ন্যায় দীন জগতে আর নাই। যদিচ সর্ব্বোচ্চ, তত্রাচ আপনাকে সরলভাবে অধমের অধম ভাবেন। প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস, এস আমাকে দর্শন কর।" হরিদাস বাহির হইতে বলিতেছেন, "প্রভু ! আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে কেন এত কৃপা করিতেছ? আমি তোমার এত কৃপার উপযুক্ত নহি। তুমি আমাকে যত কৃপা করিতেছ, ততই আমি কিরূপ অধম তাহা বুঝিতেছি !" যাহারা ভাল হইয়া আপনাদিগকে অধম ভাবেন, শ্রীভগবান তাহাদিগকে বড় ভালবাসেন। ভগবান আবার বলিতেছেন, "হরিদাস, তোমার দৈন্যে আমি বড় দুঃখ পাই। তুমি এস, আসিয়া আমাকে দর্শন কর।" তখন হরিদাসকে সকলে ধরিয়া সম্মুখে লইয়া গেলেন।

হরিদাস যাইয়া শ্রীচরণ হইতে দূরে দীঘল হইয়া পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস ! বর মাগো।" হরিদাস বলিলেন, "প্রভু ! তুমি আমার গতি। তুমিই আমার দয়াল। আমা হেন পতিতকে দয়া কর। তুমি ভক্তবৎসল, কিন্তু আমি ভক্ত নহি। তুমি দীনদয়াল, কিন্তু আমি

দীনও নহি; অভিমানে আমার অন্তর পরিপূর্ণ। তবু তুমি অহেতুক দয়া করিয়া থাক। এখন তুমি সেই গুণে, আমি যে বিষকূপে পড়িয়া আছি, তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার কর।”

প্রভু বলিতেছেন, “আমি তোমার দীনতায় তোমার নিকট চিরঋণী। এখন তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমুদায় দুঃখ মোচন করিব।”

হরিদাস বলিতেছেন, ‘প্রভু! যদি আমাকে আরও কৃপা করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহাই হউক। আমার বলিতে ভয় হয়। অভিমান যেন আমার হৃদয়ে স্থান না পায়। আমাকে দীন কর, তাহা হইলে তোমার কৃপা পাইবার উপযুক্ত হইব। প্রভু! যদি তুমি আমাকে বর দিবে, তবে যেন আমার ভাগ্যে তোমার ভক্তের প্রসাদ মিলে।”

হরিদাসের প্রার্থনা শুনিয়া সকলে “জয় হরিদাস” “জয় শচীনন্দন” বলিয়া উঠিলেন। এই জয়ধ্বনির হেতু একবার অনুভব করুন। মনে ভাবুন শ্রীভগবান সম্মুখে! তিনি বর দিবার নিমিত্ত বিনয় করিতেছেন। কিন্তু ভক্তগণ লইতেছেন না। এরূপ যদি কেহ করেন, তিনি আমাদের ন্যায় মনুষ্য নহেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ তাহাই করিতেছেন। পাঠক মহাশয়, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আপনার কতদূর বিশ্বাস জানি না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি তাঁহার ভক্তগণের বিশ্বাস অটল। তাঁহারা ঠিক জানিতেন যে, তাঁহারা যে বর মাগিবেন তাহাই পাইবেন। কিন্তু হরিদাস কিছু লইলেন না। ফল কথা, তখন কেবল হরিদাসের নহে, ভক্তমাত্রেরই এরূপ মনের অবস্থা হইয়াছে যে, অফল বর, কি ঐশ্বর্য্য কামনা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে।

প্রভু বলিতেছেন, “হরিদাস! তুমি যে বর মাগিলে এ তোমার উপযুক্ত হইয়াছে। আমার ঠাকুরালী তোমাদের ন্যায় ভক্ত লইয়া। হরিদাস! যখন তোমাকে দুষ্টগণ নির্দ্দয়তার সহিত প্রহার করে, তখন

আমি অবশ্য নিবারণ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমি করিলাম না, না করিয়া অলক্ষিতে তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়াছিলাম। সেই নিমিত্ত তুমি পরমানন্দে ছিলে, বেদনা পাও নাই। তবে আমি সেই দুরাত্মাগণকে বধ করিয়া কেন তোমাকে রক্ষা করি নাই, তাহার কারণ তুমি কি বুঝ নাই? সেই নিষ্ঠুরগণ তোমাকে যতই প্রহার করিতেছিল, ততই তুমি তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাকে ডাকিতেছিলে। কিন্তু আমি যদি তাহাদিগকে বধ করিতাম, তবে এ কথাটি হইত না। এই কথাটি এখন জগতে রহিল। ইহাতে লোকে আমার ভক্তের মহিমা বুঝিতে পারিবে, আর লক্ষ লক্ষ জীবের মঙ্গল হইবে।" এই কথা শুনিয়া হরিদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন, আর ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইলেন।

তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন, "তোমাদের যাহার যাহা ইচ্ছা সেই বর মাগো।" শ্রীভগবান সম্মুখে, সুতরাং সকলে আপনাকে পূর্ণ ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যে কিছু অভাব আছে, ইহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। তবে কেহ কেহ প্রিয় বস্তুর হিতকামনা করিয়া বর মাগিতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, "প্রভু, আমার পিতা বড় কঠিন, তাঁহার হৃদয় দ্রব করাইয়া দিউন।" প্রভু বলিতেছেন, "তথাস্তু"। কেহ বলিতেছেন, "আমার স্ত্রী নিতান্ত দুর্ম্মুখী ও সংকীর্ত্তনের বিরোধী, তাহার চিত্ত ভাল করিয়া দিউন।" অমনি প্রভু বলিতেছেন, "তথাস্তু"।

সকলে এইরূপ আনন্দ সাগরে সন্তরণ দিতেছেন, কিন্তু একজন পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন। তিনি মুকুন্দ। ইনি নিমাইয়ের নিতান্ত প্রিয়, এবং নিমাইয়ের নিতান্ত প্রিয় যে গদাধর, তাঁহারও প্রিয়। মুকুন্দ সুগায়ক এমন কি নিমাই তাঁহাকে কৃষ্ণের গায়ক বলিতেন। সেই মুকুন্দ পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন—কেন? ঘরে যাইতে পারেন নাই, যেহেতু প্রভু তাঁহাকে ডাকেন নাই। প্রভু পিঁড়া হইতে একে একে সকলকে ঘরে ডাকিয়া

আনিয়াছেন। তাঁহার বিনা অনুমতিতে কাহারও ভিতরে যাইবার সাধ্য নাই। তিনি মুকুন্দকে ডাকিতেছেন না, কাজেই মুকুন্দ যাইতে পারিতেছেন না, দুঃখে পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন। সকলে বুঝিলেন যে, প্রভু ইচ্ছা করিয়া মুকুন্দকে দণ্ড দিতেছেন; কিন্তু কেহ সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছেন না। অবশেষে শ্রীবাস সাহস করিয়া বলিলেন, "প্রভু! তোমার মুকুন্দ পিঁড়ায় পড়িয়া কান্দিতেছেন, একবার তাঁহাকে ডাকো, ডাকিয়া প্রসাদ কর।" শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "আমার মুকুন্দ? মুকুন্দ আমার, তোমাদিগকে কে বলিল?"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! তুমি অবিচার করিলে বিচার কে করিবে? মুকুন্দ তোমার না তবে কাহার? মুকুন্দের মত তোমার আর কটি আছে?"

প্রভু বলিলেন, "তোমরা জান না তাই ওরূপ বলিতেছ। সম্মুখে মুকুন্দ খুব ভাল, কিন্তু যখন পণ্ডিতের দলে প্রবেশ করে, তখন পরম জ্ঞানী, ভক্তিধর্ম্মকে ঘৃণা করে। অর্থাৎ ইহার চঞ্চল মতি, যখন যে দলে প্রবেশ করে তখন সেই মত কথা বলে। এরূপ লোক আমার দর্শন পাইতে পারে না। তোমরা উহার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিওনা।" মুকুন্দ সুগায়ক, সকলের প্রিয়। প্রভুর এরূপ কঠোর আজ্ঞা শুনিয়া সকলে বিষণ্ণ হইলেন, আর কেহ উত্তর দিতে সাহস পাইলেন না। মুকুন্দ পিঁড়া হইতে সব শুনিতেছেন। তাঁহার কি দণ্ড হইল তাহা শুনিলেন, কি অপরাধে দণ্ড হইল তাহাও শুনিলেন। তখন মুকুন্দ পিঁড়া হইতে চেঁচাইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "ঠাকুর পণ্ডিত! আপনারা আমার নিমিত্ত প্রভুকে কিছু অনুরোধ করিবেন না। আমার যেরূপ অপরাধ তাহা অপেক্ষা অনেক লঘু দণ্ড হইয়াছে।" ইহা বলিয়া মুকুন্দ ভাবিতেছেন, "দণ্ড পাইলাম ভালই হইল। প্রভু প্রিয়জন ব্যতীত দণ্ড করেন না। তবে এ দেহটি রাখা

হইবে না, ইহা অপবিত্র ; যেহেতু এ দেহ ভক্তি মানে নাই, না মানিয়া অতিশয় অপবিত্র। কিন্তু দেহত্যাগ করার পূর্ব্বে একটা কথা জানিয়া যাই। ইহা ভাবিয়া আবার শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "ঠাকুর পণ্ডিত! আপনারা আমার নিমিত্ত অনুরোধ করিবেন না। তবে প্রভুর নিকটে আপনারা সকলে মিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি কি কোনকালে তাঁহার দর্শন পাইব?"

প্রভু এই কথা বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া শুনিলেন ; শুনিয়া তাঁহার কমল নয়ন ছল ছল করিতে লাগিল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "মুকুন্দ! তুমি অবশ্য আমার দর্শন পাবে, কিন্তু সে এক কোটী জন্মের পরে।"

প্রভুর শ্রীমুখের এই বাক্য শুনিয়া মুকুন্দ আপনা আপনি বলিতেছেন, "দর্শন পাব ত? তা, না হয় কোটি জন্ম পরে। পাব ত? তবে আর কি? পাব ত? প্রভুকে পাব ত, না হয় কিছুকাল পরে? কোটি জন্ম আর কটা দিন? প্রভুকে যখন পাব নিশ্চয় জানিলাম, তখন কোটি জন্ম এক মুহূর্ত্তও নয়।" ইহা বলিয়া, সেই সন্তপ্ত রোরুদ্যমান ধূলায় ধূসরিত মুকুন্দ গাত্রোত্থান করিলেন, করিয়া, "পাবো পাবো" বলিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ইহা শুনিয়া গৃহাভ্যন্তরে, বিষ্ণুখট্টায় উপবেশিত শ্রীভগবানের কমল-লোচন দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। নয়ন-বেগ সম্বরণ করিয়া, প্রভু ভগ্নস্বরে মুকুন্দকে ডাকিতেছেন, "মুকুন্দ! ঘরে এস।" কিন্তু মুকুন্দ "পাবো পাবো" বলিয়া অতুলানন্দে বিভোর, প্রভুর আহ্বান তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তখন ভক্তগণ বাহিরে আসিয়া মুকুন্দকে ধরিলেন, ধরিয়া বলিতেছেন, "মুকুন্দ! শুনছ না? প্রভু তোমাকে ডাকছেন, ঘরে চল!" কিন্তু মুকুন্দের তখন অর্দ্ধ অচেতন অবস্থা। তিনি বলিলেন, "তোমরা

শুনিলে ত ? আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। আমি কোটি জন্ম পরে প্রভুকে পাব।”

শ্রীভগবান তখনও ঘর হইতে বলিতেছেন, “মুকুন্দ! ঘরে এস।” কাজেই সকলে মুকুন্দকে ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন! আর মুকুন্দ অর্দ্ধক্ষিপ্তের ন্যায় প্রভুর অগ্রে করজোড়ে দাঁড়াইলেন। তখন প্রভু গদগদ হইয়া বলিতেছেন, “মুকুন্দ! আমার কথা অব্যর্থ তাহা তুমি জান। জানিয়াও কোটি জন্ম পরে আমাকে পাইবে শুনিয়া তোমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইল ভাবিতেছ। অতএব তোমা অপেক্ষা আমার নিজজন ত্রিজগতে আর কে আছে ? বস্তুতঃ, আমি তোমার সহিত পরিহাস করিতেছিলাম। কেবল পরিহাসও নয়, তুমি বস্তু কি তাহা ভক্তগণকে দেখাইলাম।” তারপর গদগদভাবে বলিতেছেন, “মুকুন্দ! তুমি যদি কোটি অপরাধও কর, তবু কি আমি তোমাকে দণ্ড করিতে পারি ? তুমি যেরূপ আমার, আমিও সেইরূপ তোমার। তুমি এখন গৃহাভ্যন্তরে আগমন করিলে, করিয়া আমার আনন্দের যে অভাব ছিল তাহা পূর্ণ করিলে।”

যখন মুকুন্দ কৃপা পাইলেন, তখন শ্রীভগবান সমস্ত ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া একেবারে মাধুর্য্যভাব ধরিলেন। যতক্ষণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাব ছিল ততক্ষণ ভক্তগণ ভয়ে একটু দূরে ছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ মাধুর্য্যভাব ধরিয়া ভক্তগণকে নিকটে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সকলে মিলিয়া মধুর নৃত্য করিতে ও গীত গাহিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদের মনে হইল, তাঁহারা রাসমণ্ডলে শ্রীভগবানের সহিত বিহার করিতেছেন। পরে শ্রীভগবান্ ভক্তগণকে চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিলেন। ইহার সুগন্ধে ভক্তগণ উন্মত্ত হইলেন। তখন কেহ শ্রীভগবানের হস্ত ধরিয়া ‘স্পর্শসুখ’, কেহ তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিয়া ‘দর্শনসুখ’, কেহ তাঁহার চরণ লেহন করিয়া ‘আস্বাদন সুখ’ অনুভব করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানও তখন

কাহাকে চুম্বন, কাহাকে আলিঙ্গন, কাহারও হস্ত ধরিয়া নৃত্য,—এইরূপ বিবিধ বিহার করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্য (৫ম সর্গঃ)—

"আশ্লেষৈঃ কতিচ তথৈব কাংশ্চিদন্যা-
নাচুম্বৈ স্তদনুচ চর্ব্বিতৈ স্তথান্যান্।
ইত্যেবং পরমকৃপানিধিঃ স্বতৃপ্তান্,
চক্রে সদ্বিলসিত লীলয়া মহত্যা ॥৯২॥"

এইরূপে মধুর ভজনে সকলে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভক্তগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মনুষ্য বহুক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গ করিতে পারে না। যদি ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ হয়েন, তবে এক মুহুর্ত্তও পারে না। যদি শ্রীভগবান্ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য মিশাইয়া প্রকাশিত হয়েন, তবে কিয়ৎক্ষণ মাত্র পারে। আর যদি শুধু মাধুর্য্যময় ভগবান্ হয়েন, তবে আরও অধিকক্ষণ পারে; কিন্তু পরিশেষে মনুষ্যদেহ কাতর হইয়া পড়ে। সাধন ভজনের ফল এই যে, ইহার দ্বারা মনুষ্যের ভগবৎসঙ্গ করিবার শক্তি ক্রমে বাড়িয়া যায়। বহুক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গে বিহার করিয়া ভক্তগণ একেবারে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সমস্তদিন কাহারও আহার নিদ্রা কি আরাম মাত্র হয় নাই; যাঁহার নিদ্রা আসিতেছে, তিনি নিদ্রা যাইতে পারিতেছেন না; যিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন, তিনি আরাম করিতে পারিতেছেন না। শ্রীভগবানকে রাখিয়া কে ঘুমাইবেন বা আরাম করিবেন? তখন সকলে ভাবিতেছেন যে, এই বস্তুটী আবার নিমাইপণ্ডিত হইলেই ভাল হইত। যদিও ভগবান্ মধুর ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তবুও তিনি ভগবান। সে ভাব, ভগবানের আলিঙ্গন পাইয়াও, তাঁহাদের মন হইতে একেবারে যাইতেছে না। তখন শ্রীঅদ্বৈত সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীভগবানকে ইহাই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, "প্রভু, আমরা ক্ষুদ্র কীট তোমার তেজঃ সহ্য করিতে পারিতেছি না, তুমি আবার সম্পূর্ণরূপে

নররূপ ধারণ কর।” যথা—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমদাসের অনুবাদ ঃ—

“অদ্বৈত বলেন শ্রীনিবাস আদি শুন।
প্রভুর ঈশ্বরাবেশ কিসে যায় পুনঃ॥
সবে বলেন অদ্বৈত কহিলে সর্ব্বোত্তম।
ইহা হইতে নর-লীলা সর্ব্ব মনোরম॥
সর্ব্বগণ বহু স্তব করি পুনর্ব্বার।
কহে প্রভু নিবেদন শুন মো সবার॥
যদ্যাপিহ নিত্য ভগবত ভগবত্তা।
সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ সর্ব্বথা॥
তথাপি যে দেহ সবে করয়ে স্বীকার।
তাহার স্বভাব তত্ত্ব করহ প্রচার॥
সংপ্রহিত কৃপা করি সেইরূপ কর।
সানন্দ আবেশ প্রভু তুমি পরিহর॥”

তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন, “ভাল শীঘ্র গমন করিতেছি।” ইহাই বলিয়া তিনি হুঙ্কার করিলেন, আর শ্রীনিমাইয়ের দেহ মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন আস্তে ব্যস্তে সকলে নিমাইকে ধরিলেন, দেখেন নিমাই যে কেবল চেতনহারা হইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহার জীবনের লক্ষণও কিছুমাত্র নাই। ডাকিলে উত্তর দান ত করিলেনই না, বরং সকলে দেখিলেন যে, তাঁহার নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নাসিকায় তুলা ধরিয়া দেখিলেন, উহা কম্পিত হইল না। ভক্তগণ হস্ত পদ উঠাইয়া যেখানে যে অবস্থায় রাখিতে লাগিলেন, উহা সেখানে সেই অবস্থায় থাকিতে লাগিল। এমন কি, নিমাইকে তখন ঠিক মৃত ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে—

ভূয়োঽয়ং মৃদি চ বিলুঠ্য চত্বরান্তঃ
সংমূর্চ্ছন্নিব বিররাম রম্যমূর্ত্তিঃ।
চেষ্টাঢ্যং ন কিমপি নোত্তরঞ্চ কিঞ্চি-
ন্নস্পন্দঃ শ্বসিত সমীরণশ্চ নৈব॥
চিক্ষেপ ক্ষিতিষু যথা ভুজৌ তথা তৌ
তাদৃক্ষাবিব কিল তস্থতুশ্চিরায়।
তস্থৌ শ্রীপদযুগলং তথা যথাসৌ
চিক্ষেপ ক্ষণমনু বিস্মৃতাঙ্গচেষ্টঃ॥৯৯॥

দুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে নিমাই এইরূপ মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই চেতনা করাইতে পারিলেন না। নিমাইয়ের এরূপ ঘোর মূর্চ্ছা কখন কেহ পূর্ব্বে দেখেন নাই। শ্রীঅদ্বৈত মুখে জল-ছিটা দিয়া, নিমাইয়ের নাম ধরিয়া ডাকিয়া, ঘোর হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিমাই যেমন তেমনি রহিলেন। প্রভাত হইল, নিমাই চেতন পাইলেন না। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, নিমাই তদবস্থায় রহিলেন, নিশ্বাস ফেলিলেন না। ভক্তগণ ভাবিয়াছিলেন যে এত পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণের পর একটু আরাম করিবেন, কিন্তু তাহা আর ঘটিল না; সকলে বিষণ্ণ ভাবে নিমাইকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। কেহ রোদন করিতেছেন না, সকলে একপ্রকার নীরব হইয়া বসিয়া আছেন। যখন বহুক্ষণ নিমাই চেতন পাইলেন না, তখন তাঁহাদের মনে ভয় হইল যে, হয় ত শ্রীনিমাই একেবারেই চলিয়া গিয়াছেন, তিনি আর আসিবেন না। তখন তাঁহারা সকলে এই সঙ্কল্প করিলেন যে, যদি সত্যই চলিয়া গিয়া থাকেন, আর ফিরিয়া না আসেন, তবে তাঁহারা সকলেই তাঁহার অনুগমন করিবেন। শচীদেবীকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় পূর্ব্বদিন যে কপাট দেওয়া হইয়াছিল, আর তাহা খোলা হয় নাই।

ঊনবিংশ অধ্যায়

অবতীর্ণৌ স্বকারুণৌ পরিচ্ছিনৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে।

শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্লোক।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাসের বাড়ী থাকিলেন। বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর, কিন্তু স্বভাব নিতান্ত বালকের ন্যায়। শ্রীবাসের ঘরণী মালিনীকে মা বলেন। শিশুকাল হইতে বিংশতি বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন। এখন একেবারে মা ও বাড়ী পাইয়া মালিনীর কোলে শুইয়া পড়িলেন। আপনি ভাত মাখিয়া খাওয়া ছাড়িলেন। শুধু তাহা নয়, মালিনীর স্তন-দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য, নিত্যানন্দ মুখ দিয়া সেই শুষ্ক স্তনে দুধ আনিয়াছিলেন। আহারাদির বিচার নাই, আহার্য্যের অভাব নাই, যখন ইচ্ছা তখনই আহার করেন। স্নানের সময় গঙ্গায় পড়েন, আর একবার গঙ্গায় নামিলে নিমাই ছাড়া, কাহার সাধ্য তাঁহাকে উঠায়? নিতাই সাঁতারাইতেছেন। ভক্তগণের স্নান হইয়াছে, কিন্তু সকলেই তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা নিতাইকে ডাকিতেছেন, "শ্রীপাদ! উঠ, বেলা হইল, আর কতক্ষণ জলে থাকিবে?" নিত্যানন্দের ভ্রূক্ষেপও নাই। তখন সকলে নিমাইকে বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি একবার ডাক।" নিমাই ডাকিলেন, "শ্রীপাদ! উঠ!" আর যেরূপ গাভী হাম্বারব করিলে বৎস দৌড়িয়া আসে, নিতাই অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে তীরে উঠিলেন।

নিমাই দিবানিশি কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে বিভোর। ইহাতে শচী বড় দুঃখ পান। তাঁহার ইচ্ছা পুত্র সংসারী হউক, তিনি নদীয়ায় আনন্দে বসতি করেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাই একটু আমোদ আহ্লাদ

করেন, শচীর এ নিতান্ত মনের সাধ। নিমাই তা জানেন। এই কারণে মায়ের সন্তোষের নিমিত্ত নিমাই শ্রীমতীকে লইয়া কখন কখন রজনীতে এবং কখন দিবাভাগেও বটে, কিয়ৎকাল আনন্দ-বিহার করেন। যথা—
"মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া। লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া॥"

একদিন নিমাই দিবাভাগে বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় নিতাই আসিয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া পরিধান কৌপীন বস্ত্রখানি খুলিলেন, খুলিয়া মস্তকে বাঁধিলেন। মস্তকে বান্ধিয়া জোড়ে জোড়ে লম্ফ দিয়া সমস্ত আঙ্গিনার ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শ্রীমতী লজ্জা পাইয়া একদিকে পলাইলেন। নিমাই দৌড়িয়া আসিয়া নিতাইকে ধরিলেন। প্রথমে চঞ্চলকে ধরিতে পারেন না; পরে ধরিয়া দেখেন, বদনে আনন্দধারা বহিতেছে, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। নিমাই তাঁহাকে বস্ত্র পরাইলেন। এমন সময় ভক্তগণ একে একে আসিলেন। নিমাই নিতাইকে লইয়া ভক্তগণের মাঝে বসিলেন, নিতাইয়ের পা ধুয়াইলেন ও সকল ভক্তগণকে ঐ পাদোদক পান করিতে দিলেন; দিয়া বলিলেন,"নিতাইয়ের পাদোদক, ইহা পান কর, এখনি কৃষ্ণপ্রেম হইবে।" পরে নিতাইয়ের একখানা কৌপীন আনাইলেন, এবং চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সকলকে মস্তকে বান্ধিতে দিলেন।

আর একটী ঘটনায় নিতাই তাঁহার চাঞ্চল্য পরিবর্দ্ধন করিবার বড় অবকাশ পাইয়াছিলেন। তখন পণ্ডিত ও ভদ্রলোকের মধ্যে নিমাইয়ের বহুতর ভক্ত হইয়াছেন। এই সমুদায় ভক্তগণের সঙ্গগুণে আবার অনেকে পবিত্র হইয়া ভক্তিলাভ করিতেছেন। ক্রমেই নিমাইয়ের দল বাড়িতেছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ব্যতীত, অন্যান্য জাতি ব্রাহ্মণের পদতলে দলিত হইতেছিলেন। নবশাখ ও স্ত্রীলোকের, ব্রাহ্মণের সেবা ব্যতীত আর কোন কর্ম্ম আছে, ইহা কেহ স্বীকার করিতেন না। এমন সময়

শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদগণ, "যে ভক্ত সেই ব্রাহ্মণ," এইরূপ মত প্রকারান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন। হরিদাস যবন, তাঁহাকে ভক্তগণ প্রণাম করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদগণের এইরূপ ব্যবহারে নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণ অতিশয় আশ্বাসিত হইয়া দলে দলে সেই ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে লাগিলেন। প্রকৃত কথা, শ্রীভগবান্ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই কথা তখন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। কেহ এ জনরব বিশ্বাস করিতেছেন, কেহ-বা করিতেছেন না। তবু দেশ বিদেশ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে বহুতর লোক আসিতেছে। একটী প্রাচীন গীত শ্রবণ করুন, যথা—

"নদের চাঁদের উদয় হয়েছে।
পাপী তাপী অন্ধ আতুর, সারি সারি আসিছে॥"

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের বাটীর পার্শ্বে সারাদিন কলরব। কেহ দেহ-রোগে, কেহ বা ভবরোগে প্রপীড়িত হইয়া আরোগ্যের নিমিত্ত প্রভুর বাড়ী আসিতেছে। জনাকীর্ণ শ্রীনবদ্বীপ আরও লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

এদিকে নবদ্বীপ ভক্তি ও প্রেমরসে টলমল করিতেছে। শ্রীবাসের বাড়ীতে একজন যবন দরজী শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া "দেখেছি, দেখেছি' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, ও সাত দিবস পর্য্যন্ত পাগলের মত নগর ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে চেতন প্রাপ্ত হইল। তখন সে গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত হইয়া উদাসীন ব্রত লইল। আর তখন যেন কি একটা তরঙ্গ আসিয়া সকলকে বিগলিত করিতে লাগিল। নানা জনে নানা স্থানে বৈভব দর্শন করিয়া প্রেমে উন্মাদ হইতে লাগিলেন। নানা স্থানে "কোলের ছেলে বাহু তুলে" হরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। ঘোর পাষণ্ডও ভক্ত হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কি স্ত্রীলোক লজ্জাহীন হইয়া রাজপথে নাচিতে লাগিলেন। বাসুঘোষের এই পদটীতে তখনকার অবস্থার কতক আভাস পাওয়া যায়ঃ—

"অবতার ভাল, গৌরাঙ্গ অবতার কৈল ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল॥
চাঁদ নাচে সুরয নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা গোরা॥
নাচয়ে ভকতগণ হইয়া বিভোরা।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা॥
জড় অন্ধ আতুর উদ্ধারে পতিত।
বাসুঘোষ কহে মুই হইনু বঞ্চিত॥"

প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে আসিতেছে; এবং প্রায় প্রত্যেকেই দধি দুগ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ উপহার লইয়া আসিতেছে। স্ত্রীলোকেরা শ্রীগৌরাঙ্গকে গঙ্গার ঘাটে দর্শন করিতেছেন, আর তাঁহাকে শ্রীভগবান্ ভাবিয়া মনে মনে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে নানাবিধ খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া, প্রভুর নিকট পাঠাইতেছেন। সাধারণ লোকে শ্রীগৌরাঙ্গকে "নদের চাঁদ" "সোণার মানুষ" প্রভৃতি সুমধুর নাম দিতেছেন। সেই সময়কার শ্রীনিমাইয়ের ও নদীয়ার অবস্থা বর্ণনা করিয়া ঠাকুর লোচন এই পদটি প্রস্তুত করেন—

"অরুণ কমল আঁখি, তারকা ভ্রমর পাখী, ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দ।
বদন পূর্ণিমা চান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে, তাহে নব প্রেমার আরম্ভ॥
আনন্দ নদীয়া-পুরে, টলটল প্রেমভরে, শচীর দুলাল গোরা নাচে।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরি ঝলমল করে, চমকিত অমর সমাজে॥
কি দিব উপমা তার, করুণা বিগ্রহ সার, হেন রূপ মোর গোরারায়!
প্রেমায় নদীয়ার লোক, নাহি জানে দুঃখ শোক,
আনন্দে লোচনদাস গায়॥"

এইরূপ যখন নদীয়ার অবস্থা, তখন নিমাই ভক্তগণের দ্বারা নবদ্বীপ

নগরে হরিনাম প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই হরিনাম বিলাইবার নিমিত্ত শ্রীহরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দ বিশেষরূপে আদিষ্ট হইলেন। প্রভু বলিলেন, "তোমরা এই নবদ্বীপ নগরে প্রতি ঘরে ঘরে, কি মূর্খ কি পণ্ডিত, কি সাধু কি অসাধু, কি ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, সকলকেই শ্রীহরিনাম দিয়া উদ্ধার কর।" ইঁহারা দুইজনেই এই কার্য্যে সম্যকরূপে পারদর্শী, যেহেতু পরম করুণ ও শক্তি-সঞ্চার সক্ষম। এই এক কারণ। দ্বিতীয় কারণ, উভয়েই সন্ন্যাসী ও বিদেশী। নবদ্বীপে নিয়মিত হরিনাম বিতরণ, এই প্রথম আরম্ভ হইল। হরিদাস ও নিত্যানন্দ প্রভাতে নাম বিলাইতে নবদ্বীপ নগরে কোন গৃহস্থের বাড়ী গিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহস্থ তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী দেখিয়া তটস্থ হইয়া চাউল ভিক্ষা দিতে আসিলেন। তখন হরিদাস ও নিত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা কৃষ্ণ বল ও কৃষ্ণ ভজ—এই আমাদের ভিক্ষা।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা ভিক্ষা না লইয়া অন্য বাড়ী চলিয়া গেলেন। এইরূপে নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, তাঁহারা দু'জনে নাম দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আবার কোথাও কোথাও বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ জীবের দুঃখে কাতর হইয়া স্বয়ং শ্রীশচীর উদরে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের আকার, বেশ ও আর্ত্তি দেখিয়া, কেহ বা মুগ্ধ হইতেন কেহ বা মুগ্ধ না হইয়া বিদ্রূপ করিত। এইরূপে তাঁহারা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন।

হরিদাস ধীর ও নিত্যানন্দ চঞ্চল। কৌতুকপ্রিয় চপলের সহিত নাম বিতরণ করিতে গিয়া হরিদাসের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। প্রথমতঃ নগর ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরাভিমুখে গেলেই নিত্যানন্দের একটু সন্তরণ দিতে হইবে। আর নিত্যানন্দ যদি একবার গঙ্গায় অবতরণ করিলেন, তবে তিনি যে কখন, কোথায়, এ-ঘাটে, কি ও-ঘাটে, এ-পারে কি ও-পারে উঠিবেন,—তাহার কিছুমাত্র ঠিক নাই। নিত্যানন্দ কুম্ভীরের

ন্যায় নদীতে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, আর হরিদাস তীর হইতে "শ্রীপাদ! উঠ, শ্রীপাদ! উঠ" বলিয়া ডাকিতেছেন। কিন্তু শ্রীপাদ, জৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের গ্রীষ্মে পরম সুখে গঙ্গায় ভাসিতেছেন, তিনি উঠিবেন কেন? শ্রীনিত্যানন্দের ক্ষুধার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পথে যদি দুগ্ধবতী গাভী দেখিলেন, তবে কটির ডোর খুলিয়া, তাহার দুই পা ছাঁদিয়া, দুগ্ধপান করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহার গাভী সে কখন নিত্যানন্দকে ধরিত, কিন্তু ধরিয়া সে নিত্যানন্দের কি করিবে? কেহ বা হাসিয়া উঠিত কেহ বা ধমকও দিত, কিন্তু নিত্যানন্দের কাছে হাসি ও ধমক দুই সমান। চলিতে চলিতে নিত্যানন্দ পথে একটি শিশু সন্তান দেখিলেন, তখন চোক পাকাইয়া, মুখব্যাদন করিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। শিশু, মা কি বাবা বলিয়া কান্দিতে লাগিল। শিশুর আত্মীয় যে নিকটে ছিল দৌড়িয়া আসিল। তখন হরিদাস তাহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া নিরস্ত করিয়া দিলেন। কখন বা নিত্যানন্দ ষাঁড় দেখিয়া এক লাফে তাহার পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। ষাঁড় লম্ফ ঝম্ফ দিয়া কখন তাঁহাকে ফেলিয়া দিল, কখন বা তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া দৌড়িল। যদি ষাঁড়ের উপর স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন, তবে "আমি মহেশ" এই বলিতে বলিতে চলিলেন। পথের লোক দেখিয়া অবাক!

সেই সময় দুইটি ব্রাহ্মণকুমার, জগাই ও মাধাই নামে ভ্রাতৃদ্বয়, নদীয়া নগরের কর্ত্তা ছিল। ইহারা অর্থ দিয়া কাজীকে বশ করিয়া নদীয়ায় যথেচ্ছাচার করিত। ইহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না। ইহারা মদ্যপান ও কথায় কথায় নরহত্যা ও বাড়ী লুটপাট করিত। দুই ভাইয়ের অধীনে বহুতর অস্ত্রধারী সৈন্য থাকায়, তাহাদের সহিত কেহ পারিয়া উঠিত না। বিশেষতঃ নদেবাসিগণ বিদ্যাচর্চ্চায় ব্যস্ত, তাঁহারা সেই রসেই নিমগ্ন হইয়া সমুদায় সহিয়া থাকিতেন।

এক দিন নিতাই হরিদাসকে বলিলেন, "চল, দুই জনে যাই, দুটো ভাইকে প্রভুর আজ্ঞা বলি। তারা শুনে ভাল, না শুনে আমাদের কি দায়? আমরা আজ্ঞা পালন করি বই ত নয়।" উভয়ে এই পরামর্শ করিয়া দুই জনে একেবারে দুই ভায়ের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত। দুই ভাই মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া বসিয়া আছে। নিতাই যাইয়া বলিলেন, "ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, এই আমাদের ভিক্ষা।" এই কথা শুনিয়া দুই ভাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "বটে! প্রাণে ভয় নাই? আমাদের কাছে এত বড় কথা! ধর ত এই ভণ্ড বেটাদের?" ইহাই বলিয়া আপনারাই দৌড়িল, আর নিতাই ও হরিদাস উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইলেন। হরিদাস স্থূলকায় দৌড়িতে পারেন না; নিতাই চঞ্চল, তাঁহাকে হড়-হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। দুই ভাই মদ্যপানে উন্মত্ত বলিয়া দৌড়িতে পারিল না। কিন্তু নাগরীয়া অনেকে এই ঘটনা দেখিয়া হাস্য করিল, আর বলিতে লাগিল, "ভণ্ড বেটাদের খুব হয়েছে।"

হরিদাস ও নিত্যানন্দ দৌড়িয়া প্রভুর নিকট যাইতেছেন। পথে হরিদাস নিতাইকে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ, তুমি বড় চঞ্চল।"

নিতাই। কেন, আমার অপরাধ?

হরিদাস। এইরূপ মদ্যপের কাছে তোমার যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল?

নিতাই। আমি গেলাম? তুমিই ত কুপরামর্শ দিয়া আমাকে ভুলাইয়া, আমাকে দিয়া বলাইয়া, শেষে আমাকে ডাকাতদের হাতে ফেলিয়া পালাও। তুমি ত খুব সাধু!

হরিদাস। আমি তোমাকে ভুলালেম? তুমি না বল্‌লে, এ বেটাদের অবস্থা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়?

নিতাই। সে কি অন্যায় বলেছি? করি কি? তোমার ঠাকুর

চঞ্চল, কাজেই তাঁর বাতাস লাগিয়া আমিও চঞ্চল হয়েছি। শুন হরিদাস! প্রভু তোমার কথা বড় শুনেন। তুমি যেয়ে একেবারে ঠাকুরের পা ধরে পড়্‌বে আর বল্‌বে যে এ দুটোকে উদ্ধার করিতেই হবে। প্রভু তোমার কথা ফেলবেন না।

হরিদাস। বুঝিলাম, এ দুইটী জীব উদ্ধার হইল। যখন তোমার ইচ্ছা হয়েছে, তখন, আর উহাদের উদ্ধার কেহ নিবারণ করিতে পার্‌বে না।

এইরূপে আমোদ করিতে করিতে ও কথায় কথায় প্রভুর নিকট আসিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমুদায় কাহিনী বলিলেন! নিত্যানন্দ বলিলেন, "আর তোমার আজ্ঞা পালন করতে যাব না। সাধুকে কৃষ্ণনাম সকলেই লওয়াতে পারে। জগাই মাধাইকে কৃষ্ণনাম লওয়াতে পার, তবে তোমার বড়াই বুঝি। তুমি এই দুই ভাইকে উদ্ধার কর, আর জগতে তোমার দয়ার পরিচয় দাও। আমি যেখানে যাই. কেবল গালি খাই, লোকে কেবল দূর দূর করে তাড়ায়ে আসে। তুমি ঘরে বসে খিল দিয়া যাহা কর তাতে বাহিরের লোকের কি? তোমার কাজ কিছু দেখাতে পারি না, কাজেই লোকে অনায়াসে ঠাট্টা করে, আর আমরা ঘাড় হেঁট করে সে স্থান হতে পলায়ে আসি।" প্রভু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি যখন তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন অবশ্যই তাহারা উদ্ধার পাইবে।" ইহাতে ভক্তগণ সকলে নিশ্চিন্ত বুঝিলেন যে, জগাই মাধাই উদ্ধার পাইল। অমনি সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

জগাই মাধাইয়ের বাড়ী গঙ্গাতীরে; কিন্তু তাহারা শিবির সন্নিবেশিত করিয়া নগরের স্থানে স্থানে বাস করিত। এইরূপে উপরি-উক্ত ঘটনার অনতিবিলম্বেই শ্রীনিমাইয়ের বাটী যে পাড়ায়, সেইখানে তাহারা শিবির স্থাপন করিল। ইহাতে কাজেই পাড়ার লোক ভয়ে অভিভূত হইলেন।

সন্ধ্যা হইলে দশজন পাঁচজন একত্র না হইয়া এ-বাটী হইতে ও-বাটী যাইতে কাহারও সাহস হয় না। শ্রীবাসের বাটীতে কীর্ত্তন হইতেছে, সেই শব্দ শুনিয়া জগাই মাধাই উহা দেখিতে আসিল। দুই ভায়ে মদ্যপানে উন্মত্ত। দ্বারে কপাট বন্ধ থাকায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিল না। বাহিরে থাকিয়া, মদ্যের আনন্দ অভ্যন্তরের কীর্ত্তনে পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে দুই ভাই নৃত্য করিতে লাগিল, এবং এইরূপে নৃত্য করিয়া সমস্ত নিশি যাপন করিল। প্রভাতে ভক্তগণ কীর্ত্তন শেষ করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন; দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন যে সম্মুখে জগাই মাধাই! ভক্তগণ বিভীষিকা দর্শন করিয়া সশঙ্কিত হইলেন। শ্রীনিমাই এক পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, তখন দুই ভাই তাঁহাকে ডাকিয়া কহিল, "নিমাই পণ্ডিত! এ তোমার কিসের সম্প্রদায়? এ কি তোমার মঙ্গলচণ্ডীর গীত? আমরা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমাদের ওখানে তোমার একদিন যাইয়া গাইতে হইবে।" কিন্তু শ্রীনিমাই পণ্ডিত ও অন্যান্য ভক্তগণ এ কথার উত্তর না দিয়া "ধরিল, ধরিল," এই ভয়ে গঙ্গাস্নানে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

শ্রীনিমাইকে ভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, যে তাঁহাকে ডাকে, তিনি তাহার বাটীতে যাইয়া থাকেন। জগাই মাধাই প্রভুকে তাহাদের বাড়ীতে ডাকিয়াছিল। প্রকৃতই নিমাই পণ্ডিত জগাই মাধাইয়ের বাড়ীতে গীত গাহিতে চলিলেন। সে কিরূপে বলিতেছি।

অপরাহ্ণে ভক্তগণ প্রভুর নিকট বলিলেন যে জগাই মাধাইয়ের ভয়ে তাঁহারা সকলে অস্থির। সেই সুযোগ পাইয়া নিতাই বলিলেন যে, তাঁহারও সঙ্কল্প এই যে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার না হইলে আর তিনি নগরে হরিনাম প্রচার করিতে যাইবেন না। নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু, সকল লোকেই সাধু তরাইতে পারে। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা হীন ও কাঙ্গাল যে জগাই মাধাই, তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবন নামের

সফলতা কর। আর আমরাও তোমার সেই কার্য্য নদীয়াবাসিগণকে দেখাইয়া গৌরব করি ও শ্রীনাম প্রচার করি।”

নিতাই সকল ভক্তগণকে আপনার মতে আনিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রভুর কাছে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত দরবার করিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

ভক্তগণ যে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা প্রভু বুঝিলেন। বুঝিয়া বলিতেছেন, “তোমরা সকলে যখন তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন তাহাদের উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই। তাহাদের পাপের কথা আমার মনে পড়িলে অন্তর শুকাইয়া যায়। পরকালে তাদের কত দুঃখ হইবে, মনে করিলে হৃদয় চমকিয়া উঠে। এরূপ কঠিন রোগের একমাত্র ঔষধ হরিনাম। অতএব, (যথা চৈতন্যমঙ্গলে)—

“আনহ যেথানে যত আছে ভক্তগণ।
মিলিয়া সকল লোক কর সংকীর্ত্তন॥”

প্রভু আবার বলিতেছেন, “সকল ভক্তগণকে ডাকিয়া আন। সকলে একত্রে কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইয়া তাহাদিগকে হরিনাম দিব, দিয়া অদ্য জগতে হরিনামের শক্তি দেখাইব।” এই আজ্ঞা পাইয়া প্রভুর বাড়ীতে বহুতর ভক্ত উপস্থিত হইলেন, এবং সকলে নগর-কীর্ত্তনে প্রস্তুত হইলেন। এই তাঁহাদের প্রথম নগর-কীর্ত্তন। তাঁহাদের কীর্ত্তন পূর্ব্বে বহিরঙ্গ লোকে কেহ কখন দেখে নাই। কেহ খোল, কেহ করতাল, কেহ শঙ্খ, কেহ ভেরী লইলেন। সকলে পায়ে নুপুর পরিলেন! বৈকাল বেলা, শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, শ্রীগদাধর, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি প্রভৃতিপ্রভুর বাড়ীর কপাট খুলিয়া কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন। যথা—

“নিজ ঘরে শুতি আছে জগাই মাধাই।
নিজ মদে মত্ত নিদ্রা যায় দুই ভাই॥

সেই পথে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু যায়।
নদীয়ার লোক সব দেখিবারে ধায়॥
করতাল মৃদঙ্গ আর কীর্ত্তনের রোল!
চারিদিকে শুনি মাত্র হরি হরি বোল॥
আনন্দেতে ডগ মগ শ্রীশচীনন্দন।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু মধুর নর্ত্তন॥"—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

এই সংকীর্ত্তন দলের মধ্যে মুরারি গুপ্ত ছিলেন। অতএব তাঁহার সমুদায় স্বচক্ষে দেখা। তাঁহার কড়চার অনুসরণে চৈতন্যমঙ্গল লিখিত; সুতরাং এই জগাই-মাধাই-উদ্ধার কাহিনী চৈতন্যমঙ্গল হইতে লওয়া হইল। আর এই কাহিনীতে যে পদগুলি আছে তাহা সমুদায় সেই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপে যাইতেছেন, শ্রবণ করুন—

"শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যায় নাচিয়া নাচিয়া।
আবেশে অবশ অঙ্গ ঢলিয়া ঢলিয়া॥
চরণেতে বাজে নুপুর রুনু ঝুনু বোলে।
মালতীর মালা বিনোদিয়া গলে দোলে॥
হেলিয়া দুলিয়া গোরা নাচে রঙ্গে ঢঙ্গে।
গলিয়া গলিয়া পড়ে গদাধরের অঙ্গে॥
ধীরে ধীরে নাচে গোরা কটি দোলাইয়া।
অনিমিখে সঙ্গিগণ দেখে তাকাইয়া॥
প্রেমে পুলকিত তনু মাতি মাতি চলে।
ভাব ভরে গরগর আঁখি নাহি মেলে॥
বাহুর হেলন কিবা ভালি গোরা রায়!
প্রতি অঙ্গের চালনে অমিয়া খসায়॥"

শ্রীনিতাই সবার আগে। নিতাই সবার আগে কেন? কারণ তিনি

জগাই মাধাইয়ের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার এরূপ দশা কেন হইল, তাহা লোচন দাস ঠাকুর এইরূপে বলিতেছেন—

"দয়ার ঠাকুর নিতাই পরদুঃখ জানে।
অবশ হইয়া পড়ে দীন দরশনে॥"

অতএব জগাই মাধাইয়ের দুঃখে নিতাইয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায়, তিনি তাহার ছোট ভাই নিমাইকে বলিয়া কহিয়া বাধ্য করিয়া, কোমর বান্ধিয়া, দুই ভাইকে উদ্ধার করিতে যাইতেছেন। নিতাইয়ের গৌরবের ও আনন্দের সীমা নাই কাজেই নিতাই সকলের আগে। নিতাই আগে কিরূপে চলিতেছেন—

"একে ত দয়াল নিতাই আনন্দের পারা।
প্রেমে গদগদ তনু ঢলি পড়ে ধারা॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার॥
ডগমগ লোচন ঘুরায় নিরন্তর।
সোণার কমলে যেন ফিরিছে ভ্রমর॥
ক্ষণে "গো" "গো" করে, গোরা বলিতে না পারে।
গোরা রাগে রাঙ্গা আঁখি জলেতে সাঁতারে॥
সকরুণ দিঠে চায় শ্রীগৌরাঙ্গ পানে।
বলে উদ্ধারহ ভাই যত দীন জনে॥"

জগাই মাধাই সারানিশি মদ্যপান করিয়া অচেতন হইয়া নিদ্রা যাইতেছে, বৈকাল হইয়াছে তবু উঠে নাই। কীর্ত্তনের রোল শুনিয়া তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন বিরক্ত হইয়া প্রহরীকে বলিতেছে, "তুই যা, যাহারা গণ্ডগোল করিতেছে তাহাদের নিবারণ কর, আমাদের আর যেন

নিদ্রাভঙ্গ না হয়।” প্রহরী যাইয়া এই কথা কীর্ত্তনোন্মত্ত ভক্তগণকে বলিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহারা নিরস্ত না হইয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে লোক ফিরিয়া যাইয়া জগাই মাধাইকে বলিল যে, নিমাই পণ্ডিত কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতেছেন, তাঁহাদের নিষেধ করায় তাঁহারা শুনিলেন না।

জগাই মাধাইয়ের তখন মদের উন্মত্ততা ছিল না, প্রহরীর মুখে এই কথা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইল। এলো থেলো হইয়া শুইয়া ছিল, অমনি—
“পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের বসন। টলমল করি ধায় ক্রোধে অচেতন॥
রাঙ্গা দুনয়ন করি বলে ক্রোধ ভরে। নাশিব সকল বৈষ্ণব নদীয়া নগরে॥”

ইহাই বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে তাহারা কীর্ত্তনের দিকে আসিতে লাগিল। কিন্তু ভক্তগণ দেখিয়া ভয়ও পাইলেন না, নিরস্তও হইলেন না, বরং অধিক উৎসাহের সহিত নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিলেন।
“তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া যবে দুই ভাই চলে। বাহু তুলি ভক্তগণ হরি হরি বলে॥”
“দ্বিগুন করিয়া আরো বাড়ায়ে উল্লাসে। হরি হরি বোল ধ্বনি গগনে পরশে॥

কিন্তু ইহাতে জগাই মাধাইয়ের মন কোমল হইল না, বরং ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। সাজিয়া গুজিয়া বাড়ীর উপর জোর করিয়া উদ্ধার করিতে আসিলে সহজ মানুষেরই রাগ হয়, জগাই মাধাইয়ের ন্যায় লোকের ত হইবারই কথা। বিশেষতঃ জগাই মাধাইয়ের হরিনামের উপর বড় রাগ।

“হরিনাম দুই ভাই সহিবারে নারে।
বেগেতে ধায়য়ে তারা ভক্ত মারিবারে॥”

নিতাই সকলের আগে, কাজেই তিনি জগাই মাধাইয়ের সম্মুখে সর্ব্বাগ্রে পড়িলেন। তাহাদের ঐ ভাবে ক্রোধে অচেতন হইয়া আসিতে দেখিয়া, নিতাইয়ের ভয় কি ক্রোধ হইল না, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল; তিনি তাহাদের দুর্গতি দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

"দীন দয়ার্দ্র চিত্ত নিত্যানন্দ রায়। অশ্রুপূর্ণ লোচনেতে দুহা পানে চায়॥"

দুই ভাই দেখিলেন যে তাহাদের সেই পরিচিত সন্ন্যাসী, তাহাদের প্রতি সকরুণ দৃষ্টে চাহিয়া রোদন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাহাদের মন নরম হইল না বরং ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল।

"সে করুণ আঁখি দেখি পাপী না গলিল।
ক্রোধ ভরে দুই ভাই সম্মুখে দাঁড়াল॥"

নিতাই দুই ভাইকে সম্মুখে দেখিয়া, আর মাধাই অপেক্ষা জগাই একটু ভাল জানিয়া, কান্দিতে কান্দিতে তাহাকে বলিলেন, "জগাই হরি বল, বলিয়া আমাকে কিনিয়া লও।"

নিতাই যখন গদ গদ হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই কথা বলিলেন, তখন সে কথা জগাইয়ের হৃদয় কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিল, এবং সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

"জগাইয়ের মন অমনি দরবিয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া সে দাঁড়ায়ে রহিল।"

কিন্তু মাধাইয়ের হৃদয় জগাইয়ের অপেক্ষা শতগুণে কঠিন। মাধাইয়ের মন ভিজিল না, তাহার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। তখন ক্রোধে আর কিছু না পাইয়া একখানা কলসী খণ্ড লইয়া নিত্যানন্দের মস্তকে অতি জোরে নিক্ষেপ করিল। নিত্যানন্দের মস্তকে উহা অতি বেগে লাগিল।

"কলসীর কানা সে ফেলিয়া মারে কোপে।
নির্ভয়ে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে॥"

নিত্যানন্দের মস্তকে কলসীর কানা অতি জোরে লাগিল, ও তীরের ন্যায় রক্ত ছুটিল। তখন নিতাই কি করিলেন?

"ফুটিল মুটকি শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
'গৌর' বলি নিতাই আনন্দে নৃত্য করে॥"

কেন নিতাই আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন? তাহার কারণ নিতাই তখন ভাবিলেন যে, ইহাদের আর ভাবনা নাই, ইহারা নিশ্চয়ই উদ্ধার

পাইল। এই আনন্দে তিনি "গৌর, গৌর" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মাধাই ক্রোধে অন্ধ, একবার মারিয়া তাহার তৃপ্তি হইল না, আবার আর একখণ্ড কলসী লইয়া মরিতে উঠিল। অমনি জগাই তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "কর কি? বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিয়া পৌরুষ কি, আর ভালই বা কি হবে?" নিতাই তখন নাচিতে নাচিতে দুই ভাইকে বলিতেছেন—

মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥
মেরেছিস্ মেরেছিস্ তোরা তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই॥"

শ্রীনিমাই পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা ত্রিজগতকে দেখাইতেছেন। প্রভুর ইচ্ছা যে এ সমুদায় উদ্ধার কার্য্য শ্রীনিতাই দ্বারা সমাধা করাইবেন। তাই অগ্রে যে রক্তারক্তি হইতেছে তাহা যেন না জানিয়া পশ্চাতে নৃত্য করিতেছেন। একজন ভক্ত দৌড়িয়া গিয়া প্রভুকে সংবাদ দিল, আর তিনি ধাইয়া আইলেন। তিনি আসিয়া নিতাইকে ধরিলেন—

"নিতাইয়ের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
আনন্দময় নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গে নেহারে॥
প্রেমভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল।
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল॥
তবে মাধাই সম্বোধিয়া বলেন কাতরে।
প্রাণের ভাই নিতাই মারিলি কিসের তরে?

ইহা বলিতে বলিতে প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধপূর্ণ নয়নে সেই দুই ভাইয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন, "হারে পাপাত্মাগণ! পাপ করিয়া

তোদের পাপ পিপাসার শান্তি হইল না, পাপ করিয়া তোদের বিশ্রাম ইচ্ছা হইল না? চিরজীবন ঘোর পাপে রত থাকিয়া, অদ্য শ্রীনিত্যানন্দকে আহত করিয়া, তোদের পাপ-ব্রতের কি প্রতিষ্ঠা করিলি?" জগাই মাধাই কখন কাহারও নিকট মস্তক নত করে নাই। তাহারা তখন আপনাদের বাড়ীতে নিজের অস্ত্রধারী লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত। দুই ভাই মনে করিলে তখনই ভক্তগণকে কটাক্ষে বধ করিতে পারে। তাহারা নদীয়ার রাজা, অথচ নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে শাসন বাক্য বলিতেছেন, ইহা দুই ভাই কেন সহ্য করিতেছে? তাহার কারণ বলিতেছি। নিমাইকে দেখিয়াই মাধাই জড়ীভূত হইয়া পড়িল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না। প্রভু আবার বলিতেছেন, "হাঁরে পাপাত্মাগণ! নিত্যানন্দ তোদের কি ক্ষতি করিয়াছিলেন যে, তোরা তাঁহাকে মারিলি? বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিতে তোদের একটু দয়া হইল না? তোদের যদি মারিবার ইচ্ছা ছিল, তবে আমাকে মারিলি না কেন? তোদের ও ভুবনের পরম বন্ধু, অক্রোধ ও অভিমানশূন্য নিত্যানন্দকে আহত করিয়া অদ্য তোরা তোদের পাপের ঘট পূর্ণ করিলি! এখন তোদের দণ্ড গ্রহণ কর।"

যেমন নরহত্যাকারী ব্যক্তি, বিচারকের সম্মুখে থাকিয়া তাহার মুখ পানে তাকাইয়া কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ তাহারা, তাহাদের উপর কি দণ্ড হয়, ইহা ভাবিয়া প্রভুর বদন পানে চাহিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কারণ তাহারা যে অপরাধী ও দণ্ডার্হ, এবং প্রভু যে তাহাদিগকে দণ্ড করিতে সক্ষম, এ বিশ্বাস তখন তাহাদের মনে অটলরূপে অধিকার করিয়াছে। তখন প্রভু উচ্চৈঃস্বরে "চক্র" "চক্র" বলিয়া ডাকিলেন। যখন নিমাই উচ্চৈঃস্বরে "চক্র" "চক্র" বলিয়া আহ্বান করিলেন, তখন সকলে স্তম্ভিত হইলেন। মুরারি গুপ্তের শরীরে শ্রীহনুমান প্রকাশ হইতেন। হনুমান তখন মুরারির দেহে প্রবেশ করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে

বলিতেছেন, "প্রভু! সুদর্শনকে কেন স্মরণ করিতেছেন? আমাকে অনুমতি দিন, আমি এখনই ও দুবেটাকে যমঘর পাঠাইয়া দিই।"

যখন নিমাই "চক্র" বলিয়া ডাকিলেন, তখন নিতাই সচকিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইলেন। যখন মুরারি প্রভুর নিকট দুই ভাইকে বধ করিতে অনুমতি চাহিলেন, তখন নিতাই আপনার মাথার বেদনা ভুলিয়া গিয়া, মুরারির দুটী হাত ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "ভাই ক্ষমা দে।" ইহাই বলিয়া নিতাই পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখেন যে, সুদর্শন চক্র অগ্নির আকার ধারণ করিয়া জগাই মাধাইয়ের দিকে আসিতেছে। তখন নিতাই ব্যস্ত হইয়া সুদর্শন চক্রকে করজোড়ে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "সুদর্শন! ক্ষমা দাও, তুমি এই দুই ভাইকে মারিও না। আমি প্রভুর চরণ ধরিয়া, এই দুই ভাইয়ের প্রাণ ভিক্ষা লইতেছি।" ইহা বলিয়া নিতাই ব্যস্ত হইয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। বলিতেছেন, "প্রভু! কর কি? সব ভুলে গেলে? তোমার এবার ত কাহাকেও দণ্ড করিবার অধিকার নাই? তুমি না বলেছিলে এই অবতারে আর চক্র ধরিবে না, এবার ভক্তি ও কারুণ্যরসে ডুবাইয়া মলিন জীবকে উদ্ধার করিবে? যে দুষ্ট তাহাকে যদি বধ কর, তবে উদ্ধার কাহাকে করিবে?"

নিত্যানন্দ এইরূপ বলিতেছেন, আর জগাই, মাধাই, ভক্তগণ এবং উপস্থিত বহু নাগরীয়া (যাঁহারা এই গোল দেখিয়া সেখানে আসিয়াছেন) নিশ্চল হইয়া সমস্ত ঘটনা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন।

নিতাই, জগাই মাধাইকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! এই দুইটি প্রাণী আমাকে ভিক্ষা দাও। আমি এই দুইটি জীব লইয়া তোমার দীনবন্ধু ও পতিতপাবন প্রভৃতি নামের গরিমা রক্ষা করিব।" কিন্তু নিতাইয়ের অনুনয় বিনয়ে প্রভু কোমল হইতেছেন না। নিতাই প্রভুকে কঠিন দেখিয়া আবার বলিতেছেন, "প্রভু! আমার কপালে সামান্য

আঘাত লাগিয়াছে, আর উহা দৈবাৎ লাগিয়াছিল, জগাই ও মাধাইয়ের আমাকে ভয় দেখান ব্যতীত, মারিবার উদ্দেশ্য ছিল না। প্রভু! আমি স্বরূপ বলিতেছি, আমি একবিন্দুও ব্যথা পাই নাই। প্রভু! মায়া ছাড়! তুমি এখন যাহা করিতেছ, এ সমুদায়ের উদ্দেশ্য আমার গৌরব বৃদ্ধি ও মান রক্ষা করা! আমার মান ছারেখারে যাউক, তোমার অভয় পদে এই দুই মহা দুঃখী জীবকে স্থান দাও।"

এ স্থানে চৈতন্যমঙ্গল গীত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

"সুদর্শন বলি প্রভু স্মরে বারে বার।
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত ছাড়য়ে হুঙ্কার॥
মুরারি কহয়ে শুন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা পাই এ দুই পাঠাই যমঘর॥
শুনি নিত্যানন্দ ধরেন মুরারির হাত।
হেনকালে সুদর্শন আইল সাক্ষাৎ॥
সুদর্শন চক্র অগ্নি প্রলয় হইয়া।
জগাই মাধাই প্রতি চলিল কুপিয়া॥
দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দ রায়।
না মারিহ বলি সুদর্শনকে রহায়॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে প্রভুর চরণে।
এই দুই পতিত প্রভু মোরে দেহ দানে॥
আর যুগে যুগে দৈত্য করিলে উদ্ধার।
সশরীরে এ দুইয়ের করহ নিস্তার॥
কর জোড়ি প্রভুরে বলয়ে নিত্যানন্দ।
না হ'ল নিস্তার কলি পাষণ্ড দুরন্ত॥

সংকীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার।
কৃপায় সকল জীবের করিবে উদ্ধার ॥
যে মারিবে তারে যদি করিবে সংহার।
কেমনে করিবে কলি জীবের উদ্ধার ॥
শুনি নিত্যানন্দ বাণী প্রভু গৌরচন্দ্র।
কান্দিতে লাগিলা কোলে করি নিত্যানন্দ ॥"

জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত নিত্যানন্দের আর্ত্তি, বিনয়, কাকুতি মিনতি, ব্যগ্রতা, প্রাণপণ সঙ্কল্প; তাঁহার একবার উর্দ্ধপানে চাহিয়া সুদর্শনের প্রতি মিনতি, একবার দুটী হাত ধরিয়া মুরারিকে মিনতি ও একবার প্রভুর চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মিনতি দেখিয়া, তিন জন ব্যতীত. উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই অভিভূত হইয়াছেন। সে তিন জন—প্রভু স্বয়ং, আর জগাই ও মাধাই। নিতাই তাহাদের জীবন ভিক্ষার নিমিত্ত যে কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা তাহারা কর্ণেও শুনিবার অবকাশ পাইতেছে না। তাহাদের নয়ন স্থিরভাবে প্রভুর মুখপানে রহিয়াছে। তাহারা দেখিতেছে প্রভু রুদ্র অবতার, মুখে তাঁহার করুণার চিহ্নমাত্র নাই। ইহা দেখিয়া তাহারা একেবারে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

যখন নিত্যানন্দ দেখিলেন যে প্রভু কোমল হইতেছেন না, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! আর এক কথা বলি, তুমি এ দুটীকেই দণ্ড করিতে পার না, যেহেতু জগাই আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।"

অমনি প্রভুর মুখের কঠিন ভাব অন্তর্হিত হইল। তিনি বলিতেছেন, "জগাই তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে! সে কি?" নিতাই বলিলেন, "মাধাই যখন দ্বিতীয়বার কলসীখণ্ড দ্বারা আমাকে প্রহার করিবার উদ্যোগ করে, তখন জগাই তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নিবারণ করে, আর তাহাকে

তিরস্কার করিয়া বলে যে, সে অতি নির্দ্দয়, কারণ সে বিদেশী সন্ন্যাসীকে মারিয়াছে। তাহাতেই মাধাই আমাকে আর মারিতে পারে নাই।”

প্রভু বলিতেছেন, “তুমি বল কি? এই জগাই, মাধাইয়ের হাত ধরিয়া তোমাকে বাঁচাইয়াছে? এই জগাই? হাঁরে জগাই, তুই আমার নিত্যানন্দের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিস্? তবে ত আমি তোরই হইলাম। আয় তোকে প্রসাদ প্রদান করি! ইহাই বলিয়া শ্রীনিমাই সর্ব্বসমক্ষে সেই অস্পৃশ্য পামর, সেই শত শত নরনারী হত্যাকারী জীবাধমকে হৃদয়ে গাঢ়রূপে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। জগাই তখন কি বলিতে গেল, কিন্তু কথা ফুটিল না; অমনি ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় দীঘল হইয়া মৃত্তিকায় অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল।

মাধাই সমুদায় দেখিতেছে; প্রভুর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিল; আবার জগাইকে করুণা করিতেও দেখিল। দেখিল, তাহার সেই সমুদায় পাপকর্ম্মের অর্দ্ধভাগী ভ্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গের দক্ষিণ পদখানি হৃদয়ে ধরিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে, আর অশ্রুজলে উহা ধৌত করিতেছে। তখন মাধাইয়ের চৈতন্য হইল, আর “আমাকে রক্ষা কর” বলিয়া সে তখনি শ্রীগৌরাঙ্গের পদতলে পড়িল।

প্রভু অমনি দুই পদ পশ্চাতে হটিলেন। হটিয়া বলিতেছেন, “ওরে অধম, তুই যে ঠাকুরালীতে উন্মত্ত হইয়া জীবের উপর এত অত্যাচার করিয়াছিস্, সেই নদীয়ার ঠাকুরালী পরিত্যাগ করিয়া, আজ কেন ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছিস্? নদীয়ার রাজা হইয়া এখন ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিস্, ইহাতে তোর লজ্জা বোধ হইতেছে না? মাধাই, আমা হইতে তোমার উদ্ধার হইবে না।”

“নবদ্বীপের রাজা হও তোমরা দুজন।
রাজা হয়ে কি কারণে কান্দহ এখন?”

ইহাতে মাধাই অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "তুমি জগতের পিতা, তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, তবে আর আমি কার কাছে যাইব? প্রভু! আমরা দুই ভাই একত্রে পাপ করিলাম; তুমি দয়াময়, জগাইকে উদ্ধার করিলে, আর আমাকে পরিত্যাগ করিবে, এ ত তোমার উচিত নয়।"

প্রভু বলিলেন, "জগাই আমার নিকট অপরাধী। যে আমার নিকট অপরাধী হয়, তাহার অপরাধ মোচন করিতে আমার অন্যের অপেক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু মাধাই, তুমি নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী। আমার ভক্তের নিকট যাহারা অপরাধী, তাহাদের অপরাধ আমি স্খালন করিতে পারি না। তাহা হইলে ভক্তদ্রোহীগণকে আমার প্রকারান্তরে উৎসাহ দেওয়া হয়। মাধাই! নৃশংস অত্যাচারী নিঠুরকে স্পর্দ্ধা দেওয়া ত দয়াময়ের কার্য্য নয়। তাহাদের দণ্ড দেওয়াই দয়াময়ের কার্য্য।"

তখন মাধাই নিরুপায় হইয়া কহিলেন, "প্রভু! তোমার নিকট আমি করুণা প্রার্থনা করিতেছি না, কারণ আমি যে সমস্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতে ক্ষমা মাগিবার পথ রাখি নাই। তবে আমি সরলভাবে মনের কথা বলিতেছি। আমার হৃদয় হইতে আশা যাইতেছে না। তুমি যে আমাকে একেবারে ফেলিয়া দিবে, ইহা আমি কোনক্রমেই মনে ধারণা করিতে পারিতেছি না। তুমি আমাকে বলিয়া দাও, আমি কি উপায়ে উদ্ধার পাইতে পারি। আমি তাহাই করিব।"

প্রভু তখন দ্রবীভূত হইয়াছেন, মনের ভাব ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু করুণ আঁখি তাহা করিতে দিতেছে না। তখন হৃদয়ের ভাব যতদূর পারেন গোপন করিয়া বলিলেন, "মাধাই! তুমি শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছ, তুমি তাঁহার কাছে অপরাধী। শ্রীনিত্যানন্দ দয়াময়, তুমি তাঁহার চরণ দু'খানি ধরিয়া পড়। যদি তিনি তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তবে তুমি মুক্ত হইলেও হইতে পার।" এই কথা

বলাতে মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ ছাড়িয়া শ্রীনিত্যানন্দের চরণ ধরিয়া পড়িলেন ও বলিলেন, "প্রভু! তুমি ক্ষমা করিলেই, ভগবান্ আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিবেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি শ্রীনিত্যানন্দের হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ তুমি যেরূপ দয়াল, তাহাতে মাধাই ক্ষমা মাগিবার আগেই, তুমি যে তাহাকে মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত, তা জগতে সকলেই জানে। কিন্তু তাহা উচিত নয়, যেহেতু তাহা হইলে, এই দুরাত্মা ইহার অপরাধরাশিকে অতি লঘু ভাবিবে। অতএব এই অধমকে রক্ষা করিতে আমি তোমার নিকট মিনতি করিতেছি, ইহা বুঝিতে পারিলে ইহার হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ইহার অপরাধ কিরূপ গুরুতর। শ্রীপাদ! তুমি মাধাইকে ক্ষমা কর, যেহেতু সাধুজন অনুতপ্ত ও চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণকে চিরদিন ক্ষমা করিয়া থাকেন। অতএব এ অধমকে ক্ষমা করিয়া সাধু ও পাপাত্মায় কি বিভিন্নতা তাহার পরিচয় দাও।"

ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ গদ গদ হইয়া বলিলেন, "প্রভু! তুমি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই দুইটি পাপীকে উদ্ধার করিবে তাহা আমি জানি। আমার গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত আমার কাছে অনুমতি চাহিতেছ। তাহাই হউক, আমি উহাকে ক্ষমা করিলাম। তাহা কেন, আমি তোমার সমক্ষে সরলভাবে বলিতেছি যে, যদি আমি কোন জন্মে কোন সৎকর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহা আমি সমুদায় মাধাইকে দিলাম। তুমি এই পরম দুঃখী অনুতপ্ত জীবটিকে চরণে স্থান দাও।" যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"বিশ্বম্ভর বলে শুন নিত্যানন্দ রায়।
পড়িলে চরণে কৃপা করিতে জুয়ায়॥"

তাহাতে—"নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর সেই শক্তি তুঞি॥

কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিলুঁ মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত॥
মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড় কৃপা কর তোমার মাধাই॥”

তখন নিত্যানন্দ পদ-লুণ্ঠিত মাধাইকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “ওরে নির্ব্বোধ! সেই কৃপাময় তোকে অগ্রেই কৃপা করিয়াছেন, দেখলি না? তুই ছার, তোর নিমিত্ত শ্রীভগবান আমার নিকট অনুনয় বিনয় করিতেছেন। এস বাপ মাধাই, তোকে আলিঙ্গন করি।” ইহাই বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, আর মাধাইও জগাইয়ের পার্শ্বে অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন দুই ভাই ধূলায় পড়িয়া রহিলেন। উত্তান-নয়ন, তাহা হইতে অল্প অল্প অশ্রু পড়িতেছে, উভয়ই স্পন্দনহীন, চেতনাশূন্য, অঙ্গে সাড়া নাই। ভক্তগণ “হরিবোল” “হরিবোল” বলিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তখন সে স্থানে এত কলরব হইল, আর কি ভক্ত কি অভক্ত, নানাভাবে এমন বিবশীকৃত হইতে লাগিলেন যে, সেখানে প্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ আর থাকিতে পারিলেন না। জগাই মাধাইকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া শ্রীনিমাই ভক্তগণসহ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। প্রভু নিজ বাটীতে ভক্তগণ লইয়া প্রবেশ করিলেন। ভক্তগণ শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্ত কেহ পিঁড়ায়, কেহবা আঙ্গিনায় বসিলেন। যে অদ্ভুত কাণ্ড সকলে স্বচক্ষে দেখিলেন, তাহাতে কাহারও বাক্যস্ফুট করিবার ক্ষমতা রহিল না। সকলেই আপনাপন মনের ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল; এমন সময় দ্বারে “ঠাকুর!” “ঠাকুর!” বলিয়া কে চীৎকার করিতেছে, সকলে শুনিলেন। ক্রমে অনুসন্ধানে জানিলেন যে, জগাই মাধাই দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন। তখন প্রভু তাহাদিগকে ডাকিয়া

আনিতে মুরারীকে পাঠাইলেন। মুরারি এই অবতারে হনুমান। তাঁহার শরীরে যখন হনুমান প্রবেশ করিতেন, তখন তাঁহার বলের সীমা থাকিত না। জগাই মাধাইয়ের ন্যায় বলবান আর কেহ ছিল না, তাহাদের মনে এই বড় গর্ব্ব ছিল। মুরারি তাহাদিগকে ডাকিতে যাইয়া, তাহাদের সেই বলের দর্প নাশ করিলেন। প্রভু বলিলেন, "মুরারি উহাদিগকে এখানে আন। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলঃ—

"এখানে আমার ঠাঁই আনহ মুরারি
আজ্ঞা পাইয়া দুহারে আনিল কোলে করি॥"

মুরারি, বীরের ন্যায়, দু'ভাইকে "কোলে" করিয়া আনিলেন। দু'ভাই আসিয়া প্রভুর আঙ্গিনায় অচেতন অবস্থায় দীঘল পড়িলেন। তখন প্রভু নিত্যানন্দকে আজ্ঞা করিলেন, "শ্রীপাদ! এই দু'জনকে জাহ্নবীতীরে লইয়া যাইয়া ইহাদের কর্ণে শ্রীহরিনাম দাও।" ইহাই বলিয়া প্রভু ও ভক্তগণ জগাই ও মাধাইকে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে জাহ্নবীতীরে চলিলেন। দুই ভাইয়ের চেতনা নাই, সুতরাং তাহাদিগকে ধরাধরি করিয়া লইয়া গঙ্গাতীরে মৃতব্যক্তির ন্যায় শোয়ান হইল। তখন নদীয়া টলমল করিতেছে। সকলে জগাই মাধাইয়ের এই সংবাদ শুনিয়াছেন; শুনিয়া সেই দিকে দৌড়িয়াছেন। যেমন কোন বৃহৎ অনিষ্টকারী ব্যাঘ্র ধরা কি মারা পড়িলে দেশের লোক সমবেত হয়, সেইরূপ জগাই মাধাই ধরা পড়িয়াছে, ইহা দেখিবার নিমিত্ত নদীয়া নগরে হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল! ক্রমে নাগরিয়াগণ জুটিতেছেন ও কলরবও বৃদ্ধি পাইতেছে। যাঁহারা পূর্ব্বে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও দেখিতেছেন যে, যে জগাই মাধাই একটু পূর্ব্বে নদীয়ার "রাজা" ছিলেন, নদীয়ার যাহাকে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন ও করিতেন, সেই নদীয়ার রাজা অদ্য নিমেষের মধ্যে আর এক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজাদ্বয় এখন ধূলায় লুণ্ঠিত!

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ গভীর স্বরে, অর্থাৎ উপস্থিত তাবল্লোকে শুনিতে পায় এইরূপ করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, আমি এই দুইটি জীব আপনাকে দিলাম। আপনি ইহাদিগকে গঙ্গাস্নান করাইয়া হরিনাম দান করুন।" এই মুহূর্ত্তের কার্য্য বর্ণনা করিয়া অনেক প্রাচীন পদ আছে। তাহার মধ্যে একটী নিয়ে দিলাম। নিত্যানন্দ দুই ভাইকে বলিতেছেনঃ—

"আয়রে জাহ্নবী তীরে দুটি ভাই।
আজ তোদের হরিনাম দিব রে জগাই মাধাই ॥ ধ্রু ॥
মাধাই মার্‌লি মার্‌লি কর্‌লি ভাল রে,
এখন হরি বলে নেচে আয় ॥
তুই মেরেছিস্ কলসীর খণ্ড।
আজ, হরিনাম দিয়া করিব দণ্ড ॥"

জগাই মাধাই তখন অচেতন, কাজেই চলিয়া গঙ্গার মধ্যে যাইতে পারিলেন না! ভক্তগণ মহানন্দে তাঁহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া জলে লইয়া গেলেন। যখন জলের মধ্যে দুই ভাইকে লইয়া ভক্তগণ প্রবেশ করিলেন, তখন জগাই মাধাইয়ের চেতন হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ, ভক্তগণ ও জগাই মাধাই সকলেই প্রথমে গঙ্গাস্নান করিলেন।

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া সহস্র সহস্র লোক কৌতুক দেখিতেছে। জোৎস্নাময়ী রজনী, সুতরাং দেখিতে কাহারও বাধা হইতেছে না। ভক্তগণ গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া, মধ্যস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ ও জগাই মাধাই। জগাই মাধাইয়ের হাতে তামা তুলসী দেওয়া হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ, তাবল্লোকে শুনিতে পায় এরূপ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হে মাধব (মাধাই)! হে জগন্নাথ (জগাই)! তোমরা এ যাবৎ পর্য্যন্ত যত পাপ করিয়াছ, তাহা তামা তুলসী ও গঙ্গাজল দিয়া উৎসর্গ করিয়া আমাকে দান কর, করিয়া

তোমরা নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হও।” ইহা বলিয়া তাহাদের পাপ লইবার জন্য প্রভু সর্ব্বলোকের সমক্ষে অঞ্জলি পাতিলেন।

তখন জগাই মাধাই নিতান্ত কাতর হইলেন। প্রভুকে মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, “ভক্তগণ তোমাকে কুসুম ও চন্দন উপহার দিয়া থাকেন। আর আমরা দুই ভাই—পাপাত্মা, তোমার শ্রীকরে পাপ দান করিব! প্রভু তাহা হইবে না। আমরা অপরাধ করিয়াছি, মনসুখে দণ্ড লইব। তুমি এই কৃপা কর যে, পাপের নিমিত্ত আমরা যতই দুঃখ পাই না কেন, তোমার শ্রীচরণ যেন বিস্মৃত না হই। আমরা তোমাকে পাপ দিতে পারিব না।”

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু আবার অঞ্জলি পাতিলেন, আর জগাই মাধাই যে কথা বলিল, তাহার উত্তর না দিয়া শুদ্ধ এই বলিলেন, “জগাই মাধাই! তোমাদের পাপ আমাকে দিয়া সুখে হরিনাম কর।” ইহাতে মাধাই বলিলেন, “প্রভু! আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমরা তোমাকে আমাদিগের পাপ দিতে পারিব না। যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে তাবৎ লোকে বলিবে দুইটী নরাধম, জগাই মাধাই ভগবানের হস্তে তাহাদের পাপরাশি দিয়াছিল।”

ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মাধাই, কি নির্ব্বোধের ন্যায় বলিতেছ? শ্রীভগবানের এক নাম পতিতপাবন। অনেকে আছেন যাঁহারা বলেন, ‘ভগবান সাধুর বন্ধু ও পতিতের অরি।’ তিনি যে পতিতপাবন, অদ্য তোমরা দুই ভাই তাহার সাক্ষী হও। তোমরা ভাবিতেছ, তোমরা এরূপ করিলে তোমাদের কলঙ্ক হইবে; কিন্তু তোমাদের যদি কলঙ্ক হয়, শ্রীভগবানের যশ হইবে। জীবের কলঙ্ক হয় হউক, কিন্তু শ্রীভগবানের যশ হউক। শ্রীভগবানের যশ অদ্য তোমাদের দ্বারা জীবের নিকট সম্যকরূপে প্রকাশিত হউক। অতএব তোমরা তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া অনায়াসে প্রভুর হস্তে পাপ প্রদান কর।”

এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ আবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "জগাই মাধাই. আমি ত্রিলোক মাঝারে তোদের পাপ ভিক্ষা করিতেছি। তোদের পাপ আমাকে দিয়া তোরা নির্ম্মল হ।" তখন শ্রীনিত্যানন্দ দান মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। জগাই মাধাই সেই মন্ত্র পড়িয়া প্রভুর হস্তে আপনাদের পাপ উৎসর্গ করিয়া দিলেন। আর প্রভু সকলকে শুনাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"তোমাদের সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করিলাম।"

অন্তরঙ্গগণ তখনি দেখিলেন যে, প্রভুর সোণার বর্ণ অমনি কাল হইয়া গেল। যথা, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে :—

"দুই জনের শরীরে পাতক নাই আর।
ইহা বুঝাইতে হ'লো কালিয়া আকার॥"

সকলে স্নান করিয়া আবার প্রভুর বাড়ীতে আসিলেন। আসিয়া আবার কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে দিনকার নৃত্যের নায়ক জগাই মাধাই, প্রভু পিঁড়ায় বসিয়া দেখিতেছেন। যথা চৈতন্যমঙ্গল গীত—

"একি ঠাকুরাল, এ যে মাধাই নাচে। ধ্রু॥
জগাই নাচিলেও নাচিতে পারে, আবার মাধাই নাচে॥
নাচে হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে॥"

দুই ভাই প্রভুর আঙ্গিনায় ভক্তগণ মাঝে নৃত্য করিতেছেন। আর শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া—যাঁহারা ইহাদের ভয়ে গঙ্গায় যাইতে সশঙ্কিত ছিলেন,—অভ্যন্তর হইতে দর্শন করিতেছেন। কিন্তু জগাই মাধাইয়ের আনন্দ অধিকক্ষণ থাকিল না। একটু পরেই তাঁহারা কান্দিতে লাগিলেন, এবং সে ক্রন্দনের শান্তি কোন ক্রমেই হইল না।

তাঁহারা দুই ভাই আর গৃহে গেলেন না, ভক্তগণের বাড়ীতে থাকিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের আর্ত্তিতে ভক্তগণ অস্থির হইলেন। দুই ভাই আহার ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের কার্য্য হইল, দুই লক্ষ হরিনাম জপ ও

ক্রন্দন। শ্রীনিত্যানন্দের বড় বিপদ হইল। তিনি আর কোনক্রমেই মাধাইকে সান্ত্বনা করিতে পারেন না। তিন শত সহস্র বার বলিলেন ও বুঝাইলেন যে, তাহাদের আর পাপ নাই, কিন্তু মাধাই ও জগাই শান্ত হইলেন না।

মাধাই নিতাইকে বলিতেছেন, "প্রভু! তোমাকে আঘাত করিয়াছি, তাহাতে আমার তত দুঃখ নাই; কারণ তুমি আমার পিতা, আমি তোমার পুত্র। অবোধ পুত্রে এইরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু আমি যে কত জীবকে হিংসা করিয়াছি, তাহা আমি নিরাকরণ করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা করে যে, আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের চরণ ধরিয়া ক্ষমা মাগি। কিন্তু আমি অনেককে চিনি না, মাতাল হইয়া কার কি অনিষ্ট করিয়াছি তাহা জানি না। আমি যদি সেই সব লোকগুলি পাই, আর তাহাদের চরণ ধরিতে পারি, তবে বোধ হয় আমার হৃদয়ের তাপ যাইতে পারে।"

নিত্যানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া মাধাই নদীয়ার ঘাটে আসিয়া বসিলেন। পরিধানে একখানি ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র; উপবাস, ক্রন্দন ও অনিদ্রায় শরীর শীর্ণ। সেই নদীয়ার রাজা ঘাটের এক কোণে বসিয়া হরিনামের মালা লইয়া নাম জপ করিতেছেন! যে কেহ ঘাটে আসিতেছেন মাধাই উঠিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কাতর স্বরে কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। আমি জানিয়া, কি না জানিয়া যদি আপনাকে কোন দুঃখ দিয়া থাকি, তবে আপনি আমাকে ক্ষমা করিলে শ্রীভগবান আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

মাধাই বিচার না করিয়া, বালক বৃদ্ধ, নর নারী, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, প্রতি জনের পদতলে পড়িয়া, এইরূপে রোদন করিতে লাগিলেন। নদীয়ার রাজার এই দশা দেখিয়া সকলে যে কেবল মাধাইকে ক্ষমা করিলেন তাহা নহে, যিনি মাধাইয়ের অবস্থা দেখিলেন তিনিই কান্দিতে লাগিলেন।

এইরূপে মাধাইয়ের দ্বারা, লোকের মন নির্ম্মল ও নগরে হরিনাম প্রচার হইতে লাগিল।

মাধাই শ্রীবাসের বাড়ী অন্ন খাইতেছেন না। শ্রীনিত্যানন্দ আজ্ঞা করিতেছেন, তবু মাধাই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, কেবল ক্রন্দন করিতেছেন। শেষে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গকে সংবাদ দিলেন, এবং তিনি স্বয়ং আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া দেখেন যে, মাধাই সম্মুখে অন্ন রাখিয়া আহার করিতেছেন না, কেবল রোদন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন সম্মুখে বসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "মাধাই! তোমার সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করিয়াছি, আমি তোমার সম্মুখে বসিয়া আছি, এবং আর কিছু যদি তোমার প্রার্থনা থাকে, তাহাও তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি শান্ত হও।"

ইহাতে মাধাই বলিলেন, "প্রভু! আমি সব বুঝি। তুমি যখন আমার সম্মুখে তখন আর আমি চাহিব কি? আর তুমি যখন আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছ, তখন আমার যে পাপ নাই, তাহাও জানি। কিন্তু এখন যে রোদন করিতেছি, এ আমার পাপ স্মরণ করিয়া নয়, তোমার করুণা স্মরণ করিয়া। আমি যে পাপ করিয়াছি তাহার উপযুক্ত দণ্ড যদি আমার ভোগ করিতে হইত, তবে আমার দুঃখ থাকিত না। আমি অস্পৃশ্য পামর, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তুমি আমাকে যত করুণা করিতেছ, ততই আমার আত্মগ্লানি বাড়িতেছে। এই যে তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া আমাকে অন্ন খাওয়াইবার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিতেছ, কিন্তু তুমি বা কি, আর আমি বা কি? প্রভু! বলিতে কি, তুমি যে পরিমাণে আমাকে করুণা করিতেছ, সেই পরিমাণে আমার দুঃখ বাড়িতেছে।"

এখানে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ভগবান্ যখন স্বয়ং মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিলেন, তখন তাহার এত কাতরে রোদন কেন?

ইহার উত্তর এই যে, অবশ্য ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তিনি সকলই করিতে পারেন, কিন্তু তথাচ তিনি কখন আপনার নিয়ম আপনি লঙ্ঘন করেন না। শরীরে পাপ প্রবেশ করিলে ঐ পাপ অনুতাপানলে গলিয়া নয়ন দ্বারা বাহির হইয়া থাকে। এই তাঁহার নিয়ম, আর মাধাইয়ের তাহাই হইল। যদিও প্রভু মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিলেন, তবুও তাহার সে পাপের কষ্ট ভোগ করিতে হইল। ভগবানের আজ্ঞা যে, পাপের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ মাধাইয়ের পাপ নষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু সমুদায় নিয়ম ঠিক রাখিয়া। তিনি স্বেচ্ছাময় ও সর্ব্বেশ্বর বলিয়া, বালকের মত, যাহা ইচ্ছা করেন না।

তিনি যে গৌর-দেহ অবলম্বন করিলেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য ও চিন্ময় ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা নিয়ত বিরাজ করিতেন। তবে নিমাই কেন আহার করিতেন, কেনই বা নিদ্রা যাইতেন? ঐ দেহের কি কোন রোগ হইয়াছিল? শ্রীভগবান যখন দেহ লইয়া নর-সমাজে বিরাজ করেন, তখন দেহের সমুদায় ধর্ম্ম তাহাও সাধারণ জীবের ন্যায় পালন করিয়া থাকেন। মাধাইয়েরও সেইরূপ স্বভাবের যে নিয়ম তাহা পালন করিতে হইল।

মাধাই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত লইলেন ও প্রত্যহ দুই লক্ষ হরিনাম জপিতেন। তিনি গঙ্গাতীরে থাকিয়া নিজহস্তে কোদালি দিয়া একটী ঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাকে লোকে মাধাইয়ের ঘাট বলিত। এখনও নবদ্বীপে মাধাইয়ের ঘাট প্রসিদ্ধ আছে। এইটি মাধাইয়ের গান—

"তোমরা দুভাই গৌর নিতাই।
আমরা দুভাই জগাই মাধাই॥

মাধাইয়ের বংশীয়গণ অদ্যাপি আছেন। তাঁহারা শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পরম বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গ ভক্ত।

আর গুটি দুই কথা বলিয়া এ প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। শ্রীভগবান এ অবতারে যখন জীবগণকে শুধু করুণায় উদ্ধার করিবেন, তখন চক্রের স্মরণ কেন করিলেন? তাহার উত্তর এই যে, কোন কোন জীব এরূপ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, তাহাদিগকে ভয় ব্যতীত শুধু করুণায় বশীভূত করা যায় না। শুধু করুণায়, জগাই কোমল হইল, কিন্তু মাধাই হইল না। মাধাই ভয় পাইয়া, তবে আপনার দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিল।

আর এক কথা, এই,—শ্রীগৌরাঙ্গ অচেতন দু'ভাইকে ফেলিয়া কেন চলিয়া আসিলেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ সেখানে অত্যন্ত লোকের ভীড় হয়। দ্বিতীয়তঃ জোর করিয়া বাড়ী পড়িয়া কাহাকে উদ্ধার করা নিয়ম নয়। সে উদ্ধার ঠিক হয় না। নিয়ম এই যে,—কৃপাপ্রার্থী জীব অনুগত হইয়া, কৃপা প্রার্থনা করিবে, তবে তাহার হৃদয়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহা সজীব থাকিয়া পরিবর্দ্ধিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইয়ের চৈতন্য উদয় করিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন, আর তাঁহারা আসিয়া শ্রীচরণে আশ্রয় লইলেন, এবং তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের উদ্ধার ক্রিয়া আরম্ভ হইল।